প্রণয়াকাঙ্ক্ষা

নুসরাত সুলতানা সেঁজুতি



Join this group for more books & ebooks

Paid Books & eBooks

প্রণয়াকাঙ্ক্ষা

নুসরাত সুলতানা সেঁজুতি

১.

গ্রীষ্মের এক ক্লান্ত দুপুর। প্রকৃতির বুকে এক মুঠো দূরন্ত বাতাসের ঝিরিঝিরি সুর বইছে। আনন্দের হিল্লোলে মাঠে-ঘাটে নিত্যরত সবুজ পাতার ঢেউ। সূর্যের উত্তাপে ঘেমে নেয়ে স্কুল থেকে একটু আগেই বাড়ি ফিরেছেন আমির উদ্দীন। পেশায় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তিনি। ঘড়িতে দুপুর আড়াইটা বাজতেই ডাক পড়ল খাবার টেবিলে। ভেজা মুখ মুছতে মুছতে চেয়ারে এসে বসলেন তিনি। পাশের ফাঁকা চেয়ারগুলো দেখে নির্দেশ ছুড়লেন বিলম্বহীন, "সেঁজুতি! ইতি! খেতে এসো।"

বাবার দরাজ কণ্ঠের এক ডাকেই ছুটে এলো ইতি। তার বয়স বারো পেরিয়ে তেরোর কোঠায়। মুনারা শুধালেন, "সেঁজুতি কোথায়?"

সে বসতে বসতে জানাল, "আসছে।"

তারও অনেক পরে হাজির হলো মেয়েটা। ধীরুজ কদমে মায়ের পাশে এসে দাঁড়াল। চোখ তুললেন আমির। মেয়ের ফরসা চেহারায় মলিনতা আজ। চাউনিতে স্ফূর্তি নেই। অথচ ভদ্রলোকের নজরে কিছুই পড়ে না। উলটে প্রশ্ন করলেন কড়া গলায়, "খাওয়ার জন্যে এতবার ডাকতে হয় কেন তোমাকে?"

সেঁজুতি নিশ্চুপ। মুনারা কিছুপল চেয়ে থাকলেন ওর দিকে। এই তো সকালেই কী হাসিখুশি ভার্সিটি গেল মেয়েটা। অথচ বাড়ি ফেরা থেকেই এমন মনমরা হয়ে আছে। কী যে হয়েছে। জিজ্ঞেস করলেও কোনোদিন কিছু বলে না। শ্বাস ঝাড়লেন তিনি। বললেন, "বোস।"

সেঁজুতি বসেনি। বরং ঠায় দাঁড়িয়ে রইল। আমিরের কপাল গুছিয়ে এলো এবার। গম্ভীর তাঁর কণ্ঠ, "তুমি কি কিছু বলবে?"

আনত চিবুকে মাথা নাড়ল ও।

"কী বলবে? সময় নষ্ট না করে বললেই পারো।"

সেঁজুতি পুরন্ত ঠোঁট টিপে নেয়। গলবিলে কথার বাণ খুশখুশে ভাব তুলেছে। রয়েসয়ে মুখ খুলল, "রাফিনকে আমি বিয়ে করব না, বাবা!"

PAID BOOKS
— & eBOOKS —

ভাতে থাকা হাতটা তত্র থেমে গেল আমিরের। চমকে উঠলেন মুনারা। আর্তনাদের সুর বাজল কথায়, "কেন রে, মা? হঠাৎ কী..."

পথিমধ্যেই হাত উচিয়ে থামিয়ে দিলেন আমির। পুরু কণ্ঠে শুধালেন, "কী বললে?"

বাবার তপ্ত দৃষ্টিতে সেঁজুতি চেয়ে থাকতে পারে না। মাথা নোয়াল ফের।

বলল সেই একই কথা, "রাফিনকে আমি বিয়ে করব না।"

"তার কারণ?"

আমিরের গুরুভার স্বর। সেঁজুতির লোমকূপ অবধি দাঁড়িয়ে যাচ্ছে ভয়ে।

তিরতির করে কাঁপা ঠোঁটযুগল ধাতস্থ হতে সময় নিল। টেনেহিঁচড়ে আনল অপ্রিয় এক লাইন, "ওর চরিত্রে সমস্যা আছে!"

আমির বললেন, "সেটা প্রেম করার বেলায় দেখোনি?"

সেঁজুতি শুষ্ক ঠোঁট জিভে ভেজাল। সাফাই দিতে চাইল, "তখন আমি বুঝতে পারি..."

আচমকা চ্যাঁচিয়ে উঠলেন ভদ্রলোক, "বুঝতে পারিনি এটা কোনও কথা নয়। রাফিনকে আমি তোমার জন্যে ঠিক করিনি, করেছিলে তুমি। এখন শেষবেলায় এসব বললে তো হবে না।"

হঠাৎ নিনাদে ভরকে যায় সেঁজুতি। ছুটতে চাওয়া কথার বাহন থমকে দাঁড়ায় সবেগে। ইতির ছোট্ট দেহ থরথর করে কাঁপছে। ভীত নয়ন লেপ্টে রয়েছে বাবার রক্তিম দুই চোখে।

মুনারা নম্র কণ্ঠে বললেন, "উত্তেজিত হচ্ছেন কেন? একটু শুনুন না মেয়েটা কী বলে?"

ধমকে উঠলেন আমির, "তুমি চুপ করো।"

ভদ্রমহিলা চুপসে গেলেন। সংকীর্ণ আদলে নুইয়ে নিলেন মাথা। স্বামীর ওপর দিয়ে কথা বলার স্বভাব তাঁর নেই।

সেঁজুতির দিকে ফিরলেন আমির। কান্নার প্রকোপে জোয়ারের মতো ফুলে ওঠা চোখদুটো অবজ্ঞা করলেন সরাসরি। পাষণ্ডের ন্যায় আওড়ালেন, "এখন আর এসব কথা বলে লাভ নেই, সেঁজুতি।

BanglaBook.org

বিয়ে তোমাকে করতেই হবে। ইনভাইটেশন কার্ড সব আমি বিলি করে দিয়েছি। ব্যাপারটা এখন শুধু তোমার বিয়েতে আটকে নেই। এটা এখন আমার মান-সম্মানেরও প্রশ্ন।"

"এটা তো আমার জীবনেরও প্রশ্ন, বাবা!"

মেয়েটার কণ্ঠে অসহায়ত্ব। সেই অসহায়ত্ব ছুঁয়ে গেল মায়ের মন। মুনারা মিনমিন করে বললেন, "আমার মনে হয় ওর কথাটা একবার শোনা উচিত আপনার। ও তো আর এমনি এমনি এসব বলবে না।"

অমনি হুংকার ছুড়লেন আমির, "তোমাকে আমি চুপ করতে বলেছি না? আর একটা কথা বললে কিন্তু খুব খারাপ হবে।"

মায়ের অসম্মানের হুল সেঁজুতির গায়ে বিঁধল এবার। এত সময়ের নেতানো মুখাবয়বে সহসা স্পর্ধা এসে ভিড়ল।

"মাকে ধমকাচ্ছ কেন, বাবা? মা তো ঠিকই বলেছে। আমি তোমার মেয়ে, তুমি আমার কথা না ভেবে তোমার সম্মানের কথা ভাবছ? কেমন বাবা তুমি!"

আমিরের উষ্ণ নেত্র ক্রোধের শিখায় জ্বলজ্বল করে উঠল। তপ্ত চোখে ফিরতেই ঢোক গিলল সেঁজুতি।

কোপে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে গেলেন তিনি। ঘোষণা দিলেন কঠোর গলায়, "আমার কাছে আমার সম্মানের থেকে বড়ো কিচ্ছু না। তুমিও না। যখন ওই ছেলের কথা এসে জানিয়েছিলে, তখন তো আমি না করিনি। তাহলে?"

সেঁজুতি চোখ মুছল। পালটা জবাব দিলো, "না করোনি, কারণ রাফিনদের অবস্থা ভালো। ওর বাবার বিরাট ব্যবসা। তুমি যেমন চাও, ঠিক তেমন।"

কাটকাট বাক্যেও মেয়েটার আওয়াজে নম্রতার কমতি নেই। যে মানুষটাকে জীবনের সবচাইতে বেশি শ্রদ্ধা করে এসেছে, তাঁর চোখের দিক চেয়ে কথা বলার সাহস করছে প্রথমবার।

আমির হতবাক হয়ে বললেন, "কী বলতে চাইছ তুমি? আমি লোভী?"

মুনারা ছটফট করছেন নীরবে। একবার স্বামীকে দেখছেন, আরেকবার মেয়েকে। তেড়ে আসা ভয়ানক দাঙ্গায় নিজেকে অসহায় ঠেকছে খুব। আচমকা চোখ পড়ল ইতির দিকে। ফ্যাকাশে

CamScanner

চেহারায় বাবা-বোনের বাগ্ বিতণ্ডার লড়াই দেখছে সে। মুনারা খুব আস্তে বললেন, "ঘরে যা, ইতি।"
তুরন্ত, বাধ্যের ন্যায় এঁটো হাতেই উঠে গেল মেয়েটা।

"তুমি কেন বুঝতে পারছ না বাবা, রাফিনের চরিত্র ভালো নয়। আমি তো আজই জেনেছি। আর সব জেনেশুনেও ওরকম একটা ছেলেকে কীভাবে বিয়ে করব?"

মেয়ের তরল কণ্ঠে ভদ্রলোকের মন গলেছে কি? গলেনি। বরং শক্ত কণ্ঠে বললেন, "বিয়ে ভাঙার জন্যে দেখছি গুছিয়ে মিথ্যে বলতেও বাধছে না তোমার। রাফিনের ব্যাপারে আমি নিজে সব খবর নিয়েছি। যথেষ্ট ভদ্র ছেলে সে।"

সেঁজুতি আশ্চর্য বনে বলল, "আমি মিথ্যে কেন বলব?"

"সেটা তো তুমি জানবে। আজকালকার ছেলেমেয়ে তোমরা। আজ একজনকে এনে বলবে একে বিয়ে করবে, কাল আরেকজনকে এনে বলবে-আগেরজন বাদ। আমার বাড়িতে তো এসব চলবে না।"

সেঁজুতি স্তব্ধ, বিমূর্ত। হাঁ করে চেয়ে রইল বাবার পানে। দেওয়ার মতো উত্তরের জন্য ভান্ডারে সঠিক শব্দ নেই। নিজের মেয়েকে এমন বিশ্রী কথা বলতে পারলেন উনি?

ভবিতব্য বিভৎস পরিস্থিতিটাকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঠাওর করেই শিউরে উঠছেন মুনা। আনচানে ভেতরটা উশখুশ করছে কিছু বলতে। কিন্তু স্বামীকে যে প্রচণ্ড ভয়। তুলনামূলক মেজাজী মানুষ আমির। একবার রেগে গেলে রক্ষে থাকে না। তাই মেয়েকে বোঝাতে চাইলেন, "সেঁজুতি, মা আমার, এখন খাওয়ার সময় এসব না বলে চুপ কর। পরে না হয় এগুলো নিয়ে আলোচনা করিস।"

কথা টেনে নিলেন আমির, "আলোচনা করার কিছু নেই। আমি যখন বলেছি এই বিয়ে হবে, তখন হবেই। তোমার মেয়ের জন্যে লোকের উপহাস শুনতে আমি পারব না।"

বলতে বলতে ভাতের প্লেটে হাত ধুলেন তিনি। ফেরার জন্য পা বাড়াতেই সেঁজুতি ভগ্ন কণ্ঠে শুধাল, "তার মানে তুমি বিয়ে দেবেই?"

দাঁড়িয়ে গেলেন ভদ্রলোক। অমনভাবেই বললেন, "হ্যাঁ।"

CamScanner

সেঁজুতির চোখে জল। অথচ হাসি টানল ঠোঁটে। বলল, "সরি বাবা। তোমার সম্মানের জন্যে আমি আমার জীবন নষ্ট করতে পারব না।"

ঘুরে চাইলেন আমির। চোখ সরু করে বললেন, "মানে?"

এবার সোজাসুজি বাবার চোখের দিকে চাইল সেঁজুতি। নির্ভীক কন্ঠে জানাল, "মানে খুব সহজ। এই প্রথমবার তোমার আদেশ আমি মানব না।

আমিও তো তোমারই মেয়ে, বাবা। বিয়ে করব না যখন বলেছি, তখন করব না।"

বাধ্য মেয়ের আকস্মাৎ অভদ্রতায় আমির বিস্মিত, বিভ্রান্ত।

"তুমি কি আমার অবাধ্য হতে চাইছ।"

ও জবাব দিলো মুখের ওপর।

"জি! যে পিতা তাঁর সন্তানের উর্ধ্বে নিজের মান-মর্যাদা রাখে, সেই পিতার আদেশ আমার কাছে শিরধার্য নয়। তিনি নিঃসন্দেহে একজন স্বার্থপর পিতা।"

বাকস্তব্ধ হয়ে পড়লেন ভদ্রলোক। মেয়ের কাঠখোট্টা কথায় কিয়ৎক্ষণ স্তম্ভিত বনে রইলেন। চ্যাঁচিয়ে উঠলেন পরপরই, "কী বললে তুমি?"

দীর্ঘ কদমে এসেই মেয়ের গালে ঠাস করে এক চড় বসালেন আমির। মুখ চেপে পিছিয়ে গেলেন মুনারা। হঠাৎ আক্রমনে সেঁজুতি হকচকায়। অপ্রস্তুতিতে থুবড়ে পড়ে চেয়ারের হাতলে। নরম ঠোঁটের পাশ কেটে বেরিয়ে আসে রক্ত। মুনারা ছুটে গিয়ে তুললেন মেয়েকে। নিঃসহায়ের ন্যায় হাউমাউ করে কেঁদে ফেলেছেন তিনি। সেঁজুতি কিছু সময় থম মেরে রইল। উঠে দাঁড়াল আস্তেধীরে। চোখের জল শুকিয়েছে। শরীর থেকে চুপচাপ মায়ের হাতটা সরিয়ে দিলো শুধু। যেন অদম্য জেদের এক সূক্ষ্ম পোকা গায়েবিভাবে শিরায় মিশেছে আজ।

ফের বাবার মুখোমুখি দাঁড়াল গিয়ে। অটল কন্ঠের গতি, "আমাকে মারো- কাটো যা ইচ্ছে করো। এই বিয়ে হবে না, ব্যস!"

আমিরের রক্তচক্ষু দপদপ করে ওঠে। কিছু বলতে ধরলেই মুনারা ছটফটিয়ে দুজনের মাঝে এসে দাঁড়ালেন। বিনীত কন্ঠে বলেন, "আপনি মাথা গরম করবেন না। ও তো ছোটো মানুষ। কী বলতে কী বলেছে!"

CamScanner

সেঁজুতি বলল, "আমি ছোটো নই, মা। নিজের ভালো-মন্দ বুঝি। আমি বিয়ে করছি না, মানে করছি না।"

ঘোষণা দিয়ে ঘরের দিকে পা বাড়াল সে।

আমির ফেটে পড়লেন আক্রোশে। উঁচু কণ্ঠে বললেন, "তাহলে আমার কথাও শুনে রাখ তুই, এই বাড়িতে থাকতে হলে আমার হুকুম মেনে চলতে হবে। যদি না..."

মাঝপথেই ওর বিলম্বহীন উত্তর এলো, "চলে যাব তোমার বাড়ি ছেড়ে।"
ভদ্রলোক থামলেন, অবাক হলেন।

মোটা পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে ছিল ইতি। রক্তশূন্য চেহারা এবার আঁতকে উঠল বোনের কথায়।

মুনারা আর্তনাদ করে বললেন, "কী বলছিস এসব? কোথায় যাবি তুই?"

"জানি না। তবে এই বাড়িতে আর নয়।"

আমিরের চক্ষু ভরতি অবিশ্বাস। জীবনে কোনো দিন তাঁর আদেশের বাইরে না যাওয়া মেয়ের হঠাৎ এই বেয়াদবি মেনে নিতে পারলেন না।

রুষ্ট হয়ে বললেন, "তাহলে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? এক্ষুনি বেরিয়ে যা। তোর মতো অভদ্র মেয়ের জায়গা এই বাড়িতে নেই।"

"আপনি কী বলছেন? ও একা একটা মেয়ে কোথায় যাবে?"

এমনিতেই ক্ষিপ্ত আমির। স্ত্রীর ক্রন্দন, বাক্য উষ্মার আগুনে ঘি ঢালল যেন। সপাটে চড় বসাতেই থমকে গেলেন মুনারা। বিশ্বাস-অবিশ্বাসের তোড়ে চোখ দুটোতে ঘন আষাঢ় লুটিয়ে পড়ল সবেগে।

সেঁজুতি কিংকর্তব্যবিমূঢ়। সুবিশাল আকাশ বিকট শব্দে আছড়ে পড়েছে মাথায়। দাঁড়িয়ে রইল স্তব্ধ বনে। মুনারা গালে হাত চেপে নিঃশব্দে কাঁদছেন। মায়ের এই কান্না, বাবার অনাকাঙ্ক্ষিত কর্মে মানস্পটে দোদুল্যমান ধরিত্রী আরো নড়বড়ে হয়ে পড়ল। বাবা ওর সামনেই হাত তুললেন মায়ের ওপর? ইতির মাথা ঘুরছে এসবে। শীর্ণ শরীর টলছে। যেন এক্ষুনি ঢলে পড়বে মেঝেতে।

CamScanner

সেঁজুতির নিস্পন্দ চোখ তখনো বাবার ওপর আটকে। কেবল ঠোঁট নেড়ে বলল, "তুমি মাকে মারলে, বাবা?"

সহসা গর্জে উঠলেন আমির। আঙুল তুলে বললেন, "খবরদার! একদম বাবা ডাকবি না আমাকে। বেরিয়ে যা, এক্ষুনি বেরিয়ে যা।"

মুনারা ফের কিছু বলতে গেলেই আগুন চোখে চাইলেন তিনি।

"তুই আর কোনো কথা বলবি না। সব দোষ তোর!"

মুনারার রা করার স্পর্ধা নেই। দোষ না করেও দোষীর মতো মাথা নোয়ালেন। সেঁজুতির গাল থেকে জল গড়িয়ে গলা অবধি এলো। টু শব্দহীন রওনা করল ঘরে।
কাঁধব্যাগটা পড়ে আছে টেবিলে। সেঁজুতি হাতে তুলে ফিরতেই দরজায় এসে দাঁড়ায় ইতি। ফুঁপিয়ে কাঁদছে সে। সেঁজুতির ঘন বরিষা ঘেরা চোখে বোনের প্রতি টইটম্বুর মায়া। মোলায়েম কণ্ঠে ডাকল, "এদিকে আয়।"

গুটি গুটি কদমে এগিয়ে আসে মেয়েটা। সেঁজুতি বোনের মাথায় হাত বোলাল। গালে চুমু খেয়ে বলল, "ঠিকমতো পড়াশোনা করবি। একদম মায়ের অবাধ্য হবি না।"

ইতির কান্না বাধ ভাঙল এবার। জাপটে ধরল কোমর। কাঁদতে কাঁদতে বলল, "আপু তুমি যেও না। আমি তোমাকে ছাড়া কীভাবে থাকব?"

সেঁজুতি ঠোঁট কামড়ে কান্না আটকায়। কোমল হৃদয় শক্ত করে বোনের হাত দুটো ছাড়িয়ে দেয় শরীর হতে। এক মুহূর্ত না থেমে বেরিয়ে আসে লম্বা পায়ে। ইতি ছুটে এলো পেছনে।

সদর দরজার ছিটকিনি টানতেই ত্রস্ত এসে কনুই চেপে ধরলেন মুনারা।

"কোথায় যাচ্ছিস তুই?"

সেঁজুতির ছোটো জবাব, "চলে যাচ্ছি।"

"চলে যাচ্ছি মানে? পাগলামি করছিস কেন? তোর বাবা বললেন আর তুইও..."

তক্ষুনি রুঢ় গলায় আদেশ করলেন আমির, "হাত ছাড় ওর। জাহান্নামে যাক ওই মেয়ে।"

CamScanner

সেঁজুতি কাষ্ঠ হাসল এবার। দু-পা এগিয়ে বাবার সামনে এসে দাঁড়াল। কাঠিন্যের হিমালয় ছুঁয়ে ফেলা চোখদুটিতে চেয়ে বলল, "স্ত্রীর গায়ে হাত তুললে, তাকে তুই তোকারি করলে, বা মেয়েদের ওপর ইচ্ছেমতো নিজের সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিলেই আদর্শ মানুষ হওয়া যায় না। তুমি একজন ভালো শিক্ষক বাবা! কিন্তু না পেরেছ ভালো বাবা হতে, আর না পারলে আমার মায়ের ভালো স্বামী হতে। আমি তো জাহান্নামে যাচ্ছি না। উলটো তোমার বানানো জাহান্নাম ছেড়ে যাচ্ছি!"

হঠাৎ কাঁধে হাত পড়তেই চমকে উঠল সেঁজুতি। হকচকিয়ে ফিরল। আরিশার কপালে ভাঁজ বসল অমনি। সেঁজুতি তাড়াহুড়ো করে চোখের জল মোছে। হাসার চেষ্টা করে শুধায়, "কখন এলি? আমি তো টেরই পাইনি কিছু।"

আরিশার উত্তর এলো না। প্রশ্ন ছুড়ল নম্র গলায়, "আবার কাঁদছিস?"

সেঁজুতির হিচড়ে আনা হাসিটুকু সহসা মুছে যায়। সদ্য সিক্ত কোটর
আর্দ্র হয় ফের। ভিজে গাঢ় শোনাল কণ্ঠস্বর "রাফিন আমাকে না ঠকালেও পারত না, বল? ও কেন ভালোবাসেনি আমাকে? আমি কি এতটাই খারাপ?"

বলতে বলতে এক ফোঁটা উষ্ণ তরল, কার্নিশ বেয়ে কপোলে এসে লুটায়। আরিশার ভেতরটা হুহু করে উঠল। ব্যস্তভাবে পাশে বসল বন্ধুর। কণ্ঠে সবরকম দরদ ঢেলে বলল, "কাঁদিস না, বাবু। তুই কাঁদলে আমারও কান্না পায়। আসলে ভুলটা আমাদেরই। কেন যে চরিত্রহীনটার হয়ে তোর কাছে ওকালতি করতে গিয়েছিলাম।"

"তোদের কোনও দোষ নেই। সব দোষ আমার, আমার কপালের!"

"কপালের কথা বলিস না, সেঁজুতি। তোর মতো মেয়ের মুখে এমন ন্যাকা কথাবার্তা মানায় না। যা হয়েছে সব ওই শয়তানটাই করেছে। কিন্তু, আমি ভাবছি অন্য কথা। আঙ্কেল তো তোর নিজের বাবা। উনি এমনটা কীভাবে করলেন? বিয়ে একটা মানুষের সারাজীবনের প্রশ্ন। সেখানে উনি নিজের সম্মান নিয়ে পড়ে আছেন? সত্যি ভাই। এমন বাবা আমি আমার জন্মে দেখিনি। আজ কতগুলো দিন বাড়ি ছেড়ে এলি, অথচ একটা খোঁজও নিলেন না!"

সেঁজুতি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "ছাড় ওসব। যা বলেছিলাম তার কোনও ব্যবস্থা হলো?"

মুখ কালো করে মাথা নাড়ল আরিশা।

CamScanner

"না রে। অনেক জায়গায় কথা বলেছি। কেউ তেমন আশা দেখাতে পারেনি। আসলে বর্তমান এডুকেশন সিস্টেমটাই এত ঝামেলার। অভিভাবকরা আজকাল ছেলেমেয়ে পড়াতে পাব্লিক ভার্সিটির স্টুডেন্ট খুঁজে বেড়ায়। ফ্যাশন ডিজাইনিং পড়া মেয়ে দিয়ে চলবে না তাদের।"

সেঁজুতি কপাল কুঁচকে বলল, "এ আবার কেমন কথা? পাব্লিকে যারা পড়ে ওরা ভালো স্টুডেন্ট আমি মানছি। কিন্তু তাই বলে আমার পড়ানোটাও একবার দেখতে পারত। না দেখে-শুনেই মানা করে দিচ্ছে?"

আরিশা নিরস হেসে বলল, "এই যুক্তি এখন তুই বুঝবি, আমি বুঝব, ওরা কি বুঝবে? তাছাড়া ধর, তোকে রাখল, কত আর বেতন পাবি ওখানে? বড়োজোর দুই-তিন হাজার? কী হবে এটা দিয়ে? সেমিস্টার ফিই তো কতগুলো টাকা।"

সেঁজুতির শুকনো মুখটা দুশ্চিন্তায় ডুবে গেল। পুঙ্খ পুঙ্খ কালো মেঘ ছুটে বেড়াল সেথায়। আরিশা অসহায় কণ্ঠে বলল, "তুই আমার কাছে সারাজীবন থাক, তাতে আমার কোনও অসুবিধে নেই। কিন্তু অত টাকা তো আমার নিজেরও নেই রে। বন্ধু হিসেবে যে একটু পাশে দাঁড়াব তোর সেটাও পারব না।"

ছলছল চোখে চাইল সেঁজুতি। কণ্ঠে আর্দ্রতা, "এসব নিয়ে ভাবছিস কেন? আমার এত বড়ো বিপদে যে তুই পাশে আছিস, এটাই অনেক। শুধু একটা চাকরি যদি পেতাম এখন।"

"আমি সব রকম চেষ্টা করব। আপাতত এসব নিয়ে চিন্তা না করে পড়াশোনায় ফোকাস কর। সামনে পরীক্ষা না? অতদিনে একটা না একটা ব্যবস্থা হবেই।"

সেঁজুতি শ্বাস ফেলে মাথা নাড়ল। মেদুর মুখবিবরে আমাবস্যার চিহ্নটাকে বড্ড বেমানান ঠেকছে। প্রসঙ্গ পালটানোর প্রয়োজন বোধ করল আরিশা। নিভন্ত স্বরে স্ফূর্তি এনে বলল, "কী রান্না করেছিস আজকে? বিশ্বাস কর, আমি কিন্তু একদমই জানতাম না তুই এত ভালো রাঁধুনি! প্রথম দিন খেয়েই তো একেবারে ফিদা হয়ে গেছি।"

সেঁজুতি অল্প হেসে বলে, "হাত মুখ ধুয়ে আয়, খাবার বাড়ছি।"

ও কাঁধে তোয়ালে জড়াল।

"যাচ্ছি, খেয়েছিস তুই?"

"না, তোর জন্যেই বসেছিলাম।"

CamScanner

মেয়েটা বিরক্ত হয়। কপট রাগ দেখিয়ে বলে, "কতবার বলেছি বসে থাকবি না। খিদে পেলে খেয়ে নিবি।"

সেঁজুতি পালটা বিরক্তি নিয়ে বলল, "উফ, এত কথা না বলে তাড়াতাড়ি যা তো। গন্ধ বের হচ্ছে তোর গা থেকে।"

আরিশা হাঁ করে চাইতেই ও মিটিমিটি হাসে। সে মাথা নেড়ে বলল, "ঠিক আছে। গন্ধ বের হচ্ছে না? এক্ষুনি শাওয়ার নিয়ে আসছি। তারপর দেখবি সুগন্ধ কাকে বলে।"

ওয়াশরুমে ঢুকতেই সেঁজুতির হাসি মুছে গেল আবার। ফরসা মুখের চারপাশে কেবল নিষ্প্রভতার রেশ। ধীরুজ পায়ে এসে রান্নাঘরের সানসেট ঘেঁষে দাঁড়ায় সে। ছোটোখাটো জানলার গ্রিল দিয়ে বাইরেটা দেখা যায়। সতেজ পাতার শরীর জুড়ে ভর করেছে শ্রাবণ। গড়িয়ে পড়ছে ছন্দের মতো টুপটুপে জল।

সেই বর্ষার কালো অম্বুবাহী দখল চালায় সেঁজুতির মনেও। চিন্তার রেশ বাড়তে বাড়তে পাহাড় ছুঁয়ে ফেলে।

সত্যিই তো। এতগুলো টাকা কোথায় পাবে ও? এই মাসের মধ্যে কোনো ব্যবস্থা না হলে যে পরীক্ষায় বসতেও পারবে না। সেঁজুতির চোখ ভিজে উঠল ফের। জীবনে প্রথম কাউকে ভালোবেসে এত বড়ো ভুল করে ফেলেছে। যে ভুলের মাশুল হিসেবে বাড়ি ছাড়ার সাথে পড়াশোনাটাও না ছাড়তে হয় এখন!

২.
এক গাদা ছবি হাতে তুলে শূন্যে ছুড়ে মারল ছেলেটি। নিস্তব্ধ তখন বসার ঘর। উপস্থিত মানুষ দুজন ভরকে গেলেন কাণ্ডটায়। ঘটক সরোয়ার ঢোক গিললেন। সম্মুখের সোফায় বসা ভদ্রমহিলার পানে তাকালেন একপল। ফের চাইলেন ছেলেটির দিকে। রুদ্র রওশন চৌধুরী! রাগ-ক্ষোভের যুদ্ধে জেতা এক সাহসী বীর। মাত্রাধিক মেজাজের সাথে বজ্রের ন্যায় কণ্ঠস্বর। গম্ভীর শব্দের এক গর্জনই কারো রুহু উড়িয়ে দিতে সক্ষম।

সরোয়ার একটু ঝুঁকে এলেন সামনে। ফিসফিস করে বললেন, "আমি আপনাকে আগেই বলেছিলাম ম্যাডাম, আপনার ভাইপোর সাথে কথা বলুন। শুনলেন না। দেখলেন কীরকম চেতে গেল? আমার কিন্তু ভীষণ ভয় করছে!"

রেহানা চৌধুরী নিশ্চুপ। শান্ত নজরে ঘাড় বাঁকালেন।

CamScanner

"আপনি বেশি কথা বলছেন, সরোয়ার সাহেব। চুপ থাকুন, ব্যাপারটা আমি দেখে নিচ্ছি।"

রুক্ষ জবাবে মিইয়ে গেলেন তিনি। চোখ সরালেন রেহানা। ফিরে চাইলেন আগের পথে। সোজাসাপটা শুধালেন, "তোমার কি একটা মেয়েকেও পছন্দ হয়নি, রুদ্র?"

রুদ্র ঘুরে তাকায়। সুঠামদেহী, ফরসা, লম্বা, সুদর্শন পুরুষটিকে দেখলেই মুগ্ধতায় বুঁদ হন সরোয়ার। একজন পুরুষ হয়েও হাঁ করে চেয়ে দেখেন হাঁটুর বয়সি ছেলের সৌন্দর্য। কিন্তু চেহারা ভালো হয়ে কী লাভ? এই ছেলের ব্যবহার যতটা খারাপ, ততটাই জঘন্য। বাদামি নেত্রযুগলে আকর্ষণের চাইতে হিংস্রতা বেশি!

"আপনাকে আগেই বলেছিলাম ফুপি, আমি বিয়ে করব না। তাহলে উনি কী করছেন এখানে?"

গাম্ভীর্যে ডুবুডুবু স্বরটা, বসতের চার দেওয়ালে প্রতিধ্বনি তুলল। সরোয়ার মিনসে কণ্ঠে বললেন, "আমি আসতে চাইনি, বাবা। ম্যাডামই..."

"আপনি থামুন।"

অসন্তোষ চাউনি আর লঘু কণ্ঠে চুপসে গেলেন তিনি। রেহানা তিতিবিরক্ত হয়ে রুদ্রকে দেখছেন। ছেলেটাকে ছোটো থেকে কোলে-পিঠে করে বড়ো করেছেন উনি। অথচ কোথাও যেন থামতি রয়েছে কিছুর।

রুদ্র কারোর সঙ্গে মিশতে পারে না। নিজের বাবার সাথেও নয়। আত্মজেদি মানব সে। যাকে বলে স্বীয় মর্জির রাজা। একচ্ছত্র পৃথিবী জুড়ে কেবল অফিস আর শোবার ঘর। এই গণ্ডির বাইরে সে নিজেও আসেনি, কাউকে আসতেও দেয়নি। বাকী সব কিছু চুলোয় যাক। ধ্বংস হোক। তবুও তার বলিষ্ঠ দেহে নিস্পৃহতার জোয়ার।

ঘোর ভাঙল ছেলের স্থূল আওয়াজ শুনে, "আপনি কি আমার কথা বুঝতে পারেন না? আমি বিয়ে করতে চাই না।"

ভ্রু কোঁচকালেন রেহানা, "কেন? বিয়েতে কী সমস্যা তোমার?"

রুদ্র উত্তর দেয় না। সরু চোখের দৃষ্টি ঘোরায় সরোয়ারের ওপর।

"আপনি কি আর কিছু বলবেন?"

CamScanner

হঠাৎ প্রশ্নে সরোয়ার নড়ে ওঠেন। অপ্রস্তুত হন একটু। হ্যাঁ-না বলার আগেই রুদ্র কর্কশ কণ্ঠে শোনাল, "সদর দরজাটা ওদিকে।"

সোজাসুজি অপমানে ভদ্রলোকের চেহারা থমথমে হলো। চোটপাট দেখানোর ইচ্ছেতে ফুঁসে উঠল বুক। বিধিবাম! সেই সাহস তাঁর নেই। কার ওপর রাগ দেখাবেন? এই ছেলে ধার-ধারে ওসবের? বাঘা বাঘা লোক দমে যায় যার নিকট, তার কাছে সে নিতান্তই চুনোপুটি। দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়ালেন সরোয়ার।

"আসি ম্যাডাম! আসলামু আলাইকুম।"

রেহানা কিছু বলেননি। মুখটা বিতৃষ্ণায় তেতো হয়ে আছে।

একটা লোককে উনি নিজ দায়িত্বে বাড়িতে ডেকে এনেছেন, অথচ রুদ্র এইভাবে তাড়িয়ে দিচ্ছে?

সরোয়ার তখন দোরগোড়াতে। কাঁধে কালো ব্যাগ, লম্বা ছাতা বগলদাবায়। তালুর ওপর সাদা গোল টুপি। চৌকাঠে পা ফেলতে যাবেন, তুরন্ত পিছু ডাক এলো, "শুনুন।"

সহসা থেমে দাঁড়ালেন তিনি। ভীতসন্ত্রস্ত ছাপ বসল মুখে। এই ছেলে আবার কেন ডাকছে? পেছন ফিরলেন চকিতে। বিনম্র তাঁর স্বর, "জি বাবা?"

রুদ্র পকেটে এক হাত গুঁজে দাঁড়াল। শান্ত অথচ কড়া কণ্ঠে বলল, "এরপর যেন আপনাকে আমার বাড়ির ত্রিসীমানায়ও না দেখি। বাই এনি চান্স, দেখে ফেললে আপনার আর নিজের বাড়ি ফেরা হবে না। রুদ্র রওশন চৌধুরীকে তো আপনি চেনেন। সে কিন্তু এক কথার মানুষ।"

ঠোঁট দুটো ফাঁকা করে ফেললেন রেহানা। বাবার বয়সি লোকের সাথে কেউ এভাবে কথা বলে? ছেলেটা কি কোনোদিন মানুষ হবে না? শীতল হুমকিতে সরোয়ারের গলা শুকিয়ে গেছে। জবাবে মাথা নাড়লেন শুধু। রুদ্রর শক্তপোক্ত চিবুক দেখে হাসার প্রয়াস করে বললেন, "তাই, তাই হবে বাবা। আসব না আমি।"

তারপর ত্রস্ত কদমে চৌকাঠ মাড়ালেন ভদ্রলোক। বুকে ভয়। মনে হচ্ছিল এক্ষুনি ছেলেটা ভুতুড়ে সিনেমার মতন পা টেনে ধরবে। বাইরে এসে রুদ্রকে বিড়বিড় করে একচোট গালি দিলেন সরোয়ার। অহংকারী ছেলে কোথাকার। টাকার কুমির বলে মানুষকে মানুষ জ্ঞান করবি না? ভালোই হয়েছে, তার ঘটকালিতে এর বিয়ে হয়নি। এমন একগুঁয়ে ছেলের চিরকুমার থাকাই উচিত। নাহলে কোন মেয়ের কপাল পুড়ত কে জানে!

CamScanner

সাথে একটু-আধটু মন খারাপও করলেন। রেহানা চৌধুরী সকালে ফোন করতেই সব দিকের কাজ রেখে একপ্রকার ছুটে এসেছিলেন তিনি। দশ বাড়িতে গিয়ে যা পান, এই এক বাড়িতে আয় হয় দ্বিগুণ। আজকের রোজগারও ভালোই জমত, যদি না ঐ ছেলে এসে বিগড়ে দিত সব। আচ্ছা, ছেলেটা এত রগচটা কেন হয়েছে? বাড়ির বাকিদের ব্যবহার কী বিনয়ী। অথচ এর কী মেজাজ। বিপি সবসময় গাছের ডগায়। সরোয়ার ঘাম মুছতে মুছতে মেইন গেইট পার হলেন। এখান থেকে মূল রাস্তা আরো কিছুটা দূরে। সে পথে যাওয়ার পূর্বে পিছু ফিরলেন একপল। চোখ বোলালেন গোটা বসতে। আহা। বাড়ি তো নয়, যেন রাজপ্রাসাদ। কত বছর সাধনা করলে এমন প্রাসাদ তোলা যায়?

"একজন বয়স্ক লোকের সাথে কেউ এমন ব্যবহার করে, রুদ্র? এই শিক্ষা দিয়েছি তোমাকে?"

রেহানার কণ্ঠে রাগ-বিরক্তি একসাথে শোনাল। অথচ প্রভাব ফেলল না রুদ্রতে। ভীষণ সাবলীল তার অভিব্যক্তি! গলার টাই ঢিলে করতে করতে বলল, "আপনি হঠাৎ আমার বিয়ে নিয়ে উঠেপড়ে লেগেছেন কেন?"

"আমি একা নই। তোমার বাবাও চাইছেন তুমি বিয়ে করো।"

"আপনারা চাইলেই তো হবে না। আমাকেও চাইতে হবে। আমি এসব বিয়ে-টিয়েতে আগ্রহী নই আগেও বলেছি। আমাকে আমার মতো থাকতে দিন।"

রেহানা দাঁড়িয়ে গেলেন এবার।
কণ্ঠে উদ্বেগ নিয়ে বললেন, "তোমার মতোই তো থাকছ তুমি। আমরা কখনোই তোমার কোনও কিছুতে হস্তক্ষেপ করি না। তাই বলে সন্তানের বউ দেখার ইচ্ছে জাগাও অন্যায়? আমরা তোমাকে সংসারী দেখতে চাইতে পারি না?"

রুদ্র মুখের ওপর বলল, "না। যেটা আমি চাই না, সেটা আপনাদেরও। চাওয়া উচিত নয়। বউ দেখার হলে অভ্রর বিয়ে দিন।"

"তুমি তার বড়ো ভাই। বিয়ে তো আগে তোমার করা দরকার।"

"আমার তা মনে হয় না।"

রুদ্র সিঁড়ির ধাপে পা রাখল। রেহানা উঁচু কণ্ঠে বললেন, "আমাকে তো এবার নিস্তার দাও, রুদ্র। আর কতদিন তোমাদের এত বড়ো বাড়ি একা হাতে সামলাব?"

CamScanner

ও দাঁড়িয়ে যায়। না ফিরেই জবাব দেয়, "বেশ। আরো কজন সার্ভেন্ট অ্যাপোয়েন্ট করছি আজকে। আপনি বিশ্রাম করবেন। তবুও, অজুহাতে বউ চেয়ে বসবেন না।"

দামি বুটের গটগট শব্দ তুলে কক্ষে চলল সে। রেহানা হতাশ চোখে চেয়ে রইলেন সেদিকে। মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন ফের। নাহ, এই ছেলে দিয়ে আর কোনো আশা নেই!

"এক কাপ চা দাও!"বসার ঘরে বসে হুকুম ছুঁড়লেন আমির।

মুনারা উত্তর পাঠালেন ত্রস্ত, "দিচ্ছি।"

নম্র স্বর, অথচ ভেতর ভেতর ফেঁপে উঠলেন ক্রোধে। মেয়েটা আজ সাত দিন বাড়িতে নেই। আত্মীয়-স্বজন কারো কাছে যায়নি। গতকাল আমির বাড়ি থেকে বের হওয়ার পরপরই আরিশাকেও ফোন করেছিলেন তিনি। সেখানেও নেই বলল। মেয়ের চিন্তায় রাতে ঘুম হয় না মুনারার। প্রতিটা ভোর আসে হাঁসফাঁস করতে করতে। অথচ আমির? দিব্যি নাক ডেকে ঘুমিয়ে থাকেন। একটুখানিও বিচলিত দেখা যায় না। মুনারা স্বামীর এই রূপে অবাক হন। মানুষ এত স্বার্থপর হয়? চোখের পর্দায় সেঁজুতির মুখখানা ভেসে উঠতেই রমণীর কোটর ভিজে যায়। অধৈর্য আমির ফের ডাকলেন, "কী হলো? একটা চা দিতে এতক্ষণ লাগে?"

"হয়ে গেছে, আসছি।" শাড়ির আঁচলে চোখ মুছলেন মুনারা। চা নামিয়ে কাপে ঢাললেন দ্রুত।

শুক্রবার আজ। সকল শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান বন্ধ। বারান্দার চেয়ারে বসে বই পড়ছেন আমির। এই তো পাশের স্কুলেই চাকরি করেন ভদ্রলোক। দারুণ অঙ্ক শেখান। তাঁর নাম শিক্ষার্থীদের মুখে মুখে থাকে। লোকটার কঠোরতা কেবল বাড়িতে নয়, স্কুলেও। নিয়মে-নীতিতে সর্বদা তটস্থ, অনুগ্র থাকে সবাই। এই এলাকাতেও বেশ সম্মানীয় লোক আমির। এক কথায় তুখোড় জ্ঞানী আর আদর্শবান শিক্ষক হিসেবে পরিচিত। অথচ ভালো বাবা, সেটা কি হতে পেরেছেন?

ছোটো থেকে ধমক শুনে শুনে বড়ো হয়েছে মেয়ে দুটো। হাজারটা আদেশ-নিষেধ সেথায়। বউ হিসেবে মুনারার নিজেরও ছাড় মেলেনি। বিয়ের পরদিন হতেই স্বামীর রগচটা রূপ দেখেছেন কেবল।

"দাঁড়িয়ে আছো কেন? কখন থেকে হাত পেতে আছি, চা দাও।"

ভদ্রমহিলা ধ্যান থেকে নড়ে উঠলেন। তৎপর পিরিচসহ কাপটা এগিয়ে দিলেন সামনে। আমিরের সহজ দৃষ্টিতে তীক্ষ্ণতা এসে ভিড়ল। স্ত্রীর দিক চেয়ে চেয়ে চুমুক দিলেন চায়ে।

CamScanner

"ইতি কোথায়?"

"পড়ছে।"

"ওর দিকে একটু খেয়াল রাখবে। পরীক্ষার কিন্তু এক সপ্তাহও বাকি নেই।"

মুনারার ছোটো উত্তর, "হু।"

ভদ্রলোকের কপালে ভাঁজ পড়ল এবার। মুনারার থমথমে মুখবিবর মনযোগ দিয়ে দেখলেন। চা শেষ হওয়া অবধি দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি।

খালি কাপ বাড়িয়ে দিলে নিশ্চুপ এগোলেন রান্নাঘরে।

"হয়েছে কী তোমার, মুনা?"

সহসা দাঁড়িয়ে গেলেন তিনি। জবাব দিলেন বিলম্বহীন, "কী হবে? কিছু না।"

আমির উঠে আসেন। কণ্ঠে বিরক্তি, "কিছু না হলে চেহারার অবস্থা এমন করে রেখেছ কেন?"

মুনারা চোখ বুজে শ্বাস ফেললেন। ভেতরের রাগ-ক্ষোভ উথলে এলো এবার। ঘুরে চেয়ে, কাটকাট উত্তর দিলেন, "যার জোয়ান মেয়ে এক সপ্তাহ নিখোঁজ থাকে, তার চেহারা কি চকচক করবে বলুন? মা তো মা-ই হয়। তাঁরা বাপের মতো স্বার্থপর হতে পারে না।"
অপ্রত্যাশিত জবাবে আমিরের মুখটা কাঠ হয়ে এলো। রুদ্ধ হলো বাকশক্তি। মুনারা আর থামেন না। হনহন করে চলে যান কাজে। ভদ্রলোকের চোখমুখ থমকে বসল স্থানে।

মনে পড়ল মেয়ের ছুড়ে যাওয়া বিষবাক্য, "তুমি না পেরেছ আমাদের ভালো বাবা হতে। না পারলে আমার মায়ের ভালো স্বামী হতে।"

৩.

কাঠফাটা গ্রীষ্মে অযাচিত অতিথির মতো উকি দিয়েছে বর্ষাকাল। প্রকৃতির সারাবেলা এখন টাপুরটুপুর জীবনানন্দে মেতে। স্বচ্ছতাহীন কাদম্বিনী, সদ্য স্নাত অম্বরে রূপ খুলেছে ওদের। তেমনই এক সজীব, সরল সকালে বিছানায় বাবু হয়ে বসে আছে সেঁজুতি। ডাগর চোখের দৃষ্টি এদিক-সেদিক ঘুরছে। মহাব্যস্ত আরিশা। ছুটে ছুটে তৈরি হচ্ছে, ব্যাগ গোছাচ্ছে। ও বলল, "আহা একটু আস্তে। পড়ে যাবি তো।"

CamScanner

মেয়েটার হন্তদন্ত জবাব, "আস্তে আস্তে বলে লাভ নেই। উঠতে এত দেরি করে ফেলেছি না! এখন পৌঁছালেও চান্স পাব কি না সন্দেহ!"

"পাবি না কেন? নিশ্চয়ই পাবি। সারাটাদিন গানের পেছনে যেই শ্রম দিস, একটা পুরস্কার তোর এমনিতেই প্রাপ্য!"

আরিশা দাঁড়িয়ে গেল। চকচকে মুখাবয়ব ঝলকে উঠল আশায়।

"একটা সুযোগ যদি পাই এবার, আর পেছন ফিরে তাকাতে হবে না রে! দোয়া কর, সেঁজুতি। বেশি বেশি করে দোয়া কর।"

সেঁজুতি মুচকি হাসল। বিছানা ছেড়ে উঠে এসে পাশে দাঁড়াল ওর। কাঁধে হাত রেখে বলল, "সবসময় দোয়া করি। তোর এত সুন্দর গানের গলা! ওনারা তোকেই সিলেক্ট করবেন, দেখিস!"

আরিশা সাহস পেল একটু। শ্বাস নিল শান্তির। পরপরই ব্যস্ত ভঙ্গিতে বলল, "আচ্ছা, আমি এখন আসি। সাবধানে থাকিস।"

সেঁজুতি মাথা নাড়ে। মেয়েটা তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে যেতেই দরজা আটকে ফিরে আসে ও। আরিশা তার ছোট্টবেলার বন্ধু। যখন থেকে একসাথে টিফিনের খাবার ভাগ করে খাওয়া যায়, সেই তখন থেকে। দুজনের বাড়িটাও পাশাপাশি। যে বয়সে প্রত্যেকটা মানুষ স্বপ্ন দেখে ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার, আরিশা স্বপ্ন বুনত কণ্ঠশিল্পী হবে। এ নিয়ে ওর পরিবারও কখনো আপত্তি করেনি। নির্দ্বিধায় সব সিদ্ধান্ত নেওয়ার স্বাধীনতা ওকে দিয়েছে। সেজন্যেই উচ্চ মাধ্যমিকের পর অনার্সে পড়তে ঢাকায় এলো আরিশা। প্রথম দিকে মামা বাড়ি থাকত। তারপর থার্ড সেমিস্টারে দু-কামড়ার এই বাসাটা ভাড়া নিয়েছে। পুরো ফ্ল্যাট জুড়ে মোট তিনটি শোবারঘর। তার মধ্যে দুটো ঘরে অন্য মেয়েরা থাকে। বসার ঘর সহ বাকি একটা আরিশার দখলে।

স্বভাবে মেয়েটা কাঠখোট্টা, স্পষ্টবাদী। আবার মনের দিক থেকে ভীষণ নরম গোছের। হয়তো এইজন্যেই ওদের এত মিল। নাহলে এমন ভর দুঃসময়ে সবার আগে কি আর ওর নামটাই মাথায় আসত সেঁজুতির?

সে ঘড়ির দিকে দেখল একপল। এগারটা বাজতে অল্প কিছুক্ষণ বাকি। আরিশা বাজার করার জন্য টাকা দিয়ে গেছে। বায়না ধরেছে খিচুড়ি খাবে। সেঁজুতি এসে জানলা খুলে বাইরে তাকাল। রাতভর বৃষ্টি হওয়া আকাশ বেশ পরিষ্কার এখন।

CamScanner

আরিশা তৈরি হতে গিয়ে, ড্রেসিং টেবিলের সমস্ত কিছু এলোমেলো করে রেখেছে। পুরো কামরা গোছগাছ করতেই সেঁজুতির সাড়ে এগারটা বাজল। সকালের নাস্তা খেতে বসেই মানস্পটে ভেসে বেড়াল মায়ের সরল মুখখানি। আজকে কতগুলো দিন পেরিয়েছে বাড়ি ছেড়ে আসার। মাকে দেখেনি, বোনকে দেখেনি। একটু আওয়াজও শোনেনি দুজনের। কেমন আছে ওরা? সেঁজুতির বুক নিংড়ে ঠিকড়ে এলো ভীষণ দীর্ঘ দীর্ঘ শ্বাস। নিয়তি কোথায় এনে দাঁড় করিয়েছে আজ!

অবশ্য একজন দুশ্চরিত্র লোকের বউ হওয়ার থেকে এমন কষ্টও শান্তির।

সময় বারোটা পেরোতেই নিভন্ত সূর্য রূপ খুলেছে নিজের। হুটহাট জেঁকে বসেছে রোদ। চড়া তাপে নরম ত্বক ঝলসে যাওয়ার জোগাড় হলো। গত রাতের শহর ভেজা বৃষ্টি এখন, রৌদ্রোজ্জ্বল মোহনীয়তায় ডুবে।

সেঁজুতি ফুটপাত ধরে হাঁটছিল। বাজার করতে পুরো এক ঘন্টা লেগেছে। পিচ ঢালা রাস্তার আশেপাশের গর্তে জল জমেছে কিছু। বর্ষার পানিতে ভেসে বেড়ানো আবর্জনা এখনও লেপ্টে আছে মাটিতে। আচমকা একটি কালো গাড়ি ক্ষিপ্র বেগে পাশ কাটাল তার। সেঁজুতি হকচকায়। ছলকে ওঠা চিত্তে, সরতে যায় দূরে। অমনি চাকায় পিষ্ট নোংরা জল ছিটকে উঠল গায়ে। মুঠো থেকে খসে পড়ল বাজার ভরতি ব্যাগ। মাথার চুল থেকে জামাকাপড় সিক্ত হতে বাদ রাখেনি কিছু। গোটা বিষয়টায় হতভম্ব সে। নিজের দিকে চোখ বোলাতেই তুঙ্গে উঠল রাগ। রুষ্টতায়, ক্ষুব্ধতায় একাকার হয়ে আশেপাশে দেখল। ততক্ষণে সাঁই সাঁই বেগে সামনে এগিয়ে গেছে গাড়ি। পায়ের কাছে অনাদরে পড়ে থাকা ইটের ভাঙা টুকরো হাতে তুলল সেঁজুতি। গায়ের সবটুকু জোর খাটিয়ে ছুড়ে মারল গাড়িতে। ঝড়ের বেগে উড়ে যায় সেটা। রীতিমতো আছড়ে পড়ে জানলায়। ঝনঝন করে কাচ ভাঙার দৃশ্যে যুদ্ধে জেতার ন্যায় হাসল সেঁজুতি। পৈশাচিক আনন্দে হইহই করা বক্ষ ফুলিয়ে মুক্ত শ্বাস টানল।

ব্যাগ থেকে সবজি পড়ে গেছে মাটিতে। পাতলা পলি ছিঁড়ে বেরিয়ে এসেছে চাল। বিরক্ত মেজাজে সেসব তুলতে বসল সেঁজুতি। হঠাৎ কানে এলো খুব কাছে গাড়ি ব্রেক কষার আওয়াজ। ও চোখ তোলে। কালো গাড়িটা দেখেই টানটান হয় কপাল। এই গাড়ি ঘুরে আসার কারণ বুঝতে এক দণ্ড সময় লাগেনি। ব্যাটা ঝগড়া করতে এসেছে না-কি গাড়ির কাচ ভাঙার বিচার চাইতে?

দাঁড়া ব্যাটা, আমিও সেঁজুতি। তুই কী বলিস দেখছি। ও হাতের তালু ঝেড়ে উঠে দাঁড়াল। মনে মনে আওড়ে ফেলল কোন্দলের চওড়া প্রস্তুতি। ওপাশের গাড়ির দরজা খুলল তখন। পরপরই মাটিতে এসে ঠেকল এক জোড়া চকচকে বুট পরা পা। সেঁজুতি কপাল কোঁচকায়। দৃষ্টিতে আগ্রহ।

সেই আগ্রহ মেটাতে পুরোপুরি বেরিয়ে এলো মানুষটা। প্রসস্থ, সুঠাম গাত্র তার। চোখে কালো সানগ্লাস, গায়ে দামি স্যুট। শুভ্র গড়নের লোকটি পকেটে বাম হাত গুঁজে ঘাড় বাঁকিয়ে চাইল।

CamScanner

তুরন্ত চোখাচোখিতে থতমত খেয়ে চোখ সরাল সেঁজুতি। টের পেল জুতোর উৎকট আওয়াজ নিকটে আসছে। সে মানুষ দীর্ঘ কদমে এসে সামনে থেমেছে তার। আশেপাশে তখন লোক সমাগম। কাজ-বাজ ফেলে এদিকেই চেয়ে সকলে। রুদ্রর বাদামি চোখ সবার আগে বর্তাল সেথায়। কন্ঠ নিঃসৃত ঝাঁঝাল ধ্বনি, "এখানে সার্কাস চলছে না। হাঁ করে না থেকে নিজেদের কাজ করুন।"

লঘু বাক্য মানুষগুলোকে তীরস্থ বানায়। তৎপর হয় ব্যস্ততা দেখাতে। দাঁড়িয়ে থাকা লোকজন গতি আনে পায়ে। সেঁজুতি চোরাচোখে ওর আপাদমস্তক দেখছে তখন। রুদ্র ফিরল, ফের চোখাচোখিতে শশব্যস্ত মাথা নোয়াল মেয়েটা। জীবনের প্রথম দৃষ্টি বিনিময়েই নাক সিটকাল রুদ্র। নোংরা জলে জবুথবু তরুণীকে দেখে ভেতর হতে বমন উগলে আসতে চাইছে। চোখ-মুখ কুঁচকে, দাঁত চিবিয়ে বলল, "হাউ ডেয়ার ইউ ব্রেক দ্য গ্লাস অফ মাই কার!"

সেঁজুতির মেজাজ এমনিতেই তেতে আছে। সেই অনলে রুদ্রর কড়া কন্ঠ ঘি ঢালল যেন। রেগেমেগে বলল, "তো ভাঙব না কী করব? পূজো দেবো আপনার গাড়িকে? পাব্লিক রোডে গাড়ি চালাবেন, অথচ ভাব করবেন আমি প্লেনে বসে আছি। এসব তো হবে না মিস্টার কালো চশমা। পথে থাকা মানুষগুলোকেও খেয়াল করতে হবে।”

রুদ্রর মোটা ভ্রু সহসা বেঁকে যায়।

চোখা নাক ফুলে উঠল বাক্য ছোড়ার তোপে, "ডোন্ট কল মি সাচ স্টুপিড নেইমস। একে তো গাড়ির কাচ ভেঙেছেনে, তর্ক করছেন আবার? আপনি জানেন আমি কে?"

নেত্রদ্বয়ের তপ্ত বর্ষণ, কিংবা দরাজ স্বরের হম্বিতম্বি? কোনো কিছুতেই সেঁজুতির উদ্‌দ্বেগ দেখা যায় না। আগের মতোই বলল, "আপনি কে সেটা জেনে আমার কী লাভ? কাচ ভেঙেছি বেশ করেছি। এই যে আপনি আমার সব বাজার নষ্ট করে দিলেন, সারা জামায় কাদা মাখালেন। এসবের কী হবে?"

অজ্ঞাত, অপরিচিত মেয়ের স্পর্ধা দেখে রুদ্রর শ্বেত চিবুক মটমট করে উঠল। অথচ টু শব্দ করল না। পকেট থেকে মানিব্যাগ এনে কড়কড়ে কিছু নোট বাড়িয়ে ধরল সামনে। রুক্ষ তার স্বর, "এখানে যা টাকা আছে, আই থিস্ত এমন দু-চারটে পোশাক, আর দু-চার ব্যাগ বাজার হয়ে যাবে আপনার।"

সেঁজুতি তাজ্জব বনে গেল। হাঁ করতে গেলেই আটকে দিলো সে। ঘোষণা করল দম্ভ সমেত, "রুদ্র রওশন চৌধুরী ইজ অ্যা হায়্যার ক্লাস পার্সন। টিপ্যিকাল মিডল ক্লাস লোকদের সাথে রাস্তায় দাঁড়িয়ে তর্ক করা তার শোভা পায় না।"

CamScanner

কথায় দাঁড়ি টেনে, টাকাগুলো সেঁজুতির সামনে ছুড়ে মারল সে। পাতলা কাগজ খোলা হাওয়ায় উড়ে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। সেঁজুতি স্তব্ধ হয়। রুদ্ধ মস্তকে, ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকে শুধু। রুদ্র আঙুল দিয়ে সানগ্লাস ঠেলে বলল, "তুলে নেবেন।"

তর্জন দিয়ে কয়েক কদম চলেও গেল সে। অমনি ডাক ছুড়ল সেঁজুতি, "দাঁড়ান।"

থামল ও। না ফিরে প্রশ্ন করল, "কম হয়ে গেছে?"

মেয়েটা নীরবে কটমটিয়ে উঠল। টাকা তুলে এগিয়ে এলো হনহনে পায়ে। লেলিহান শিখার ন্যায় সূর্যরশ্মি তখন আড়াআড়ি পড়ছে। সদর্পে ছুঁয়ে দিচ্ছে মুখোমুখি দাঁড়ানো দুজন মানব-মানবীকে। রুদ্রর তীক্ষ্ণ, প্রশ্নবিদ্ধ চাউনি মেয়েটার ক্ষুব্ধ আননে। সব কিছুর উত্তর দিতে টাকার নোটগুলো ওর মুখের ওপর পালটা ছুড়ে মারল সেঁজুতি! রুদ্র স্তম্ভিত। ব্রহ্মতালু অবধি ক্রোধের আগুনে দাউদাউ করে উঠল।

গোটা নৈসর্গে যেন বদল ঘটল সহসা। উন্মত্তের ন্যায় মাথার ওপর হতে এক ঝাঁক কালো কাক উড়ে যায়। অস্থির, অশান্ত হাওয়ায় আজ কেবল উষ্ণতার স্পর্শ। সেই সাথে ভেসে এলো সেঁজুতি কঠোর স্বর, "বুঝতেই পারছি আপনি খুব বড়লোকের বেয়ারা ছেলে। যার মধ্যে মানুষকে সম্মান করার নূন্যতম জ্ঞান নেই। শুনুন, আপনার টাকা বরং আপনি নিজের কাছেই রেখে দিন। একটা ভদ্রতার কোর্স করবেন এটা দিয়ে। যেখানে আপনাকে শেখানো হবে সভ্যতা কাকে বলে, বা সভ্য মানুষ কেমন হয়!"

রুদ্রর চোখের মধ্যে দপদপে বহ্নি। সেঁজুতি তোয়াক্কাই করল না। যেতে নিয়ে ফিরে চাইল আবার। একইরকম বলল, "ভাগ্যিস আমি আপনার মতো হায়্যার ক্লাস নই। এই যদি হয় হায়্যার ক্লাসদের নমুনা, তবে মিডল ক্লাস থাকাই ভালো।"

রাগে গজগজিয়ে চলে গেল সে। বাজারটা অবধি তোলেনি। অথচ ঠায় দাঁড়িয়ে থাকল রুদ্র। খসখসে হাত মুঠো করল সজোরে। তালুর ত্বকে নখ দাবিয়ে দেওয়ার প্রয়াস। ফেঁপে উঠল ঠাম দেহের সমগ্র শিরা। কোপ, রোষের মত্ত ধারায় থরথর করছে শরীর। ক্ষিপ্ততায় চ্যাঁচিয়ে ওঠে সত্তা, "এই মেয়েকে আমি ছাড়ব না!"

৪.

বাসায় ফিরেই মেঝেতে ধপ করে বসে পড়ল সেঁজুতি। গলার ভেতর তেজ, রাগ দলা পাকিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। আরিশা বারান্দায় ছিল তখন। কান্নার শব্দ শুনে ছুটে আসে ঘরে। প্রিয়

CamScanner

বন্ধুর এমন অবস্থায় আঁতকে ওঠে মেয়েটা। ধড়ফড়িয়ে পাশে বসে বলল, "কী হয়েছে? কাঁদছিস কেন?"

সেঁজুতি চোখ তুলল। আরিশাকে দেখেই গুটিয়ে নিল ভ্রু। বিস্ময়ে কান্না ভুলে বলল, "তুই বাসায় কেন?"

"আমার তো কাজ শেষ! অনেক আগেই চলে এসেছি। কিন্তু তোর এই অবস্থা কেন? পড়ে গেছিলি কোথাও? ব্যথা পেয়েছিস?"

ও মাথা নাড়ল দুপাশে।

"তাহলে?"

সেঁজুতির ঠোঁট ভেঙে এলো। থেমে থেমে জানাল, "ওই লোকটা, ওই ছোটলোকটা আমায় কী বলেছে জানিস?"

আরিশা বুঝতে না পেরে বলল, "কোন লোকটা?"

সেঁজুতির চোখের পর্দায় রুদ্রর শক্তপোক্ত গড়ন ভেসে উঠল। অমনি কটমটিয়ে বলল, "অসভ্য, পাঁজি, রাক্ষস লোকটার কথা বলছি! আমাকে টাকা ভিক্ষে দিয়ে বলে জামা কিনে নিতে! ভাবতে পারছিস, কত বড়ো খারাপ?"

আরিশা হতাশ কণ্ঠে বলল, "কিছুই বুঝতে পারছি না। তুই কার কথা বলছিস বল তো!".

সেঁজুতি নাক টানল। সবিস্তারিত বলল একটু আগের ঘটনা। সব শুনে আরিশা ঝিম মেরে থাকে। ভীষণ বিস্ময়ে কণ্ঠ শৃঙ্গে নিয়ে বলে, "বাপ্রেহ, কী ফাজিল লোক! এত অহংকার নিয়ে রাস্তায় হাঁটে কেন? আকাশে উড়লেই পারে।"

সেঁজুতি মাথা ঝাঁকাল। কথার সাথে একমত সে।

হঠাৎ সচেতন চোখে আশপাশ দেখল আরিশা।

"বাজার করিসনি?”
ব্যস, সেঁজুতির হিসহিস বন্ধ। বৃত্তাকার আঁখি প্রকট হলো আরো। ফেলে আসা সবজিগুলোকে ভেবেই মাথায় হাত দিয়ে বলল, "এই রে, আমি তো সব ওখানেই রেখে এসেছি। এখন কী হবে?"

CamScanner

দীর্ঘশ্বাস ফেলল আরিশা, "কী আর হবে? না খেয়ে থাকব।"

সেঁজুতির দুঃখ উপচে এলো গলায়। কেঁদে কেঁদে বলল, "এমনিতেই তোর ঘাড়ে বোঝা হয়ে আছি। আবার তোর কতগুলো টাকা নষ্ট করলাম। আমি আসলেই একটা বিপদ।"

আরিশা হতবুদ্ধি হয়। মেয়েটা কেঁদে ফেলবে বোঝেনি। ব্যস্ত হয়ে বলল, "আরে বোকা মেয়ে, কাঁদছিস কেন? আমি তো মজা করছিলাম। এই সেঁজুতি, তাকা আমার দিকে, এই..."

বলতে বলতে ছোট্ট মুখটা নিজেই ঘুরিয়ে আনল সে। বর্ষা ঘেরা চোখদুটো যত্নে মুছিয়ে বলল, "আমাদের বন্ধুত্ব বুঝি এত ঠুনকো? সামান্য টাকার জন্যে তুই আমার বোঝা হবি-এমন ভাবলিও-বা কী করে? পাগলি! আর কখনো এসব বললে মার খাবি কিন্তু.."

কন্ঠে নিপাত অভিমান তার। সেঁজুতি মনঃস্তাপ নিয়ে বলল, "তাহলে এখন কী রান্না করব?"

আরিশা কাঁধ উচিয়ে বলল, "রান্না করতে হবে কেন? আজকে বরং আমরা বাইরে খাব। কেমন?"

সেঁজুতি চোখ বড়ো করে বলল, "বাইরে? না না, অতগুলো টাকা!"

ধমক ওঠে মেয়েটা, "চুপ। এসব নিয়ে তোকে কে ভাবতে বলেছে? আমি আছি তো। আর, তাছাড়া আজকে কী হয়েছে জানিস?"

সেঁজুতি আবার মাথা নাড়ল দুপাশে। আরিশার মুখখানা নিমিষে হাসিহাসি হয়। বলতে গিয়ে খুশির স্রোত উথলে আসে কন্ঠে, "ওনাদের আমার গান খুব ভালো লেগেছে। বলেছে ফোন করে ডাকবে।"

সেঁজুতির নেত্রযুগল চকচক করে উঠল। মিলিয়ে গেল ফোলা চেহারা।

"সত্যি?"

"হ্যাঁ। নে ওঠ এবার। গোসল কর। তারপর বের হব।"

"আচ্ছা। এক্ষুনি যাচ্ছি।"

CamScanner

চটপটে পায়ে উঠে, ছুটে গেল মেয়েটা। প্রস্থান পথে চেয়ে চেয়ে আরিশার নিজের হাসিই কমে আসে। মুখটা ডুবে যায় তিমিরে। বাড়ি থেকে যা টাকা পাঠায় তাতে কেবল ওর খরচটুকু চলে। বর্তমান জিনিসপত্রের দাম যে হারে বাড়ছে। তা দিয়ে একজন চলাই দুষ্কর যেখানে, সেখানে সেঁজুতিটার জন্যে বাড়তি কিছু খরচ করার উপায় অবধি নেই। আরিশা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। সমস্যায় সে নিজেও ভুগছে। হাত টানাটানি পড়ে গেছে এ মাসে। কিন্তু সেঁজুতিকে এসব কিছু বুঝতে দেওয়া যাবে না। মেয়েটার মন-মেজাজ ঠিক নেই। ফুরসত পেলেই একা একা ফুঁপিয়ে কাঁদে। ভালোবাসার মানুষের দেওয়া যোঁকা, আবার মাথার ওপর থেকে বটগাছের ছায়া সরে যাওয়া। সব মিলিয়ে ও যে ভেতর থেকে কতটা বিধ্বস্ত, সেসব বোঝার ক্ষমতা আরিশার আছে। বন্ধুর জন্যে নরম মনে মায়া গলে এলো মেয়েটার। চোখ বুজে মুখ

তুলল আকাশপথে। খুব করে চাইল, কোনো একটা মোড় আসুক। একটা মিরাকল হোক। এক লহমায় বদলে যাক সেঁজুতির জীবনে লেখা সমস্ত দুঃখের গল্প!

বেলা দুইটা বেজে কুড়ি মিনিট। তখনো খাঁ খাঁ রোদ্দুর চারিদিক।

যতদূর চোখ যায় তাপদাহের শাসনে ঝলমলে প্রকৃতি। ধানমণ্ডির মোড়ে শ্রান্ত রিক্সা থামতেই নেমে দাঁড়ায় আরিশা। ভাড়া মেটাতে মেটাতে আশপাশে চোখ বোলাল সেঁজুতি। বাইরের ফুরফুরে হাওয়ায় তার একটু আগের মন খারাপ উবে গেছে। হুট করেই চনমনে লাগছে সবকিছু। যেন কোনো সুখের পাখি তার দুই ডানার ভর ছেড়েছে শীর্ণ কাঁধের ওপর। জিজ্ঞেস করল খোশ মেজাজে, "এটা কোন জায়গা?"

"ধানমণ্ডি। ওই যে তোকে মাঝেমধ্যে রবীন্দ্র সরোবরের কথা বলি? এই বাম দিকে গেলেই পড়ে।"

"যাবি?"

সেঁজুতির কন্ঠ উচ্ছ্বল।

"তুই যেতে চাস?"

মাথা নাড়ল ও। সে বলল, "আচ্ছা খেয়ে নিই আগে, তারপর।"

বলতে বলতে ওর হাত ধরল আরিশা। সাবধানে পা ফেলে ব্যস্ত রাস্তা পার হলো। অথচ পুরোটা সময় তার দিকে চেয়ে রইল সেঁজুতি। আরিশা দেখতে সুন্দরী। সবসময় নিজেকে পরিপাটি রাখে। স্ট্রেইট চুলগুলো কোমর অবধি নেমেছে। গায়ের রং আহামরি শুভ্র। যতবার দেখে, ততবার সেঁজুতির চোখ জোড়া মুদে আসে মুগ্ধতায়।

CamScanner

বাবার গায়ের রংটাও এমন। সে পেয়েছে মায়ের ধাঁচ। গোলগাল আদুরে মুখের সাথে উজ্জ্বল ফরসা ত্বক।

বাবার কথা মনে পড়তেই সেঁজুতির বুকটা হুহু করে উঠল। আম্মা, এই যে রাগ করে ও বাড়ি ছেড়ে এলো, তাঁর কি একটুও মনে পড়ে না? পড়লে তো খোঁজ নিতেন। এত নিষ্ঠুর বাবাও কি হয় কারো?

সেঁজুতির চিন্তাভাবনার মাঝেই লিফটের বাটন টিপল আরিশা। রেস্তোরা তখন কোলাহলে মেতে। চারপাশের সবখানে কাচের বেষ্টনী। চেয়ার-টেবিলে বসেই বাইরেটা স্পষ্ট দেখা যায়। আরিশা চোখ ঘুরিয়ে নিরিবিলি জায়গা খুঁজল। সামনে এগোলে পিছু নিল সেঁজুতি। দরজায় "স্মোকিং জোন" লেখাটা খেয়াল করেনি সে।

ভেতরে ঢুকতেই এক দলা পোড়া ধোঁয়া এসে ঠিকড়ে পড়ল নাকে। গন্ধে সেঁজুতির শ্বাস আটকে আসে। চোখ-মুখ কুঁচকে চারপাশে দেখল। জায়গা ফাঁকা। কেবল ওপাশ ফিরে এক ভদ্রলোক বসে আছেন। আরিশা ততক্ষণে একটা টেবিল বেছে বসেছে। সেঁজুতি খুকখুক করে কাশতে কাশতে বলল, "এটা কোথায় এলাম? আমার তো দমই আটকে আসছে রে ভাই। মরে গেলে খাব কী করে?"

তার কথায় দাঁড়ি পড়তেই পিঠ ফেরানো লোকটি সবেগে ঘুরে চাইল। আরিশা কিছু বলতে যায়, শশব্যস্ত ডাক ছুঁড়ল সে, "সেঁজুতি?"

এন্ড পিছু ফিরল ওরা লোকটির চেহারা দেখেই নিস্তব্ধ হয়ে পড়ল সেঁজুতি। আরিশা বসা থেকে দাঁড়িয়ে যায়। স্পষ্ট আওড়ায়, "রাফিন ভাই!"

টেবিলের সমস্ত জিনিস হাত দিয়ে ঠেলে ফেলে দিলো রুদ্র। ধড়াম করে লাথি মারল চেয়ারে। প্রকোপে উলটে পড়ল সেটা। অথচ রাগের চুল পরিমাণ কমেনি তার। ফ্যাসফ্যাসে শ্বাস নিতে নিতে পায়চারি করল কিছুক্ষণ। এসে অন্য চেয়ারে বসল তারপর। গলা থেকে টাই খুলে ছুড়ে মারল দূরে।

এক্ষুনি হন্তদন্ত পায়ে ভেতরে ঢুকলেন বাবা রেহান চৌধুরী। গোছানো কেবিনের লন্ডভন্ড দশা দেখেই দাঁড়িয়ে গেলেন দরজায়। মৃদু আর্তনাদ করে বললেন, "এসব কী?"

রুদ্র চোখ মেলে না। ঠায় বসে রয়। রেহান তীক্ষ্ণ চোখে চেয়ে রইলেন ওর দিকে। অবিলম্বে বুঝে নিলেন অব্যক্ত মতিগতি। ছেলে ভয়ানক রেগে আছে এখন। অবশ্য এ কখন রেগে থাকে না?

CamScanner

মেজাজ তার নাকের ডগায়। কী খেয়ে যে এই ছেলেকে পয়দা করেছিলেন আল্লাহ মালুম। বাপ হয়েও সামলাতে পারেন না।

গলা খাঁকারি দিলেন রেহান। কোমল কন্ঠে শুধালেন, "তুমি কি কিছু নিয়ে চিন্তিত?"
উত্তর এলো থমথমে, "আমি একটু একা থাকতে চাই, ড্যাড। উইল ইউ প্লিজ এক্সকিউজ মি।"

রুদ্রর বরফ কন্ঠ। ততোধিক শীতল অভিব্যক্তি তার। অথচ বন্ধ চোখের পাতায় চেয়ে হতাশ শ্বাস ফেললেন বেহান। মা মরা ছেলেটাকে নিজের হাতের ওপর বড়ো করেছেন তিনি। অথচ আজ অবধি রাগটুকু নিয়ন্ত্রণে আন্য যায়নি।

নিশ্চুপ পা বাড়ালেন ফিরতে। কিছু একটা ভেবে, ঘুরে চেয়ে বললেন, "বিকেলে একটা কনফারেন্স রেখেছি। স্টল কিন্তু আগামী সপ্তাহ থেকেই বসবে।"

রুদ্র অমনভাবেই জবাব দেয়, "মনে আছে।"

ভদ্রলোক বেরিয়ে গেলেন এরপর। ফেরত এলেন স্বীয় কেবিনে। ফোন তুলে কল করলেন কাউকে। ওপাশ থেকে মুহূর্তে রিসিভ হলো।

"হ্যালো করিম সাহেব, মেয়ে পেয়েছেন?"

করিম শেখ একটি নামকরা চ্যানেলের পরিচালক। স্বভাবে অতিমাত্রায় বিনয়ী। ভীষণ নম্রভাবে জানালেন, "পেয়েছি, স্যার। আজ সকালেই একট মেয়ে এসেছিল এখানে। স্মার্ট লেডি, দেখতেও সুন্দরী। আমার পছন্দ হয়েছে। আপনি দেখবেন একবার?"

"গুছিয়ে কথা বলতে পারবে?"

"মনে হয় পারবে। আমাদের সাথে তো বেশ ভালোই বলেছে।"

"তাহলে আর আমার দেখার প্রয়োজন নেই। আপনার ওপর আমার একশভাগ ভরসা আছে।"

আপ্লুত হাসলেন ভদ্রলোক। বললেন, "ঠিক আছে, স্যার। আমি সব কথা ফাইনাল করেই জানাচ্ছি আপনাকে।"

CamScanner

লাইন কেটে রেহান ডুব দিলেন ফাইলে। হঠাৎ ছেলের কথা ভেবে, দেওয়ালের দিক চাইলেন। সুবিশাল টেলিভিশনের পর্দায় সিসিটিভির ফুটেজগুলো স্পষ্ট ভাসছে। এর মধ্যে রুদ্রর কেবিনও আছে। অবশ্য এই কথা

সে জানে না। জানলে রেগেমেগে অফিসটাই না উড়িয়ে দেয়।

টিভির দিকে চেয়ে চেয়েই ভ্রু কুঁচকালেন রেহান। এখনও একইভাবে বসে রুদ্র। চোখ বুজে কপাল ঘষছে আঙুলে। আশ্চর্য! আবার হলো কী ছেলেটার।

বন্ধ অফিস কক্ষে রুদ্রর অক্ষিপটে তখনো সেঁজুতির কর্দমাক্ত চেহারা। যতবার মনে আসছে, ততবার দুস্ত্যজ চোয়াল ভেসে উঠছে দুপাশের। পিষে যাচ্ছে দন্ডপার্টি। জীবনে প্রথম, এই প্রথম তার চোখের দিকে চেয়ে কথা বলেছে কেউ। প্রথম কেউ সাহস দেখিয়েছে তাকে অপমান করার। ভরা রাস্তার মধ্যে ওর মুখের ওপর টাকা ছুড়ে মারা? যে রুদ্র রওশন চৌধুরীর ভয়ে গোটা অফিস তটস্থ। এক ধমকে কেঁপে ওঠে সবাই। সেই রুদ্রর সঙ্গে কর্কশ স্বরে কথা বলেছে মেয়েটা। ঐ মেয়েকে তো সে ছাড়বে না। একবার দেখা মিলুক, কড়ায়-গন্ডায় বুঝিয়ে দেবে রুদ্র রওশন চৌধুরীর সঙ্গে তেজ দেখানোর ফল কত ভয়ানক হতে পারে।

রুদ্র ফোন তুলল কানে। স্ক্রিনে আনসেভ নম্বর ভাসছে। রিসিভ হতেই আদেশ করল, "উত্তরা এগারো নং সেক্টরের কাঁচা বাজার থেকে মেইন রোড অবধি যতগুলো মেয়ে যাতায়াত করবে, তাদের সবার ডিটেইলস আমার চাই। একটা মেয়েও যেন বাদ না যায়। আই রিপিট, একটা মেয়েও না।”

৫.
খুব স্বাভাবিকত্বের মাঝেও, অস্বাভাবিক কিছু দেখলে চমকে উঠতে হয়। বজ্রপাতে ঝলসে যাওয়া দেহের মতন, কিংবা ঘূর্ণিঝড়ে নড়বড়ে চারাগাছ? বুকের মধ্যে থাকা সত্তাটা তেমনই হয়ে পড়ে। সেঁজুতির চোখ জোড়া বিস্ময়ে নিশ্চল এখনও। স্তব্ধতার দাপটে মুড়ে এসেছে শরীর। সম্মুখের মানবটিকে দেখে ঠোঁট দুটো নিজ শক্তিতে আলাদা হয়ে গেল। শুধু অস্ফুট আওড়াল, "রাফিন!"

ঝড়ের বেগে উঠে এলো ছেলেটা। কোনো কিছু বোঝার আগেই ছোঁ মেরে ছিনিয়ে নিল সেঁজুতির পেলব এক হাত। চেপে ধরল শক্ত বাঁধনে। হন্তদন্ত প্রশ্ন ছুড়ল, "কোথায় ছিলে তুমি? বিয়ে কেন ভেঙেছিলে? হোয়াই?"

সেঁজুতি ধাতস্থ হয়েছে। সামলে নিয়েছে বিভ্রম। স্বীয় হাতের দিকে চাইল একপল। খুব আস্তে বলল, "হাত ছাড়ো।"

CamScanner

রাফিন শুনল, তবে মানল না। উলটে জোর খাটানো শক্তি দৃঢ় করল আরও। সেঁজুতি মোচড়ালেও একজন বলবান পুরুষের নিকট তার শক্তি তুচ্ছ।

রাফিন দাঁত চেপে বলল, "চেষ্টা করে লাভ নেই, সেঁজুতি। তোমাকে আজ আমার হাত থেকে কেউ ছোটাতে পারবে না। ভালোয় ভালোয় আমার প্রশ্নের উত্তর দাও। বিয়ে না করে বাড়ি থেকে পালিয়েছিলে কেন? এইভাবে আমার, আমার পরিবারের সম্মান কেন নষ্ট করেছ? বিয়ে করবে বলেও, কেন ঠকিয়েছ আমায়?"

সেঁজুতি অবাক হয়। দুই ভ্রু উচিয়ে বলে, "আমি তোমায় ঠকিয়েছি, রাফিন? আর তুমি, তুমি আমায় ঠকাওনি?"

"আমি ঠকাব মানে? কী করেছি আমি, বলো কী করেছি?"

রাফিন চ্যাঁচিয়ে উঠল। তাদের দুজনের মধ্যে নীরব দর্শক বনে দাঁড়িয়ে ছিল আরিশা। এই বিয়ে নামক বোঝাপড়াটা একান্ত ওদের। সেখানে সে স্রেফ তৃতীয় ব্যক্তি। তারওপর অপ্রত্যাশিতভাবে রাফিনকে এখানে দেখে আরিশাও সমান বিহ্বলিত। কী বলবে, কী করবে বুঝতে না পেরে চুপচাপ শুনছিল সব। রাফিনের উচ্চবাচ্যে মুখ খুলল এবার।

"ভাইয়া প্লিজ। একটা পাব্লিক প্লেসে এরকম সিনক্রিয়েট করবেন না।"

"তুমি চুপ করো। এটা আমাদের দুজনের ব্যক্তিগত ব্যাপার। তুমি বাইরের লোক, বাইরের লোকের মতো থাকো। একদম এর মধ্যে ঢুকবে না।

রাফিনের কড়া কন্ঠ। অপমানে আরিশা মাথা নোয়ালেও সেঁজুতি খ্যাপে বলল, "রাফিন, আরিশা আমার বন্ধু। ওর সাথে এইভাবে কথা বলার অধিকার তোমাকে কে দিয়েছে? আর কীসের ব্যক্তিগত? একটা ঠকবাজের সঙ্গে আমার অন্তত ব্যক্তিগত বলে কিছু নেই। হাত ছাড়তে বলেছি, হাত ছাড়ো।"

আক্রোশে ফেটে পড়ল রাফিন।

"ঠকবাজ! কাকে ঠকবাজ বলছ তুমি? তোমাকে ঠকানোর মতো কী করেছি আমি, হ্যাঁ? নিজে বিয়ে করবে না বলে আমার ঘাড়ে দোষ চাপালে তো হবে না, সেঁজুতি। তুমি না আমাকে ভালোবাসো? কোথায় গেল সেই ভালোবাসা?"

সেঁজুতি চড়া কন্ঠে প্রতিবাদ করে, "না। আমি কোনো দুশ্চরিত্র ছেলেকে ভালোবাসি না।"

CamScanner

রাফিন হতবাক, হতবিহ্বল। বিভ্রান্তির তোপে ভাঁজ বসল কপালে। ও নিজেই বলল, "কী বলছি বুঝতে পারছ না, তাই না? বেশ, আমিই বুঝিয়ে বলছি.."

থামল সে। ছোট্ট একটু ঢোক গেলার সঙ্গে, গিলে নিল গলবিলে এসে দলা পাকানো কান্নাদের। রাফিনের ভ্রান্ত মুখটায় চোখ সটান রেখে বলল, "গত মাসের ২৭ তারিখ রিমঝিম আবাসিক হোটেলের সামনে আমিও ছিলাম। তুমি তোমার আরেক গার্লফ্রেন্ডকে নিয়ে যখন ভেতরে ঢুকে রুম বুক করলে? সেই সবটা আমি নিজের চোখে দেখেছি।"

সেঁজুতির নিরেট কণ্ঠে নম্রতা বিরল। অথচ কথার শেষে উষ্ণ তরল, চোখ থেকে টুপ করে গালে এসে পড়ে। রাফিনের পিলে সুদ্ধ চমকে যায়। তপ্ত চোখ নিভন্ত হয় সহসা। স্তম্বিতের তোপে হাতের সুদৃঢ় বাধন শিথিল হয়ে এলো। এসব কথা সেঁজুতি কী করে জানল, সেই প্রহেলিকায় মস্তিষ্ক ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। কিন্তু না, হার মানলে তো চলবে না। অস্থির চিত্ত শান্ত করতে জিভে ঠোঁট ভেজাল সে। সাফাই দিতে বলতে চাইল, "সেঁজুতি, লক্ষ্মীটি শোনো আমার কথা। আমি.."

পথিমধ্যেই হাত উচায় মেয়েটা। সিক্ত স্বর কঠোর করে বলে, "তোমার মতো একটা চরিত্রহীন লোকের মুখ থেকে আমার কিচ্ছু শোনার নেই। আমাদের সব কথা শেষ, রাফিন। যেমন ভাবে আমার বিশ্বাস শেষ করেছ তুমি? ঠিক তেমন ভাবে তোমার প্রতি আমার ভালোবাসাও শেষ। নূন্যতম লজ্জা থাকলে আমার সামনেও আর কখনো এসো না।"

হাতের অনামিকা থেকে স্বর্ণের চকচকে আংটিটা খুলে রাফিনের মুঠোয় ধরিয়ে দিলো সেঁজুতি। আর এক দণ্ডও থামল না সেথায়। কাচের দরজা ঠেলে বেরিয়ে গেল হনহনে পায়ে।

আরিশা যেতে যেতে তপ্ত নেত্রে রাফিনকে দেখে নেয় এক বার। ক্ষমতা থাকলে এই লম্পট ছেলেকে ও এক্ষুনি ভস্ম করে দিত।

রাফিন সেসব তোয়াক্কা করল না। অশান্ত পায়ে নিজেও ওদের পিছু পিছু গেল। প্রতিটি কদমের সাথে কণ্ঠ ঝরা অনুরোধ, "আমার কথাটা একবার শোনো, সেঁজুতি। প্লিজ, লিসেন টু মি।"

কোনো কিছুতেই মেয়েটির পদযুগল থামল না আজ। স্পষ্ট অবজ্ঞা দেখিয়ে লিফটে ওঠে সে। ইলেক্ট্রিক যন্ত্রটি রাফিন পৌঁছানোর আগেই তরতরিয়ে নেমে গেল নিচে। পরিষ্কার পরাজয়ের আঁচ পেতেই দাঁতে-দাঁত পিষল ছেলেটা। রাগে-ক্ষোভে চৌচির হয়ে প্রকাণ্ড এক ঘুসি বসাল দেওয়ালে।

আজ বোধ হয় আর রোদ উঠবে না। গাছগাছালির লম্বা পাতাও ভেজা স্যাঁতসেঁতে হয়ে আছে। বাতাবরণে শীতেল ভাব। চট করে বৃষ্টি নামবে হয়তো। না নামুক, অদৃশ্য এক ঝুম বরিষার

CamScanner

একাংশ যে নৈসর্গ ছাপিয়ে সেঁজুতির চোখের কোণেও পৌঁছে গিয়েছে, সে খবর রাখে কেউ? সারাপথ নিঃশব্দে কেঁদে গেছে মেয়েটা। অন্যদিকে পাশে বসে দিশাহীনের ন্যায় উশখুশ করেছে আরিশা। একটুখানি সান্ত্বনার আশায় জিভ তেতে উঠলেও কিচ্ছু বলতে পারেনি।

ঘরে ঢুকেই নরম বিছানায় ঢেউয়ের ন্যায় আছড়ে পড়ল সেঁজুতি। বালিশে মুখ গুঁজে হাউমাউ করে কেঁদে উঠল সাথে। কষ্ট-দুঃখ-রাগে নিঃশেষ হচ্ছে বুক। ভেতরটা ক্ষয়ে যাচ্ছে যন্ত্রণায়। ঝাপসা নেত্রেও দৃশ্য ফুটল অতীতের...

সেবার অনার্স প্রথম বর্ষের ফাইনাল দিয়েছে সে। শেষ পরীক্ষার দিন ভার্সিটি পেরিয়ে বাইরে আসতেই কোত্থেকে একটি ছোটো ছেলে দৌড়ে এলো কাছে। কথাবার্তা ছাড়াই সামনে একটি কাগজ বাড়িয়ে ধরল।

সেঁজুতি বোঝেনি। হাতে নিতেই ছেলেটি এক ছুটে পালিয়ে যায়। কে দিয়েছে, কেন দিয়েছে কিচ্ছু জিজ্ঞেস করার সুযোগ অবধি দিলো না। ঘটনায় আকস্মিকতায় তাজ্জব হয় মেয়েটা। হুড়োহুড়ি করা প্রশ্নের উত্তর জানতে ভাঁজ খোলে কাগজের। কুটিকুটি অক্ষরে লেখা,

"লাভ অ্যাট ফার্স্ট সাইটে বিশ্বাস করো, সেঁজুতি? বিশ্বাস না করলেও সত্যি হলো, তুমি আমার লাভ অ্যাট ফার্স্ট সাইট। একেবারে প্রথম দেখায় ভালোবেসে ফেলেছি। কীভাবে, কেন নিজেও জানি না। এটা আমার ফোন নম্বর। তোমার কলের অপেক্ষায় রইলাম।"

রাফিন"

ফোন নং: ০১...

সেঁজুতির এন্ড মেজাজ খারাপ হলো। সহসা দুমড়েমুচড়ে ফেলে দিলো চিঠিটাকে। রাস্তার ওই পাড়ে দাঁড়ানো, চাতকের ন্যায় চেয়ে থাকা ছেলেটিকে ফিরে অবধি দেখল না। ওর সেই ব্যবহারেই আগ্রহ দ্বিগুণ বেড়েছিল রাফিনের। পরদিনই একেবারে সশরীরে গিয়ে সেঁজুতির মুখোমুখি দাঁড়াল সে। কিন্তু না। মেয়েটার সিদ্ধান্ত টলেনি। প্রেমের প্রস্তাবে রাজি হওয়া তো দূর, পাত্তা পর্যন্ত দেয়নি ওকে। রাফিনের মেইল ইগো হার্ট হয়। সেঁজুতির প্রতি দুর্বলতা বাড়ে। উঠেপড়ে লাগে ওকে বাগে আনতে। যেখানে তার মতো সুদর্শন যুবকের পেছনে হিড়িক বসে মেয়েদের, সেখানে এই মেয়ে রীতিমতো ইয়োর করে যাচ্ছে। সেঁজুতির সমস্ত বন্ধুমহল থেকে তার লম্বা হাতের যোগাযোগ, ছুটে গেল ঢাকা অবধি। সংকোচহীন দ্বারস্ত হলো আরিশার। সেঁজুতির স্মার্টফোন ছিল না। তাও বয়সের আগ্রহে বন্ধুদের ফোন থেকে একটা ফেসবুক আইডি খুলেছিল। যেখানে ঢুকত মাসে একবার। ওই, যখন যখন আরিশা ফিরত বাড়িতে। সেই আইডিতে দুজনের একসাথে তোলা ছবি ট্যাগ করে পোস্ট করত আরিশা। সেখান থেকেই ওর হদিস পেল রাফিন।

CamScanner

মেসেঞ্জারেও পৌঁছে গেল সাথে। প্রিয় বন্ধুর প্রতি একটা ছেলের এমন আকুল প্রেম দেখে আরিশার কোমল মনে গলে যায়। দিন-রাত ফোন, ম্যাসেজে চলতে থাকে রাফিনের জন্যে ঘটকালি।

ছেলেটা নিজেও প্রতিদিন সেঁজুতির ভার্সিটির সামনে দাঁড়িয়ে থাকত। কখনো-বা বাড়ির গলিতে!

একটা সময় এই জ্বালাতনগুলোই সেঁজুতির নিকট বিরক্তি থেকে মিষ্টতায় রূপ নিল। রাফিনের মুখ, তার কণ্ঠস্বর, ভালোবাসার আবদার সবকিছু বদলে গেল অভ্যেসে। আর তারপর, দীর্ঘ আট মাসের মাথায় এই প্রণয় জালে নিজেকে সমর্পণ করল মেয়েটা। ছোট্ট-খাট্ট মনখানা টুপ করে দিয়ে বসল ওকে। শুরু হলো দুজনের নতুন এক গল্প। আস্তেধীরে সময় গড়ায়। দিনকে দিন শৃঙ্গ ছোঁয় এই ভালোবাসা-বাসি। আরিশা তখন সেমিস্টার ব্রেকে বাড়িতে এসেছে। ওকে, সেঁজুতির আরো কিছু বন্ধুকে নিয়ে একটা বিস্তর প্ল্যান সাজাল রাফিন। সেঁজুতিকে মিথ্যে বলে ডেকে নিয়ে বিশাল রেস্তোরায় সবার সামনেই বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে বসল।

সেই সুরম্য অতীত ভেবে সেঁজুতির কান্না বেড়ে আসে। বেড়ে আসে বুক নিঃসৃত ব্যথার পরিমাণ। এসব ও ভাবতে চায় না। চায় না মনে করতে। শুধু মনে রাখতে চায় রাফিনের বিশ্বাসের কাচ মাথায় তুলে ভেঙে ফেলার কথা। তার চোখের সামনে দিয়ে অন্য একটি মেয়ে নিয়ে হোটেল রুমে ঢুকে যাওয়ার দৃশ্য। আরিশা অসহায়ের মতো পেছনে দাঁড়িয়ে। তার চোখেও জল। একবার হাত বাড়াল সেঁজুতিকে ছুঁতে। হাজার খানেক মনঃদ্বিধা আটকে দিলো প্রয়াস।

কাঁধব্যাগে থাকা মুঠোফোন তার স্বরে বাজতেই নিস্তব্ধ ঘর কেঁপে ওঠে তখন। সাথে আন্দোলিত হয় মেয়েটির শীর্ণ দেহ। তৎপর বাড়ানো হাত গুটিয়ে আনল সে। ফোন বাইরে আনতেই দেখল, স্ক্রিনে 'করিম স্যার" লেখা ভাসছে। আরিশা একবার ভাবল ধরবে না। সেঁজুতিটা এইভাবে কাঁদছে, এখন ওর পাশে থাকাই তার সবচেয়ে বড়ো কাজ। লাইন না কেটে সাইলেন্ট করল তাই। কিন্তু করিম শেখ বিশ্রাম নিচ্ছেন না। লাগাতার কল দেখে কপালে ভাঁজ পড়ল ওর। কোনো জরুরি কিছু হবে ভেবে চুপচাপ ফোন তুলে বাইরে চলে এলো।

"হ্যালো! আমি কি আরিশা জামানের সাথে কথা বলছি?"

ওর নম্র আওয়াজ, "জি। আমিই আরিশা, বলুন স্যার।"

করিম বললেন, "আপনার সাথে একটু দরকার ছিল, তাই ফোন করলাম।"

"হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি। আমার কি কাজটা হয়ে গেছে, স্যার?"

মেয়েটার কণ্ঠ ধৈযহীন।

CamScanner

"জি না। সেভাবে ঠিক হয়নি। হলে আপনাকে ডেকে পাঠাব। তবে আপনার সিলেক্ট হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।"

আরিশার খুশির বদলে চিন্তা বেড়ে আসে। এত বড়ো মাপের মানুষ, তাকে এমনি এমনি ফোন করেনি নিশ্চয়ই! কী ব্যাপার তবে?

জিজ্ঞেস করল, "তাহলে স্যার? কিছু হয়েছে?”
তৎপর জবাব দিলেন ভদ্রলোক, "সেরকম কিছু না। আচ্ছা, আপনি

আর.আর.সি. ইন্ডাস্ট্রির নাম শুনেছেন?"

ও একটু ভেবে বলল, "জি। অত বড়ো ব্রান্ডেড কোম্পানি কে না চেনে, স্যার।"

"হ্যাঁ, সেটা ঠিক। আসলে ওনাদের কোম্পানির তরফ থেকে প্রতিবার বসুন্ধরায় স্টল বসানো হয়। কোম্পানির প্রচারণার জন্যে বিশাল প্রোগ্রামও আয়োজন করা হয় সেখানে। এবারও হবে। তবে শুনেছি সেটা ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে হচ্ছে। মানে, বিদেশী পর্যটকরাও আসবে, বুঝেছেন? আর সেজন্যে ওনাদের কিছু সেলস উইমেন দরকার। ইন্ডাস্ট্রির চেয়্যারম্যান রেহান চৌধুরী নিজে আমাকে বলেছেন ওনাদের ইমিডিয়েট বাড়তি দুটো মেয়ে লাগবে। রাতারাতি তো পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়াও সম্ভব নয়। তাই আমি আপনার নামটা রেফার করেছি ওনাদের কাছে।"

আরিশার এন্ড রাগ হলো। যার ধ্যান-জ্ঞান সব গান নিয়ে, সে কি চাকরি করবে? কটমট করে ভাবল, "ব্যাটা, তোর কাছে আমি চাকরি চেয়েছি? এসছে আমার দরদিয়া। এত দরদ হলে গানের সুযোগ দে না।"

করিম শেখ ওকে চুপ দেখে বললেন, "হ্যালো মিস আরিশা, শুনতে পাচ্ছেন আপনি?"

আরিশা রাগ-ক্ষোভ গিলে নিল। ভদ্রতায় কী উত্তর দেবে বুঝতে পারছে না। সব মিলিয়ে ভারি দ্বিধায় পড়ল বেচারি। ইতস্তত করল, "ইয়ে মানে, স্যার আমি তো.."

মাঝপথেই কথা টেনে নেন করিম। কণ্ঠে নিশ্চয়তা, "এত ভাবছেন কেন? ওখানে কাজ পাওয়া কত বড়ো সুযোগ আপনি নিজেও জানেন না। মাত্র তিন দিনের ডিউটিতে মোটা অঙ্কের মাইনে পাবেন। যা অনেকে পুরো মাস খেটেও পায় না।"

CamScanner

এ যাত্রায় নিভে গেল মেয়েটা। সরল ভ্রু টানটান হলো আরো। মোটা অঙ্কের মাইনে। এই মুহূর্তে তো ওর নিজেরও টাকার প্রয়োজন। সাথে প্রয়োজন সেঁজুতির পাশে দাঁড়ানো। এইবার সাগ্রহে শুধাল, "কাজটা কবে থেকে করতে হবে, স্যার?"

তিনি জানালেন, "স্টল শুক্রবার থেকে বসবে। আপনি কি রাজি আছেন? আমি কি কনফার্ম করে দেবো?"

আরিশা হাঁ করতে গিয়েও ঠোঁট টিপে নিল। আচমকা মাথায় এলো সেঁজুতির কথা। ভদ্রলোক তো বললেন, দুজন মেয়ে লাগবে। তবে তো সেঁজুতিও যেতে পারে। যেভাবে হন্যে হয়ে কাজ খুঁজছে বেচারি, এত স্বপ্ন কাজে ভালো বেতন আর কী হতে পারে।

ও তড়িঘড়ি করে বলল, "আচ্ছা স্যার, আমি ছাড়াও তো আরো একজন মেয়ে প্রয়োজন বললেন। আমার চেনা একটি মেয়ে আছে। যদি বলেন তো ওকেও বলে দেখি?"

করিমের কথায়ও সমান আগ্রহ, "মেয়েটি কেমন? দেখুন এসব কাজে কিন্তু কথাবার্তা স্পষ্ট হতে হবে। সবচেয়ে বড়ো কথা ফরেইনার কাস্টমারদের কনভেইন্স করতে ইংরেজি জানা জরুরি। আপনার চেনা মেয়ে পারবে তো এসব?"

আরিশার বিলম্বহীন জবাব, "জি স্যার। আমি গ্যারান্টি। পারবে ও।"

"তাহলে তো ভালোই হলো। আচ্ছা শুনুন, আমি আপনাকে ওনাদের অফিসের ঠিকানা মেইল করে দিচ্ছি। আপনারা দুজন তাহলে কাল সকালে ওখানে চলে যান। সিলেকশনের আগে একটা ছোটোখাটো ইন্টারভিউ দিতে হবে।"

"ওকে স্যার।"

লাইন কেটেই চিন্তায় ডুবে গেল আরিশা। সেঁজুতির বুক ভাঙা কান্নার শব্দ এখান থেকেও পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে। তার নিজেরও কান্না ঘুরছে গলায়। মেয়েটা ঘরে যেতে নিয়েও গেল না। বসে পড়ল কাঠের চেয়ারটাতে। থাক, আজকে একটু কাঁদুক সেঁজুতি। এই কান্নার সাথে সমস্ত ক্লেশ, পীড়া উবে যাক ওর। সব ভুলে হালকা করুক নিজেকে।

কিন্তু সেঁজুতিকে না জিজ্ঞেস করেই ওর নাম বলা কি ঠিক হলো? মেয়েটার যা মানসিক অবস্থা এখন। কাজটা করবে তো? করলে খারাপ হয় না অবশ্য। কে বলতে পারে, এখান থেকেই হয়ত ঘুরে গেল সেঁজুতির জীবনের মোড়!

CamScanner

৬.
সেই সিক্ত দুপুরটা কোনো মতে কেটেছে। বাইরে তখন শীতল হাওয়ার অনন্য সুর। অথচ লাগাতার বিরক্ত কণ্ঠে ডেকে যাচ্ছে শালিক। তেমনই তিতিবিরক্ত আরিশা। মেয়েটা ছটফট করছে বড্ড। খিদেয় পেটের চামড়া লেগে এসেছে হাড়ে। আর এটাই ওর বীতস্পৃহার কারণ।

বিছানার এক কোণে বিষণ্ন চেহারায় বসে আছে সেঁজুতি। সুন্দর, মোমের মতো মেদুর মুখখানায় নিষ্প্রভতার চিহ্ন ছাপ তুলেছে বেশ। আর সেখানে কি না খিদে খিদে করে মরছে ও? ছি! ছি!

আরিশা নতজানু মস্তক দুপাশে নাড়ল। পরপর অসহায় নেত্রে তুলে চাইল সেঁজুতির পানে। এখনো সেই এক ভাবে বসে মেয়েটা। শরীরের একটু-আধটু নড়ন অবধি নেই। আচ্ছা ওর খিদেতে এমন অবস্থা, সেঁজুতিটাও তো সকাল থেকে না খেয়ে আছে। ফুলে থাকা চেহারার দিক চেয়ে, কিছু বলতে হাঁ করেও ঠোঁট টিপে নিল আরিশা। কী কুক্ষণ যে নেমে এলো জীবনে!

শেষমেশ উঠে, রান্নাঘরের দিকে পা বাড়াল সে। খাওয়ার মতো কিছু আছে কি না দেখতে। থাকলে রান্না করবে, তারপর জোর করে হলেও খাইয়ে দেবে ওকে। দোর অবধি গিয়েই দাঁড়িয়ে গেল। মনে পড়ল বাসায় চালই নেই। সকালে তো সেঁজুতিকে চাল-ডাল কেনার টাকাও দিয়েছিল। ইস, এখন কী হবে? আরিশা চ সূচক শব্দ করে। আবার চার তলা বেয়ে নামতে হবে এখন।

শোবার ঘরে এসে গায়ে ওড়না প্যাঁচিয়ে, পার্স হাতে তুলল দোকানে যাওয়ার জন্যে। মাঝে একপল ঘাড় ফিরিয়ে সেঁজুতিকে দেখল। মেয়েটার ভেজা মৃগনয়ন উদাসীন আজ। নিষ্পলক চেয়ে আছে বাইরে। যেন কোনো জড় বস্তু বসিয়ে রাখা বিছানায়।

আরিশার এত মায়া হলো! ওকে একা রেখে যেতেও ইচ্ছে করছে না। সদ্য পরা জুতোটা খুলে রাখল আবার। চুপচাপ কাছে এসে কাঁধে হাত রাখতেই একটু নড়ে উঠল সেঁজুতি। তাকাল মুখ তুলে। আরিশার বেশভূষা খেয়াল করে বলল, "কোথাও যাচ্ছিস?"

সবসময় চনমনে দেখে আসা মেয়েটার ভাঙা কন্ঠ শুনেই আরিশার মুখখানা তলিয়ে গেল বিষাদে। হুট করে ঠোঁট ভেঙে কেঁদে ফেলল সে। সেঁজুতি তাজ্জব বনে যায়। উদ্‌দ্বিগ্ন হয়ে বলে, "কী হলো?"

আরিশা কী বলবে জানে না। চোখ মুছতে বহাল হাতটা টেনে পাশে বসিয়ে দিলো সেঁজুতি। নিজের কষ্ট বেমালুম ভুলে ব্যস্ত হলো ওকে নিয়ে।

"কী হয়েছে তোর? কাঁদছিস কেন বল না।"

CamScanner

আরিশা নাক টানল। কাঁদার মধ্যেও খ্যাঁক করে বলল, "কেন কাঁদছি তুই জানিস না? তুই-ই তো কাঁদাচ্ছিস আমাকে।"

সেঁজুতি অবাক হয়ে বলল, "আমি কী করলাম?"

ওর কণ্ঠে অভিমান, "আবার জিজ্ঞেস করছিস কী করলাম? সেই দুপুর থেকে ওই অসভ্যটার শোকে টানা কেঁদে যাচ্ছিস। কোনো কথা নেই, কিছু নেই, মনমরা হয়ে বসে আছিস। আমার বন্ধু আমারই সামনে এমন করলে আমার কান্না পাবে না?"

সেঁজুতির চোখমুখ পালটে যায়। কিয়ৎক্ষণ থমকে থেকে হেসে ফেলল এবার। আরিশার সুন্দর চোখদুটো বড় যত্নে মুছিয়ে বলল, "পাগলি! আমি রাফিনের শোকে কাঁদছিলাম? আমি তো কাঁদছিলাম আমার ভাগ্যের কথা ভেবে।"

"কারণ যেটাই হোক, আমার সামনে কোনো কান্নাকাটি করা যাবে না। সব সময় হাসতে হবে, ব্যস।"

পরপরই স্বর নরম করে বলল, "বুঝিস না কেন, তোকে কাঁদতে দেখলে আমার খুব কষ্ট হয়!"

সেঁজুতি চোখ ফেটে জল ছুটে এলো আবার। দুঃখে নয়, আনন্দে। মেয়েটা এত ভালোবাসে ওকে! তৎপর জড়িয়ে ধরে বলল, "আর কাঁদব না দেখিস। একটুও কাঁদব না। সবসময় হাসব।"

আরিশার ঠোঁটে হাসি ফুটল। চট করে সরে এসে বলল, "তাহলে চল, ফুচকা খেয়ে আসি!"

সেঁজুতি তব্দা খেয়ে বলল, "তুই না কাঁদছিলি?"

আরিশা প্রফুল্ল চিত্তে উঠে দাঁড়ায়, "তাতে কী? আমার কাঁদতেও সময় লাগে না, হাসতেও না। তুই চল তো।"

সেঁজুতির এক ফোঁটাও যাওয়ার ইচ্ছে নেই। আবার আরিশার হাসি মুখ দেখে মানা করতেও পারল না। হেসে বলল, "ঠিক আছে। চোখেমুখে একটু জল দিয়ে আসছি।"

আরিশা ঘাড় নাড়ল। ভেতর ভেতর লুটোপুটি খেল প্রবল স্বস্তিতে। যাক। সেঁজুতিকে একটু ঠিক করতে পেরেছে এতেই শান্তি!

উত্তরা, সেক্টর ১২।

CamScanner

ছোটো ছোটো কাশফুল বনের ধারে সবে মুখ তুলে চেয়েছে। শরৎ এলেই শির উঁচিয়ে সটান দাঁড়িয়ে পড়বে ওরা। মুখোমুখি খোলা প্রান্তর ছুঁয়ে বয়ে গেছে শান্ত জলাধার। মৃদু হাওয়ার মাঝে, চারদিকে বাহারি ফুডকোর্টের ছড়াছড়ি।

সন্ধ্যে নেমে আসায় আরিশা সেঁজুতিকে নিয়ে দিয়াবাড়ির অত ভেতরে যায়নি। লোকমুখে শুনেছে অন্ধকারে জায়গাটির অনিরাপত্তা বাড়ে। দুটো মেয়ে মানুষের দিকে বিপদ তেড়ে আসতে তো সময় নেবে না।

একেবারে মেইনরোড ঘেঁষে ফুচকার যে ভ্যানগুলো দাঁড়ায়, সেঁজুতিকে নিয়ে সেখানেই গিয়ে বসল সে। চারপাশে তখন প্রচণ্ড ভিড। ভ্যানের পাশেই একটা বিশাল বড়ো বিল্ডিং দাঁড়িয়ে। কাজ চলছে সেটাতে। সাথে বৃষ্টির মৌসুমে রাস্তার বাড়তি জ্যাম। ঘিঞ্জিময় পরিবেশেও অবসন্ন অভিব্যক্তি পালটে এলো সেঁজুতির। বাষ্পের মতো উবে গেল মন খারাপের তরল রূপ।

একজন ভদ্রমহিলা ছোটো বাচ্চা কোলে এসে দাঁড়ালেন তখন। আশেপাশের কোনো টুল ফাঁকা নেই দেখে চেহারায় নিরাশার ছাপ পড়ল। একবার চেষ্টা করলেন বাবুটাকে দাঁড় করাতে। মুহূর্তে কেঁদে উঠল সে। কোল রেখে কিছুতেই নামবে না। সেঁজুতি উঠে দাঁড়ায়। নিজের টুলটা এগিয়ে দিয়ে বলে, "আপনি বসুন।"

নারীটি খুশি হলেন। চকচকে চেহারায় আপ্লুত হেসে বসলেন সেখানে। খুব বিনয়ে জানালেন, "ধন্যবাদ আপু।"

এই দৃশ্যে মুচকি হাসল আরিশা। সেঁজুতির এমন ভালোমানুষি নতুন কিছু নয়। এজন্যেই না ওকে এত ভালো লাগে।

তবে ঠোঁট ভরতি হাসিটুকু কমে এলো সেঁজুতির। দেড় বছরের ছোট্টো বাবুটির দিকে কিছুক্ষণ অপলক চেয়ে রইল। মানসপটে ইতির মুখখানা ভাসছে। ও যখন দেড় বছরের ছিল, কী যে কিউট লাগত। দাদুবাড়ি গেলে সবাই মিলে টানাটানি করত একটু কোলে নেবে বলে। অথচ সে তখন সেঁজুতির জামা শক্ত করে খামচে ধরত দুহাতে। মুখ লোকাত গলায়। মাথা নেড়ে বোঝাত, বোনের কোল ছেড়ে সে কোথাও যাবে না। সেঁজুতি দীর্ঘশ্বাস ফেলে। অন্যদিক ফিরে আলগোছে চোখের জল মুছে নেয়।

পাশের সেই বৃহৎ উঁচু বিল্ডিং হতে কেবল বেরিয়েছে রুদ্র। পেছনে তার দেহরক্ষী আশরাফুল। বাইরে তখন রোদ-বৃষ্টি কিচ্ছু নেই। অথচ নৈসর্গিক মিষ্টি পবন গায়ে পড়তেই লোকটি শশব্যস্ত বসের মাথায় ছাতা মেলে ধরলেন। এটা রুদ্রদের ফ্ল্যাট। কয়েক ফ্লোরের কাজ এখনো বাকী। রুদ্র

মাসে একবার করে সাইট ঘুরতে আসে, সবকিছু ঠিকঠাক চলছে কী না দেখতে। আজকেও তেমনই এসেছিল। ভ্যান থেকে একটু এগিয়ে তার কালো গাড়ি রাখা। ওকে দেখে ড্রাইভার নেমে এসে দরজা খুলে দিলেন। রুদ্র ভেতরে ঢুকতে যাবে, আচমকা চোখ পড়ল সম্মুখের ভিউ মিররের ওপর। পরিচিত সেই ক্ষুদ্র মুখটা দেখতেই ক্ষুরধার নেত্র অমনি সজাগ হয়ে পড়ল। দর্পণে বিম্ব ফুটেছে সেঁজুতির। মেয়েটার নিপুণ মনযোগ তখন ফুচকার প্লেটে। নিবেশনের সবটুকু দিয়ে মুচমুচে আলু ভরতি ফুচকার মধ্যে টক ভরছে সে। অথচ চিবুকের পেশি রাতারাতি বদলে গেল রুদ্রর। শুভ্র দন্তপাটি লেগে এলো একে-অন্যের গায়ে।

"সেই বেয়াদব মেয়েটা না?"

সেঁজুতি ওকে খেয়ালই করেনি। কারো হিংস্র, বাদামী দৃষ্টি যে ভর সন্ধ্যেবেলা নিশানা করেছে তাকে, ভুল করেও আন্দাজ আসেনি তরুণীর। স্ফূর্ত চিত্তে সবেমাত্র প্রথম ফুচকা মুখে পুড়ল সে, অমনি সরল অভিব্যক্তি পালটে এলো সহসা। সেঁজুতি চেহারা বিকৃত করে ফেলল। তেঁতুলের টকের স্বাদ যাচ্ছে তাই একেবারে। মনে হচ্ছে পাশের ডোবা থেকে তুলে এনেছে। ভেতরের আলুটাও কী বিশ্রী খেতে। কদিনের বাসি এসব? সেঁজুতির গা গুলিয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় ঘুরিয়ে থু দিয়ে ফেলে দিল পুরোটা। রুদ্র সবে মাত্র পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে তখন। তুরন্ত, আঠালো তরল ঠিকড়ে গিয়ে পড়ল তার পলিশ করা জুতোয়। দেহরক্ষী লোকটি আঁতকে উঠলেন। ধমকে বললেন, "এই মেয়ে, কী করেছ?"

সেঁজুতি চোখ বড়ো করে জিব কাটল। থুথু ফেলল তো ফেলল, তাও আবার কারো পায়ের ওপর! ইস! কোন বেখেয়ালে যে ছিল! ভীষণ পরিতাপে ছারখার হয়ে চোখ তুলল সে। সরি বলতে হাঁ করবে, অমনি শক্ত হলো পিঠের হাড়। ভ্যাপসা বাতায়নে উষ্ণীষ দুই চক্ষু শর ছুড়েছে যেন। সন্ধ্যেবেলার ছুটে আসা প্রভায় ধূসর নেত্র জ্বলজ্বল করছে তার। শক্তপোক্ত গড়নের মটমটে রুপ দেখেই ঘাবড়ে গেল সেঁজুতি। আবার সেই লোক? এর পায়েই থুথু ফেলেছে? ও ঢোক গিলে চারপাশে তাকাল। দুপুরের মতো শান্ত পরিবেশের এখন লেশমাত্র নেই। বরং সবদিকে উপচে পড়ছে লোকজন।

এই লোকটাকে আজকের অতটুকু সময়েই সেঁজুতি হাড়েহাড়ে চিনেছে।

এ যে কী মাত্রাধিক অভদ্র। অভদ্র নাহলে মেয়ে মানুষের গায়ে কেউ টাকা ছুড়ে মারত? কিন্তু এখন কী হবে? কাণ্ড একটা যা করে বসেছে। এই লোক তো আবার খ্যাপে যাবেন। যাবেন কী, মুখ দেখেই মনে হচ্ছে খপ করে ওকে ধরে গপ করে গিলে ফেলতে চাইছে। এত মানুষের মধ্যে যা-তা কিছু একটা বললে যে ইজ্জত শেষ।

সেঁজুতির মস্তিষ্ক দপদপ করে উঠল। সচেতন নিউরনেরা শ্লোগান দিলো,

CamScanner

"ছুট সেঁজুতি। পালা। কিছু বলার আগেই পালা।"

ঠিক সেই সময় রুদ্র তেড়ে ওঠার মতন কিছু বলতে যায়, অমনি চিৎকার ছুড়ল মেয়েটা, "আরিশা পালাআয়ায়ায়া..."

সাথে ঝড়ের বেগে ছুট লাগাল সে। রুদ্র হতভম্ব। বহ্নিশিখায় ভরতি লোচনে, রাতারাতি ভ্যাবাচ্যাকার ছাপ বসল।

আরিশা বুঁদ ছিল ফুচকায়। এক চিৎকারে বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। সাথে সেঁজুতিকে ছুটতে দেখে ভরকে গেল নিজেও। কী হয়েছে, কী ঘটেছে না বুঝে বোকার মতো নিজেও ছুটল সাথে। দোকানদার ডাকলেন, "আপা, আমার পয়সা? পয়সা না দেন প্লেটটা দিয়া যান।"

সেখানে থাকা সকল মানুষের দৃষ্টি উৎসুক। দুটো মেয়ের এমন বোকা বোকা কাণ্ড সাগ্রহে উপভোগ করছে তারা। দোকানির চিৎকারেও আরিশা থামেনি। ফুচকার প্লেট সহ দৌড়ে পালিয়েছে।

দেহরক্ষী আশরাফুল ততক্ষণে টিস্যু দিয়ে রুদ্রর জুতো মুছে দিচ্ছে। অথচ তার রাগে টগবগ করে ফুটতে থাকা রক্তে একটুখানি শীতলতা আসেনি। বরং প্রচন্ড ক্রোশে ফেঁপে উঠছে শরীর। শান্তি পেত যদি স্বয়ং ওই মেয়ের ঘাড় ধরে জুতো মোছাতে পারত। রুদ্রর আত্মজেদী সত্তা বরাবরের মতো আজকেও ব্যর্থতা মেনে নিতে পারে না। টানটান দেহে দাঁড়িয়ে বিষাক্ত সর্পের ন্যায় ফোঁসফোঁস করল শুধু। পোক্ত চিবুকে পণ করল, "একবার হাতে পাই, কড়ায়-গন্ডায় বুঝিয়ে দেবো রুদ্র রওশন চৌধুরীকে অপমান করার ফল কত মারাত্মক হতে পারে!"

"সেঁজুতি দাঁড়া। এই সেঁজুতি!"

ডাক শুনে থামল ও। পিছু ফিরল ত্রস্ত। আরিশা ছুটে এসে পাশে দাঁড়ায়। কোমরে হাত দিয়ে জোরালো শ্বাস টানে। হাঁপাতে হাঁপাতে শুধায়, "অমন ছুটছিলি কেন? লোকটাকে সরি বললেই তো হতো।"

সেঁজুতির শুষ্ক আদল। নিজেও সমান হাঁপাচ্ছে। মাথা নেড়ে বলল, "হতো না। ওই লোকটা কে জানিস?"

"কে?"

CamScanner

"সকালে যার সাথে ঝামেলা করে বাজার ফেলে এসেছি। ইনিই তিনি।"

চোখ কপালে তুলল আরিশা। কন্ঠ শৃঙ্গে তুলে বলল, "কী বলছিস?"

"তাহলে ভাব, যে লোক সামান্য বিষয়ে মেয়েদের গায়ে টাকা ছুড়তে পারে, তার জুতোয় আমি থু ফেলেছি। একটা সরিতে শুনত এই লোক? উলটে ঘাড় ধরে বলত, নে আমার জুতো মুছে দে। আর দোষটা যেহেতু আমার, হার তো মানতেই হতো। অন্য কেউ হলে মুছিয়ে দিতাম কী না পরের কথা, কিন্তু ঐ অভদ্রটার জুতো? কক্ষনো না।"

আরিশা মাথায় হাত দিয়ে বলল, "আল্লাহ! এত বুদ্ধি তোর মাথায়?"

সেঁজুতি মুখ বাঁকায়।

"চুপ কর তো! মেজাজ খারাপ হচ্ছে। আজকের দিনটাই অশুভ, বুঝলি? সকালে এই লোক, তারপর রাফিন, এখন আবার এই লোক। অসহ্য!"

আরিশা মাথা দোলাল। ব্যাপারটায় সেও একমত। হঠাৎ নজর গেল স্বীয় হাতের ওপর। শঙ্কায়, উত্তেজনায় ফুচকার প্লেট অবধি সাথে নিয়ে এসেছে। হায় হায়! জিব কেটে বলল, "এই রে, ফুচকার প্লেট নিয়ে এলাম। টাকাও তো দেইনি। তুই এখানেই দাঁড়া। আমি যাব আর আসব।"

ঘুরে পা বাড়াতেই, সঙ্গে সঙ্গে হাতখানা টেনে ধরল সেঁজুতি। কন্ঠে ভয়, "যাস না। ওই বজ্জাত লোকটা যদি থাকে ওখানে!"

"হ্যাঁ, তার তো আর খেয়েদেয়ে কাজ নেই। আমাদের ধরার জন্যে দাঁড়িয়ে থাকবে।"

সেঁজুতি ঠোঁট উলটাল। আরিশা হাত ছুটিয়ে চলে যেতেই বিড়বিড় করল, "থাকতেও পারে। এত সহজে এ আমার পেছন ছাড়বে বলে মনে হচ্ছে না।"

সেকেন্ডের কাঁটা বারো লেখা পার হতেই, এগারটার অ্যালার্ম বাজল ঘড়িতে। ইতি টেবিল থেকে ঘড়িটা নিয়ে আবার বন্ধ করে রাখল। পাশ ফিরে চাইল তারপর। বসে বসে ঘুমে ঢুলছেন মুনারা।

ও আস্তে করে ডাকল, "আম্মু। আম্মু!"

নড়েচড়ে চোখ মেললেন তিনি।

CamScanner

"হু? পড়া শেষ?"

ইতি মাথা নাড়ল। বোঝাল- শেষ। বলল, "এবার যাও, ঘুমাও গিয়ে। অনেক রাত হয়েছে তো।"

উত্তরে নিশ্চুপ মুনারা। ছোট্ট করে শ্বাস ফেললেন শুধু। ও ঘরে যেতে এক ফোঁটাও ইচ্ছে করে না তাঁর। গিয়ে কী দেখবেন? নাক ডেকে নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছেন আমির। এই লোকটাকে আজকাল কেন যেন সহ্য হয় না মুনারার। দেখলেই ভীষণ রাগে মস্তিষ্ক তেতে ওঠে। এতদিনে মেয়ের একটা খোঁজ নেওয়ার চেষ্টা করেননি। এমনকি বসার ঘরের দেওয়ালে মেয়েটার যে ছবিটা টাঙানো ছিল, সেটাও নামিয়ে রেখেছে।

সেঁজুতি চলে যাওয়ার পরদিনই রাফিন এসেছিল। ওকে ফোনে পাচ্ছে না বলে খোঁজ নিতে। আমির লজ্জায় চুপ রইলেও মুনারা সত্যিটাই বলেছিলেন। আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, রাফিন কোনোরকম ঝামেলা না করে বাড়ি থেকে চুপচাপ বেরিয়ে গেল। এ নিয়ে নতুন কোনো অশান্তিও হয়নি। তাহলে ওই লোকটার কীসের এত বাড়াবাড়ি ছিল এ নিয়ে? একজন পিতা যদি মেয়ের ভালোর জন্যে সমাজের সাথে যুদ্ধই না করতে পারল, তবে সে কেমন পিতা!

মুনারা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। কোমল, ভেজা চোখদুটো ঘরময় বুলিয়ে নিলেন একপল। কোনায় কোনায় যেন খুঁজে পেলেন সেঁজুতির ছোঁয়া, ওর ছায়া। কোটর দুটো টলটলে হলো ফের। আজ কতদিন মেয়েটার মুখে মা ডাক শোনে না। বাবার সাথে এত রাগ যে ফোনটা অবধি রেখে গেছে। যোগাযোগের কোনো সুযোগই নেই।

মুনারার চোখের জল গালে এসে পড়ল। ইতির বুক মুচড়ে ওঠে তাতে। কাছে এসে মুছে দিয়ে বলল, "আপুর কথা মনে পড়ছে?"

মুনারা ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন অমনি। ইতি নিজেও ঠোঁট ভেঙে কাঁদল। বড়ো নিষ্পাপ কণ্ঠে শুধাল, "আপু কি আর আসবে না, আম্মু? বাবার ওপর রাগ করেছে বলে কি আমাদেরও ভুলে যাবে? ওর কথা আমার খুব মনে পড়ে, জানো? রাতে একটুও ঘুম আসে না।"

মুনারা সঙ্গে সঙ্গে মেয়েকে টেনে নিলেন বুকে। মায়ের চোখের পানিতে ইতির তালুর সিথিটা ভিজে যায়।

"রাতবিরেতে কী হচ্ছে এসব?"

CamScanner

আচমকা বাবার গলা শুনেই ছলকে উঠল মেয়েটা। মাকে রেখে চট করে সরে এলো দ্রুত। আলগোছে চোখ মুছে ব্যস্ততা দেখাল বইয়ে। তবে মুনারার মাঝে উদ্‌বেগ এলো না আজ। নড়লেন না, এমনকি ফিরেও চাইলেন না ওদিকে। স্ত্রীর নীরব অবজ্ঞায় নড়েচড়ে দাঁড়ালেন আমির। গম্ভীর কণ্ঠটা নামিয়ে বললেন, "এত মরাকান্নার কী আছে? তোমার মেয়ে তো হারিয়ে যায়নি। সে কচি খুকি নয়।"

তুরন্ত তপ্ত নেত্রে চাইলেন তিনি।

"মেয়ের জন্য মায়ের কান্না আপনার কাছে মরাকান্না মনে হল? তাহলে তো আর কিছু বলারই থাকে না।"

ছোটো মেয়েটার সামনে এমন কাঠখোট্টা জবাবখানায় আমির বিব্রত হয়ে পড়লেন। চিত্তভরা বিভ্রান্তি। আচ্ছা, কথাটা বলা কি ঠিক হয়নি? একটু বেশি কঠোর হতে গিয়ে আদর্শে ভাটা নামছে না তো? তাও গলার স্বর অটল রেখে বললেন, "ঠিক আছে, ঠিক আছে। এত কথার কিছু নেই। রাতেরবেলা হাউহাউ করে কাঁদলে আশেপাশের লোকজন কী বলবে?"

চোখ বুজে অতীষ্ঠ শ্বাস ফেললেন মুনারা। আবার সেই এক কথা, লোকে কী বলবে! থমথমে জবাব দিলেন, "লোকে শুধু বলতেই পারে। আমার হারিয়ে যাওয়া মেয়েটাকে তো খুঁজে এনে দিতে পারে না। এনে দিক, তারপর ওদের বলাবলি নিয়ে ভাবব।"

আমির আশ্চর্য হলেন বটে। মুনারা এভাবে কখনো কথা বলেননি। মেয়ের শোকে গলগলে কাদাও কি পাথর হতে শেখে? তিনি প্রসঙ্গ এড়ানোর প্রয়োজন অনুভব করলেন। ডাকলেন মেয়েকে, "ইতি, সকালে স্কুল আছে না?"

ধীর উত্তর ওর, "আছে আব্বু।"

"আর পড়তে হবে না। ঘুমাও এখন।"

ইতি ঘাড় কাত করল। মেলে রাখা বই গুছিয়ে ঢুকিয়ে রাখল ব্যাগে। মুনারা ঠায় বসে তখনো। স্ত্রীর মুখাবয়ব তীক্ষ্ণ চোখে দেখে নিলেন আমির। বুঝে ফেললেন, 'এই মুহূর্তে এই কোমল রমণীর কাছে সে শত্রুর চেয়েও বেশি।'

কিছু বলতে গিয়ে গলবিলে জড়তা এসে ভিড়ল। গলা খাঁকারি দিলেন। রয়ে সয়ে বললেন, "এত হা-হুতাশের তো কিছু নেই, মুনারা। তোমার আদরের মেয়ে ঢাকায় আছে, আরিশার কাছে।”

CamScanner

মুনারা চমকে তাকালেন। ধড়ফড় করে বললেন, "আপনি কী করে জানলেন? খোঁজ নিয়েছিলেন ওর?"

'হ্যাঁ।' এই অমোঘ সত্যির ছোটো শব্দটা জিভ থেকে বের করতে পারেননি আমির। কেন যেন আত্মসম্মানে অহেতুক আঘাত লাগল। গত দশদিন ধরে মেয়ের জন্য ছটফটে চিত্ত, ওপরের শক্ত আবরণ থেকে টেনে বের করতে ব্যর্থ হলেন আজও। বললেন, "না।"

মুনারা শুধালেন, "তাহলে?"

"রাফিন ফোন করেছিল আমায়। ওর সঙ্গে ধানমন্ডি দেখা হয়েছে সেঁজুতির। ভালো আছে বলল, চিন্তার কিছু নেই।"

বুক ভরে শ্বাস নিলেন মুনারা। যাক, মেয়েটা ভালো আছে শুনেও শান্তি। কিন্তু আরিশার সাথে আছে যখন, তাহলে ও সেদিন মিথ্যে বলেছিল কেন? বলল কেন যে সেঁজুতি আসেনি এখানে। কোনোভাবে কি সেঁজুতিই মানা করেছিল? হায় কপাল! এত রাগ মেয়েটার বাবার ওপর, যে মায়ের সাথেও কথা বলা যাবে না?

পরপরই অধৈর্য হয়ে বললেন, "আচ্ছা, রাফিনের সাথে সেঁজুতির কথা হয়েছে? না কি শুধু দেখা?"

ভদ্রলোকের কন্ঠস্বর নরম হলো এবার, "বলল তো দূর থেকে দেখেছে একবার। আরিশার সঙ্গে রিকশায় যাচ্ছিল কোথাও। খুঁজে পেতে সময় লাগবে না। ভেবো না।"

"খুঁজে পেলে কী করবেন? আবার বিয়ে দেবেন রাফিনের সাথে?"

বিলম্বহীন জবাব দিলেন আমির, "হ্যাঁ। রাফিন নিঃসন্দেহে ভালো ছেলে। তোমার মেয়েকে সুখে রাখবে। নাহলে যে মেয়ে বিয়ে ভেঙে পালিয়ে যায়, তাকে খুঁজতে এত মরিয়া হতো না।"

মুনারা মৃদু গলায় বিরোধাভাস করলেন, "আমার মেয়ে পালায়নি। সবার সামনে থেকে বেরিয়ে গেছে। আর যেতে বাধ্য করেছেন আপনি।"

কথার পিঠে স্তব্ধ আমির। বিহ্বল হয়ে চেয়ে রইলেন কেবল। ভদ্রমহিলা স্বামীর সেই দৃষ্টিকে গায়ে মাখেননি। ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন নীরবে।

৭.

ভরা রোদ্দুরে ঝকমকে প্রকৃতি। পূর্বদিকে হাত পা মেলেছে সূর্য। লাগাতার বর্ষণের পর চারপাশে মেদুর আলোর ছড়াছড়ি এখন।

আরিশা যতটা চিন্তায় ছিল, তেমন কিছুই ঘটেনি। বরং চাকরির কথা শুনে এক কথায় সেঁজুতি রাজি হয়ে গেছে। হোক তিনদিনের কাজ, ঘরে হাত পা গুটিয়ে বসে থাকার চেয়ে কিছু একটা করে খাওয়া ভালো। অন্তত হাত খরচটুকু চালানোর টাকা তো মিলবে। কতদিন আর বোঝা হবে অন্যের?

সেঁজুতির সেই উজ্জ্বল অথচ আড়ালের পানসে মুখখানার দিক চেয়ে আরিশা দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিল। বাড়িতে এক গ্লাস জল ঢেলে খেত এই মেয়েটা? আন্টি ওকে কতটা আদরে মানুষ করেছেন, ও জানে। অথচ আজ দেখো, ভাগ্যের কী খেলা। তিনদিনের সেলসম্যান হতেও ছুটতে হচ্ছে কাজে।

করিম শেখ গানের বিষয়ে এখনো কিছুই জানাননি। চ্যানেল হতে কোনো তথ্যও আসেনি। আরিশার মন-মেজাজ এ নিয়ে যথেষ্ট কাহিল। অত অত মানুষ অডিশন দিয়েছে, তার মধ্যে সে টিকবে তো? একে সেঁজুতির ব্যাপার, দুইয়ে নিজের চিন্তা। সব মিলিয়ে উদাস মনে রিকশায় বসে ছিল মেয়েটা। হুঁশ ফিরল পিচের রাস্তার উঁচু ঢালে রিকশা ঝাঁকি খেতেই। ধড়ফড়িয়ে চারপাশ দেখল ও। রিকশা থেমেছে। গন্তব্যের সামনেই দাঁড়িয়ে আছে এখন। ওই তো, বিশালাকার সাইনবোর্ড ঝুলছে বসুন্ধরার। ওরা নামল, ভাড়া মেটাল। আরিশা ফোন বের করে আরেকবার দেখে নিল করিম শেখের ক্ষুদে বার্তাটি। হ্যাঁ, এই ঠিকানাই দিয়েছেন ভদ্রলোক। এখন পাঁচ তলায় যেতে হবে। আরিশা বিরস নেত্রে সেঁজুতির দিক তাকায়। মেয়েটা আশপাশ দেখছে। ঢাকায় প্রথম এসেছে তো। কোনো কিছুই অত ভালো চেনে না। সে বলল, "চল।"

তার কণ্ঠে উদ্‌দ্বেগ, "কী মনে হয়, আমাদের চাকরিটা হবে?"

আরিশা কাঁধ উচাল, "কী জানি? খাজনার বাজনা বেশি এখানে। তিন দিনের কাজ তাতে আবার ইন্টারভিউ। দেখি কী হয়!"

সেঁজুতির ছোট্টখাট্ট আদলে অনুচ্চিন্তন। চুপচাপ পা বাড়াল ভেতরে।

লিফট পেরিয়ে বাইরে এসে আরিশা আরেকবার ম্যাসেজ দেখে নেয়। তারপর দেখে যায় চারপাশ। হন্যে চারটে চোখ দেখে সন্দেহী হলেন সিকিউরিটি গার্ড। আগ বাড়িয়ে বললেন, "আপনারা কি ইন্টারভিউ দিতে এসেছেন? আর আর.সি. কোম্পানির জন্যে?"

আরিশার শশব্যস্ত জবাব, "জি জি।"
"ওহ, তাহলে এদিকে যান।"

CamScanner

হাত লম্বা করে পথ দেখালেন তিনি। ও কোনোরকম ধন্যবাদ দিয়েই চটপটে কদম বাড়াল। সেঁজুতি পিছু পিছু খরগোশের ন্যায় ছুটছে। ভেতরটা তার দুশ্চিন্তায় একশেষ। সামনে পরীক্ষা, সেমিস্টার ফি-য়ের কথা মনে পড়লেই ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে মস্তিষ্ক। এই চাকরিটা হলে কিছু টাকা অন্তত জুটতো।

বেশ অনেকটা সময় কেটে গেছে তারপর। চকচকে কেবিনের বাইরে এখনও ঠায় দাঁড়িয়ে দুজনে। আরিশার হাবভাবে ব্যস্ততা। আর ঠিক ততটাই উদ্‌দ্বিগ্ন সেঁজুতি। ম্যানেজার লোকটি ওদের এখানে রেখে কেবিনে ঢুকেছেন। সেই যে গেলেন, আর বের হওয়ার নাম নেই। আর না-আছে চারপাশে বসার কোনো ব্যবস্থা। এতেই আরিশার মেজাজ তুঙ্গে উঠে যাচ্ছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পায়ে ঝিঝি পরার দশা। আচ্ছা দায়িত্বজ্ঞানহীন লোক তো এরা!

ঠিক সেসময় ভেতর হতে অন্য এক ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন। চেহারার থেকেও গলার লম্বাকার ঝুলন্ত আইডিকার্ড নজর কাড়ছে তাঁর। হাস্যহীন শুধালেন, "হু ইজ আরিশা মাঞ্জিল?"

অমনি মেয়েটা তটস্থ হয়ে দাঁড়াল। উত্তর দিতে মিইয়ে এলো জিভ।

"আমি।"

তিনি দ্বিতীয় প্রশ্ন ছুড়লেন, "হোয়্যার ইজ ইওর ক্যান্ডিডেট, ম্যাম?"

ম্যাম বলায় একটু দম ফিরল ওর। যাক, বিনয়ী লোক। সম্মান দিচ্ছে। বুক ফুলিয়ে হাঁপ ছেড়ে সেঁজুতি কে দেখাল, "এই যে উনি।"

ভদ্রলোক দুজনকে একবার একবার দেখলেন। পরপরই আরিশাকে বললেন, "ইউ মে গো ফার্স্ট!"

ও মাথা নাড়ল।

লোকটি সেঁজুতিকে বললেন, "আপনি আমার সাথে আসুন। আপনার বসার ব্যবস্থা করে দেই। স্যার ডাকলে আসবেন।"

"জি।"

আরিশা ততক্ষণে ভেতরে ঢুকে গেছে। সেঁজুতি পিছু নিল লোকটির। লোহার কতগুলো চেয়ার একসাথে সারিবেঁধে পাতানো। তিনি সেখানেই থামলেন। বললেন, "এখানে বসুন।"

CamScanner

সেঁজুতি বাধ্যের মতো বসল। এখনো ফরসা মুখবিবর ভাবনায় ডুবুডুবু। ইন্টারভিউয়ের জন্য ওরা কোনো প্রস্তুতিই নেয়নি। কী জিজ্ঞেস করবে কে জানে?

সে চোখ বুজে ক্লান্ত শ্বাস ঝাড়ল। জীবনের একটা ভুল আজ কোথায় নিয়ে এসেছে। অবশ্য এই ভুল তার জীবনের সবথেকে বড়ো শিক্ষা। যেই শিক্ষা বিপদে অনেকের অনেক রূপ দেখাল, মানুষ চিনতে বোঝাল। সাথে দেখিয়ে গেল ভালোবাসা বলতে কিছু নেই। কিছু হয়ও না। সব নাটক, ধোঁকা, প্রতারণা। মেয়েটার চোখ ভিজে ওঠে। স্পষ্ট কোটরে ঝাপসা রূপে ভেসে বেড়ায় রাফিনের ক্রুর মুখখানি। সেঁজুতি চোখ মুছে চিবুক শক্ত করল। বসে বসেই পণ করল আজ, "আর কোনো দিন কাউকে ভালোবাসবে না। কাউকে না।"

আরিশা দরজা ঠেলেছে ঠিকই, কিন্তু ভেতরে পুরোপুরি ঢোকেনি। স্তম্ভের ন্যায় দাঁড়িয়ে আছে চৌকাঠে। সম্মুখের চেয়ারে একজন অল্প বয়সি যুবক বসে আছেন। ক্লিন শেভ গাল ঝলমল করছে শুভ্রতায়। লোকটার সমস্ত মনযোগ হাতে ধরা ফোনে। কে এলো, কে গেল, কে দাঁড়াল যেন কিছু যায় আসে না। ওপাশে ভিডিয়ো কলে কেউ একজন আছে। পাশে দাঁড়ানো সেই ম্যানেজার। আরিশা ভীষণ বিব্রত হয়ে পড়ল। কী করবে? দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা শুনবে? না কি পরে আসবে?

মেয়েটা একবার যেতে নিয়েও, থামল। ফিরে চাইল। ঢুকে যখন গেছেই, চলে যাওয়া ঠিক হবে না। ছোটো কণ্ঠ উঁচু করে বলল, "আসব স্যার?"

ছেলেটা তাকায়নি। একপল চোখ তোলার প্রয়োজনবোধ অবধি করল না। তবে কলের ওপাশে থাকা মানুষটিকে বলল, "আম্মু এখন রাখছি। ইন্টারভিউ নেব।"

ওই পাড়ের ভদ্রমহিলা সায় দিতেই, লাইন কাটল অভ্র। ফোন নামিয়ে রেখে চোখ তুলল সামনে। অমনি বিমোহের তোপে আটকে রইল দৃষ্টি। শ্বেত রঙা পরিপাটি মেয়েটিকে দেখে মুগ্ধতায় ধাঁধিয়ে এলো চক্ষু।

পুরুষালি গহিন চাউনির শর সরাসরি বর্তাতেই আরিশার মেয়েলি দেহ গুটিয়ে আসে। শক্ত পাথরের ন্যায় বনে গেল নম্র পিঠ। আড়ালে-আবডালে
রাগে ফুঁসে উঠল মেজাজ। এমন করে তাকানোর কী আছে? জীবনে মেয়ে দেখেনি নাকি?
চাকরির জন্যে আগুন ধরা মাথায় জল ঢালল আরিশা। সবটা চেপে
প্রশ্ন করল মৃদু গলায়, "আসব স্যার?"

CamScanner

অভ্র থতমত খেল। চোখ ফেরাল গতিতে। গলা খাঁকারি দিয়ে ম্যানেজারকে বলল, "ফাইলটা নিয়ে আসুন তো।"

"জি স্যার।"

বেরিয়ে গেলেন লোকটি। অভ্র আরিশাকে বলল, "আসুন।"

বিনম্র পায়ে ঢুকল সে। অভ্র চেয়ার দেখাতেই বসল সেথায়। চুপচাপ বায়োডেটায় ভরতি ফাইল বাড়িয়ে দিলো ওর দিকে। অভ্র মনযোগ ধরে রাখার চেষ্টা করছে। অথচ উলটা-পালটা লাগছে সবকিছু। বেহায়ার মতো চোখের চাউনি ঘুরতে চাইছে মেয়েটাতে। তাও নিবেশনের সবটুকু জোর করে বেঁধে রাখল সে। পরিস্থিতি অনুকূলে আনতে সাহারা খুঁজল মিছিমিছি। ঠোঁট ভিজিয়ে জিজ্ঞেস করল, "আপনার নাম তাহলে আরিশা মাঞ্জিল? করিম শেখ আপনার কথাই বলেছিলেন?"

"জি।"

"এখানে কাজ করতে চাইছেন কেন? তাও তিনদিনের জন্যে!"

আরিশা বলল, "একটু অভিজ্ঞতা হতো, তাই।"

সবকটা প্রশ্ন অভ্র নিচের দিক চেয়ে করেছে। সোজাসুজি তাকাল এবার। মুচকি হেসে ফাইল ঠেলে দিলো।

"ঠিক আছে। আপনি এবার আসুন।"

বিভ্রান্ত আরিশা আরও তলিয়ে গেল বিভ্রমে। ঠোঁট টিপে উঠে দাঁড়াল তাও। চাকরিটা হবে বলে মনে হচ্ছে না। কিছুই যে জিজ্ঞেস করেনি। মনঃস্তাপ ঢেকে মাথা নেড়ে বলল, “থ্যাংক ইউ, স্যার।"

দোলাচল পায়ে বেরিয়ে গেল মেয়েটা। অভ্রর আবিষ্ট নজর তখনো লেপটে থাকে সে পথে। পরপর, বুক ফুলিয়ে জোরালো শ্বাস ফেলল। গ্লাস তুলে পানি খেলো দু-ঢোক। উঁচু কণ্ঠে হাঁক ছুড়ল, "নেক্সট।"

অভ্রর কেবিনের বাইরে পায়চারি করছে আরিশা। চিত্ত গগণ উদ্বিগ্নতায় ছেঁয়ে। পাক্কা দশ মিনিট হলো ভেতরে ঢুকেছে সেঁজুতি। অথচ এখনো কোনও খবর নেই। এতক্ষণ কী জিজ্ঞেস করছে

ওকে? কই, তাকে তো এত সময় রাখেনি। আরিশা হাতঘড়ি দেখতে দেখতে হাঁসফাঁস করল। তার এই

চিন্তা নিজের জন্যে নয়, সেঁজুতির জন্যে। এ কাজ ওর না করলেও চলবে। করিম শেখ নিজে ফোন করে বলেছেন দেখেই না আসা। মুখের ওপর মানা করলে লোকটা চটে যেতেন যদি। যোগ্যতা থাকার পরেও অডিশনের জন্য যদি সিলেক্ট না করতেন। এই ভয়েই তো এলো। কিন্তু সেঁজুতির যে একটা কাজ কত দরকার তার চেয়ে ভালো কে জানে। আরিশা মন-প্রাণ দিয়ে প্রার্থণা করল, সেঁজুতিকে যেন নিয়ে নেয়।

তার মধ্যেই দরজা খুলে বেরিয়ে এলো সে। আরিশা তীরস্থ হয়। ওকে শ্বাস ফেলতেও দেয় না। হড়বড় করে শুধায়, "কেমন হয়েছে? চাকরিটা হবে, কী মনে হয় তোর?"

সেঁজুতি নিশ্চুপ। সারা মুখে অন্ধকার। আরিশার সমস্ত কৌতূহল সহসা মিটে গেল। সমবেদনায় উপচে এলো কন্ঠ, "ভালো হয়নি, তাই না? থাক, মন খারাপ করিস না। তিনদিনের চাকরি না হলে কী হবে? এর থেকেও অনেক ভালো ভালো চাকরি আছে ঢাকায়। সেগুলো পার্মানেন্ট। কষ্ট পাস না তো। চল, তোকে আজ কাচ্চি খাওয়াব দুপুরে।"

বলতে বলতে ঘুরে হাঁটাও ধরল সে। অমনি ফিক করে হেসে ফেলল সেঁজুতি। কপালে ভাঁজ সমেত ফিরে চাইল আরিশা। সেঁজুতি আচমকা এসেই দুহাতে জাপটে ধরল ওকে। উৎফুল্ল কণ্ঠে বলল, "আমার চাকরি হয়ে গেছে।"

আরিশা লাফিয়ে ওঠে আনন্দে, "কী? সত্যি বলছিস?"

সরে এলো সেঁজুতি। পুরন্ত ঠোঁটে হাসি ধরার জায়গা নেই আজ। জোরে জোরে মাথা নেড়ে বলল, "হ্যাঁ হ্যাঁ। ভালো স্যালারি জানিস। আল্লাহ, আমার সেমিস্টার ফি-টার তো বন্দবস্ত হলো। এতেই শান্তি!"

আরিশা কিছু বলতেই যাচ্ছিল, আচমকা পাশে এসে দাঁড়ালেন একজন। গাম্ভীযহীন কণ্ঠে শুধালেন, "এক্সকিউজ মি, কারা তোমরা?"

আরিশা থামল। চকিতে চাইল পাশে। সেঁজুতির সোজাসুজি নজর পৌঁছাল প্রৌঢ় লোকটির মুখবিবরের ওপর। মোটা ভ্রু যুগল বেঁকে গেল অমনি। এ যেন কারো চেহারার সাথে অদ্ভুত মিল। কিন্তু মনে করতে পারল না।

CamScanner

আরিশা তীক্ষ্ণ চোখে ভদ্রলোকের আপাদমস্তক দেখে নেয়। পরনে ফরমাল স্যুট-কোট। নিতান্ত সুপুরুষ। মারাত্মক উচ্চতা। কী গায়ের রং।

প্রশ্ন ছুড়ল পালটা, "আপনি কে?"

রেহান মেয়ে দুটিকে ভ্রু কুঁচকে দেখলেন। কণ্ঠে অনিশ্চয়তা, "তোমরা কি ইন্টারভিউ দিতে এসেছ?"

"জি।"

মাথা দোলালেন তিনি, "আই সি। তোমরাই তাহলে করিম সাহেবের রেফারড করা মেয়ে?"

আরিশা-সেঁজুতি মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল। সেঁজুতি বলল, "কিন্তু আপনি কে, আঙ্কেল?"

"আমি আরআরসি ইন্ডাস্ট্রির চেয়্যারম্যান রেহান চৌধুরী।"

অচিরাৎ তীরস্থ হয়ে দাঁড়াল ওরা। সেঁজুতি জিব কেটে বলল, "সরি স্যার! আমি আপনাকে তখন আঙ্কেল বলে ফেলেছি।"

রেহান বিরোধাভাস করে বললেন, "না না, আঙ্কেলটাই ঠিক ছিল। স্যার বলতে হবে না। আমার আবার ওসব ফরমালিটি একদম ভালো লাগে না।"

সেঁজুতি এত প্রসন্ন হলো। হেসে মাথা নাড়ল সবেগে। আহা, কত ভালো লোক। এত বড়ো কোম্পানির চেয়্যারম্যান অথচ অহংকারের ছিটেফোঁটাও নেই? এই হলেন আসল ভদ্রলোকের বড়লোকি! আর ওই রুদ্র রওশন চৌধুরী... বজ্জাত লোক একটা! উপায় থাকলে সেঁজুতি এখন কান ধরে টেনে আনত ওটাকে। রেহান চৌধুরীকে দেখিয়ে বলত, "এই দ্যাখ, তুইও বড়োলোক আর ইনিও। অথচ তোর মতো হিংসে আছে এঁনার?"

রুদ্রর কথা মনে করেই সেঁজুতির হাসিহাসি মুখটায় বিরক্তি আসে। দাঁত পিষে বিড়বিড় করে গালি দেয় দুটো।

রেহান বললেন, "ঠিক আছে, তাহলে তোমরা থাকো। চাইলে অফিস ঘুরে দেখতে পারো। আমি বরং আসি।"

CamScanner

ওরা ঘাড় কাত করে। রেহান যেতে নিয়েও থামলেন। চাপা কণ্ঠে সতর্ক করলেন, "কাল কিন্তু সময় মতো চলে এসো। তোমাদের আসল বস দেরি করা একদম পছন্দ করে না।"

অভ্রর কেবিনে লম্বা পায়ে ঢুকে গেলেন তিনি। বোকা বোকা চোখে চেয়ে থাকে ওরা। আরিশা বিড়বিড় করে শুধাল, "এই আসল বসটা আবার কে, বলত?"

সেঁজুতি কাঁধ উচায়, "কী জানি! হবে কেউ একটা। আমি ভাবছি ওনার কথা। কত নিরহংকার মানুষ দেখেছিস! এমন মানুষের আন্ডারে কাজ করব ভাবতেও ভালো লাগছে।"

আরিশা ফটাফট বলল, "সে ঠিক আছে। কিন্তু যে ব্যাটা ইন্টারভিউ নিল?শালা এক নম্বরের লুচ্চা!"

সেঁজুতি হাঁসফাঁস করে ওর মুখ চেপে ধরে।

"আরে আস্তে। শুনতে পাবে তো।"
হাত সরাতেই ও ফিসফিস করল, "সরি! সরি!"

কী করব বল, রাগ কন্ট্রোল থাকে না। আমি ঢোকার পর থেকে এমন ড্যাবড্যাব করে চেয়েছিল। এখনো মনে করলে গায়ে কাঁটা দিচ্ছে।"

সেঁজুতি দুষ্টুমি করে বলল, "এত সুন্দরী মেয়ে আগে দেখেনি তো, তাই একটু ভরকে গেছিল বেচারা।"

আরিশা চোখ পাঁকাল, "চুপ কর! ইন্টারভিউ দিতে না এলে ওই ব্যাটার চোখে আঙুল ঢুকিয়ে দিতাম আজ।"

"আচ্ছা বাবা, ঠিক আছে। যেদিন কাজ শেষ করে চলে যাব, তখন দিস।"

সেঁজুতিকে মিটিমিটি হাসতে দেখে, চোখ সরু করল আরিশা।

"ইয়ার্কি মারছিস? আচ্ছা, কোনো ব্যাপার না। এখন মজা করছিস তো, সামনে এমন দিন আসবে দেখবি কেঁদে কূল পাবি না। তখন সবার আগে আমার কথাই মনে পড়বে তোর, হুঁহ।"

সহসা সরল হাসিটা দপ করে নিভে গেল সেঁজুতির। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "এখনই-বা কূল পাচ্ছি কই?"

আরিশা চটক কাটার মতো চাইল। ব্যস্ত হয়ে বলল, "আমি, আমি ওভাবে বলতে চাইনি, সেঁজুতি। মজা করছিলাম বিশ্বাস কর।"

ঠোঁটে শুকনো হাসি টানল ও। বলল, "আমি জানি। পৃথিবীর সবাই আমায় দুঃখ দিলেও তুই দিবি না।"

আরিশার কান্না পেয়ে যাচ্ছে। খুব কষ্টে গলবিলে আটকে রাখল তাও।

কাঁধে হাত রেখে বলল, "দুঃখের পরেই কিন্তু সুখ আসে, সেঁজুতি। দেখবি, একদিন এমন একটা মানুষ তোর জীবনে আসবে, যে তোর জীবনের প্রত্যেকটা মুহূর্ত ভাসিয়ে দেবে সুখে।"

"আমার আর কাউকে চাইনা রে, আরিশা। বিশ্বাস উঠে গেছে! আমি আর ভালোবাসতে চাই না।"

আরিশা আর কিছু বলল না। নিরুত্তর চেয়ে রইল সেঁজুতির মলিন মুখখানায়। ভাবল, "মনের ওপর কি আমাদের নিয়ন্ত্রণ থাকে? সে যে বড্ড বেহায়া। কবে, কখন, কীভাবে, কার ওপর গিয়ে বাসা বাঁধবে সেসব আমরা নিজেরাও জানি না।"

৮.
"তোমার ছেলেটার কী করবে ভাইজান?"

সবে মাংসের টুকরো তুলে মুখের সামনে ধরেছেন রেহান, থামলেন বোনের কথায়।

"বুঝিনি।"

রেহানা ফোস করে দম ফেলে বললেন, "রুদ্রর কথা বলছি। দিন দিন ওর রাগ, মেজাজ আকাশ ছুঁচ্ছে, দেখেছ? কত বেপরোয়া হয়েছে। কোনও কথাই শোনে না। কার মতো হচ্ছে বলো তো। তুমি বা ভাবি তো এরকম নও।"

রেহানের মুখমণ্ডলে হতাশার ছাপ ভিড়ল। তেমনই হতাশ কণ্ঠে বললেন, "জানি না রে। কথাটা যে আমিও ভাবছি না তা নয়। ছেলেটা আসলেই যে কার মতো হলো!"

CamScanner

"বয়স পেরিয়ে যাচ্ছে, অথচ বিয়ের নাম শুনলেই যে কী রাগ দেখায়! গতকাল সরোয়ার ঘটককে ডেকেছিলাম, জানো। তোমার ছেলে তাকে হুমকি- ধামকি দিয়ে বের করে দিয়েছে। লোকটা আর এ বাড়িতে পাও দেবে না হয়তো।"

"আমিও তাই চাই, ফুপি।"

নিম্নভার কন্ঠটা পিছু হতে আচমকা ধেয়ে এলো। ঘুরে চাইলেন দুজনে। রুদ্র এগিয়ে আসে। টেবিলের বুক থেকে চেয়ার টেনে বসে বাবার মুখোমুখি।

প্রৌঢ় দুজন একে-অন্যকে দেখে নিলেন একবার। রেহান রয়ে সয়ে বললেন, "কিন্তু চিরকুমার থাকা তো কোনো সমাধান নয়, রুদ্র। আজ বাদে কাল বিয়ে তো একটা সময় করতেই হবে।"

"কালকেরটা কাল, ড্যাড। আজ এ নিয়ে কথা উঠছে কেন?"

রেহানা বললেন, "উঠবে না কেন? তুমি কথা শুনলে তো আর এসব নিয়ে কোনো আলোচনাই করতে হতো না।”

রুদ্র কন্ঠ শান্ত, "আপনাদের আলোচনার বিষয় তো ওই একটাই। আমার বিয়ে। যেটাকে আমার কাছে অহেতুক ব্যাপার ছাড়া কিচ্ছু মনে হচ্ছে না।"
রেহান চৌধুরী ভ্রু তুললেন উঁচুতে, "বিয়ে তোমার কাছে অহেতুক ব্যাপার?"

"হ্যাঁ। এই মুহূর্তে এসব বিয়ে-টিয়ে করে আমি আমার ফোকাস লস করতে চাই না।"

রেহানা অতীষ্ঠ ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন দুপাশে। ভাইয়ের দিকে ক্লান্ত চোখে চাইলেন। তিনি বললেন, "আহ হা। বিয়ে করলে ফোকাস লস হবে কেন? বিয়ে হলো..."

রুদ্র মাঝপথেই কথা টেনে নেয়। মুখের ওপর বলে দেয়, "তুমি যত যুক্তিই দাও ড্যাড, আই'ল নট কনভেন্সড।"

ভদ্রলোক থেমে গেলেন। শ্বাস ফেললেন দীর্ঘকায়। রেহানা বুঝে নিলেন, ভাইয়ের দ্বারা হবে না। শেষবারের মতো আরেকটু চেষ্টা করতে ভীষণ নরম কন্ঠে বললেন, "রুদ্র, তোমার কি কোনো পছন্দ আছে? মানে তুমি কি কাউকে পছন্দ করো? করলে আমাদের বলতে পারো, তোমার যাকে ভালো লাগে আমরা না হয়..."

CamScanner

রুদ্র শক্ত আঙুলে কাঁটাচামচের মাথাটা নম্র চিংড়ির গায়ে ঢুকিয়ে দিলো। বড়ো পাষাণের ন্যায় এ পাশ ভেদ করে ওপাশ থেকে বেরিয়ে এলো সেটা। চোখের সামনে ধরে ধীরস্থির জানাল, "আমি তো আপনাকে বলেছি ফুপি, বউ চাইলে অভ্রর বিয়ে দিন। আমার কথা ভাববেন না।"

রেহান বললেন, "তা কী করে হয়? অভ্র তোমার ছোটো ভাই।"

রুদ্র পালটা যুক্তি দিলো, "ফুপিও তোমার ছোটো ছিল, ড্যাড। বিয়ে তোমার আগে হয়েছে, তাহলে?"

তব্দা খেলেন ভদ্রলোক। হতভম্ব নেত্রে বোনের দিকে চাইলেন। রেহানা নিজেও সমান আশাহত। মুখ খুলতে গেলেই রুদ্র জানিয়ে দেয়, "আ'ম টায়ার্ড, ফুপি। এসব অদরকারী কথা এখন ছাড়ুন।"

ভদ্রমহিলা থমকালেন। জোরাজুরি ছেড়ে মন দিলেন খাওয়ায়। তবে চোখ-মুখ কুঁচকে ছেলের দিকে চেয়ে রইলেন রেহান। ছোটোবেলা থেকে রুদ্র গম্ভীর, গুমোট, প্রচুর অহংকারী। কারো সাথে মিশবে না, বাচ্চা হয়ে অন্য
বাচ্চার সঙ্গে খেলবে না। সারাদিন পড়বে। ছেলেবেলায় এসবই করে বেড়াত।

রুদ্রর পোক্ত গড়নের সাদাটে চিবুক, দুটো বাদামি চোখ, আর সৌম্যতায় উপচে আসা আদল দেখে সেই চাউনিতে পরপরই নম্রতা ভিড়ল তাঁর।

ছেলেটা অবিকল ওনার মতন দেখতে। মনে হচ্ছে উনত্রিশ বছরের রেহান বসে ওখানে। কিন্তু তাঁর ছুরির ডগার মতো এমন মেজাজ ছিল না। তাহলে রুদ্র এমন কেন হয়েছে? মাকে কাছে পায়নি বলে কি, আর পাঁচটা ছেলে-মেয়ের মতো খোলা মনের হলো না?

ছোট্ট করে শ্বাস ফেললেন রেহান। থমথমে মেঘ ভরতি ঘরের পরিবেশ বদলানো প্রয়োজন। প্রসঙ্গ কাটাতে বললেন, "স্টলের জন্য তো আজ ইন্টারভিউ নেয়া হলো। করিম শেখ যাদের কথা বলেছেন, দুজনকেই নিয়েছে।"

রুদ্র ক্ষুদ্র জবাব দিলো, "শুনেছি।"

"তুমি কি একবার দেখবে?"

"অভ্র দেখেছে না? তাতেই হবে। আই ট্রাস্ট হিম।"

CamScanner

প্লেটের দিকে চেয়ে চেয়ে, আপ্লুত হাসলেন রেহানা। অভ্রর সাথে রুদ্র তেমন কথা বলেনি। একটু বড়ো হওয়ার পর ওর সাথে খেলতে অবধি দেখেননি। সবসময় নিজের চারপাশে একাকিত্বের জাল বিছিয়ে রাখা ছেলেটার মুখে অভ্র সম্পর্কে কিছু শুনেও শান্তি পেলেন তিনি।

রেহান এ নিয়ে আর ঘাঁটালেন না ছেলেকে। তবে উশখুশ ভাব রয়ে গেল জিভে। কণ্ঠে খানিক গাম্ভীর্য আনার চেষ্টা করে বললেন, "শুনলাম, তুমি নাকি ইদানীং ড্রাইভার ছাড়া বের হচ্ছ?"

রুদ্র ভণিতাহীন জানাল, "হুঁ। ড্রাইভ করতে ভালো লাগে আমার।"

"তাহলে সাথে গার্ড নিয়ে যাও। সেটাও তো নিচ্ছ না।"

"দরকার নেই। আমি ঠিক থাকব।"

এইবার চটে গেলেন রেহান। পুরো কণ্ঠে বললেন, "ঠিক থাকবে? এতটা নিশ্চিত হচ্ছ কী করে? তুমি কি ভুলে গিয়েছ, অলরেডি একবার তোমার গাড়িতে বোম পাওয়া গিয়েছিল? কপাল ভালো ছিল বিধায় সেসময় গাড়িতে তুমি ছিলে না। থাকলে কী হতো?"

রুদ্র তখনও নিরুদ্বেগ। একটাবার চোখ তুলে চাইল না অবধি। শুধু জবাব দিলো, "এগুলো মনে রেখে ব্রেইন নষ্ট করার কোনো মানে নেই।"

রেহান খ্যাপে বললেন, "মানে কী? ভাবতে হবে। তুমি আমার একমাত্র সন্তান। আমি কি তোমার খারাপ চাইব?"

রুদ্রের উত্তর নয়, টুংটুং করে প্লেটে চামচ চালানোর শব্দ এলো কেবল। ছেলের নীরব অবজ্ঞা দেখে রেহানের রাগ প্রকাণ্ড হলো। উত্তেজিত হয়ে বললেন, "আমি বুঝলাম না, সব বিষয়ে তোমার এত জেদ কেন? চারপাশে আমার কত শত্রু ছড়ানো-ছেটানো আছে এসব কি তোমাকে নতুন করে বলে দিতে হবে? সব কিছু নিয়ে এত বাচ্চামো কীসের তোমার?"

রুদ্র এবার তাকাল। ধূসর রঙা দৃষ্টিজোড়া শিথিলতাহীন। গাঢ় কণ্ঠে থইথই করা আত্মহংকার। বলল, "আ'ম রুদ্র রওশন চৌধুরী, ড্যাড। কারো কাঁধে ভর দিয়ে চলতে হয় না আমার। কারো সাহায্য নিয়ে আমি নিরাপত্তা চাই না। নিজের দায়িত্ব আমি নিজে নিতে শিখেছি। শত্রু একজন হোক বা দশজন। আমি লড়ব, না হয় মরব। কিন্তু ভিতুর মতো নিজেকে বাঁচাতে আরেকজনের ওপর নির্ভর করব না।"

CamScanner

ছেলের আলোড়িত কণ্ঠের একেকটি কথায় রেহানের ভান্ডারে শব্দের ভাটা পড়ল। বসে রইলেন নিশ্চুপ, পরাস্ত ভঙ্গিতে। রেহানা বললেন, "আচ্ছা থাক, ভাইজান। ছেলেটা খাচ্ছে যখন, এসব কথা বাদ দাও।"

সবকিছু থেমে গেল তারপর। বিস্তীর্ণ নীরবতা নেমে গুরুগম্ভীর করে রাখল খাবার ঘরের চার দেওয়াল। রুদ্রর চাউনি দুটো এক যোগে নাক বরাবর লেপটে। বাইরেটা শান্ত দেখালেও ভেতরে ক্রোধের ফুলকি তোলা বহ্নি। সেথায় না চাইতেও খোদ দখলদারি সেঁজুতির।

দু-দুবার খোলা রাস্তায় ওকে অপমান করেছে মেয়েটা। অথচ ক্ষমতাধর রুদ্র খুঁজে পায়নি তাকে। লোক লাগিয়েও না। যতক্ষণ না ওই মেয়েকে দিয়ে সে ক্ষমা চাওয়াবে, ততক্ষণ অবধি এক ফোঁটাও শান্তি মিলছে না। রুদ্রের মানসপটে ফের ভেসে বেড়াল, সেদিনের সেই দৃশ্য। মুখের ওপর সেঁজুতির টাকা ছুড়ে মারা। অমনি দাঁত পিষে চোখ বুজল সে। ওই মেয়েকে হাতে পেলে যে কী করবে, রুদ্র নিজেও জানে না।

তার ভাবনা কাটল রেহানের আওয়াজে।

"অভ্র কোথায়, রেহানা? খাবে না ও?

"সেই কখন ডেকে এসেছি। এখনো এলো না। দাঁড়াও ডাকছি।" তারপর নিচ থেকে হাঁক ছুড়লেন তিনি।

"অভ্র, এই অভ্র। খাবি না? তোর মামা ডাকছেন।”

উঁচু কণ্ঠের ডাক কানে গেল অভ্রর। তবে স্নায়ুতে তেমন প্রভাব ফেলেনি। এই মুহূর্তে তার নিবিষ্ট ধ্যানের সবটুকু অন্য কোথাও আটকে। ল্যাপটপের স্ক্রিনে একটি মেয়ের ছবি ভাসছে। চমৎকার হাসি হাসি মুখের ওপর অভ্রর স্থির মণি আঠার মত কয়েদি।

আজ সারাটা দিন হন্যের মতো খুঁজে আরিশার ফেসবুক আইডি বের করেছে অভ্র। প্রোফাইলে থাকা ছবিটা দেখে দ্বিতীয়বার খেই হারিয়েছে মনের। অথচ প্রশ্ন তখনো ছুটে বেড়াচ্ছে মাথায়।

হুট করে এক অজানা, অচেনা মেয়েকে এত ভালো লেগেছে কেন? যেন এক টুকরো ছলকে ওঠা হাওয়া ছুঁয়ে গেছে হৃদয়ে। এতক্ষণ এক ভাবে চেয়ে চেয়ে দেখছে, অথচ বিন্দুমাত্র বিরক্তি আসেনি। বরং দুপুরের মতোই নয়ন জোড়া বুঁদ হয়েছে বিমোহে। ওদিকে ছেলের সাড়াশব্দ না পেয়ে ডেকেই যাচ্ছেন রেহানা। শেষ ডাকে চৌধুরীর পুরুষালি কণ্ঠ ছুটে এলো এ ঘরে। অমনি নড়ে উঠল অভ্র। ত্রস্ত হাতে ল্যাপটপ বন্ধ করে ঠিকঠাক হয়ে বসল।

CamScanner

উত্তর পাঠাল চ্যাঁচিয়ে, "আসছি, আসছি।"

রুদ্রর খাওয়া শেষ। রাতে খুব কম খায় ও। তেল চপচপে, ভাজাপোড়া, ফাস্ট ফুডের সঙ্গে আবার যোজন-যোজন দূরত্ব। সবথেকে বেশি দূরত্ব মিষ্টিতে। ভীষণ আশ্চর্যের হলেও সত্যি, উনত্রিশ বছর বয়সেই রক্তে স্যুগার আছে ওর। অথচ বলবান পুরুষটিকে বাইরে থেকে দেখে বোঝার সাধ্য হবে না কারো। সুঠামদেহটা যেন শত আঘাতেও শক্ত।

অভ্র নামছিল যখন, রুদ্র তখন ঘরে রওনা করেছে। সিঁড়িপথে ওরা মুখোমুখি হলো। অভ্রই কথা বলল আগে, "খাবে না, ভাই?"

"খেয়েছি।"

বলতে বলতেই রুদ্র পাশ কাটিয়ে উঠে যায়। অথচ চোখমুখে অন্ধকার নামল অভ্রর।

ওপরে চলে যাওয়া শরীরটার দিকে আহত লোচনে চেয়ে থাকল কিছু পল। শৈশবে দুভাই ব্যাট-বল দিয়ে ক্রিকেট খেলা তো দূর, রুদ্র দরকার ছাড়া কখনো ওর সাথে একটা কথাও বলে না। ওর সাথে কেন, কারো সাথেই বলে না। কীসের এত রাগ ভাইয়ের? কেন এমন দূরত্ব? অভ্র তার নিজের বলতে মা, মামা আর রুদ্রকেই তো জানে। বড়ো ভাই বলতে সেই তো আছে। তাহলে মধুর সম্পর্কের মাঝখানে এই কদাকার দেওয়াল কেন উঠেছে? সে যে বড়ো ভাইকে একটাবার জড়িয়ে ধরার অমোঘ তৃষ্ণায় ভোগে, রুদ্র কি আদৌ জানবে সেসব?

৯.

আরআরসি ইন্ডাস্ট্রিজ ঢাকার অন্যতম মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি। ঢাকা ছেড়ে এর শাখা ছড়িয়ে গেছে চট্টগ্রামেও। পত্রিকা, টেলিভিশন সবখানে প্রায়শই শিরোনামে দেখা যেত রুদ্রর এই কোম্পানির মুখ। অথচ সেঁজুতি কিছুই জানে না। একাডেমিক পাঠ্যপুস্তকের বাইরে একটা সামান্য উপন্যাস মেয়েটা পড়েনি। বাড়ির দেওয়ালে ছোটোখাটো টেলিভিশন ঝুললেও দুবোন সেখানকার পর্দাতে চোখ রাখেনি কখনো। পড়াশোনা, স্কুল, কলেজ, কোচিং এসবের গণ্ডিতে আটকে থাকাই ছিল আমির উদ্দীনের একমাত্র আদেশ। পত্রিকা হাতে নিয়ে বিনোদনের পাতা সবার আগে ছিঁড়ে ফেলতেন তিনি। টিভিতে চলে এসেছে কেবল বিটিভি চ্যানেল। আজকালকার যুগে হয়েও সেঁজুতির স্মার্ট ফোন নেই। বাটন ফোনটা বড়ো অনিচ্ছায় মেয়েকে কিনে দিয়েছিলেন আমির। ভার্সিটির পথ বাড়ি থেকে অনেক দূরের। রাস্তাঘাটে কি ঘটে না ঘটে, কেবলই সেই আশঙ্কায়।

CamScanner

আরিশা মনযোগ দিয়ে শাড়ি পরছে। লম্বা চুলে ফের স্ট্রেইটনার ছোঁয়াল। সেঁজুতি পরিপাটি হয়ে বসে আছে বিছানায়। একবার ঘাড় ফিরিয়ে টেবিলে থাকা আরিশার ফোনটাকে দেখল সে। আজ প্রায় দশ দিন পরিবার থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন মেয়েটা। মা-বাবা, বোন কারোর একটুখানি গলার স্বর শোনেনি। প্রিয়জনদের শূন্যতায় সেঁজুতির বুক মুচড়ে ওঠে। কান্নার ঘোট দলা পাঁকিয়ে গলবিলে ঘোরে। ঢোক গিলে দমিয়ে নেয় ফের। ছোটো বোনের মুখখানা ভেসে ওঠে চোখে। মেয়েটা আসার সময় কীভাবে কাঁদছিল। লম্ব একটা ভারশীল প্রশ্বাস বক্ষ ফুঁড়ে বেরিয়ে এলো সেঁজুতির।

আরিশা ততক্ষণে তৈরি। সামনে এসে বলল, "হয়ে গেছে। চল।"

সেঁজুতির ধ্যান ছুটে যায়। নড়ে উঠল একটু। নিজেকে সামলে চটপট দাঁড়িয়ে ব্যাগ তুলল কাঁধে। মনের মধ্যে কেমন কেমন করছে। কোনো অজ্ঞাত আতঙ্কের উচাটন বেড়ে আসছে লাগাতার। কপালে কী আছে কে জানে!

রাজধানীর বুকের দাপুটে জ্যাম। যার কাছে হার মানবে শহরের প্রভাবশালী নেতাও। সেখানে আরিশা-সেঁজুতি কোন ছাড়। উত্তরা থেকে বসুন্ধরার অফিস দূরের জায়গা। ওদের পৌঁছাতে পৌঁছাতে বেশ অনেকটা সময় লেগেছে। তার ওপর অফিস ভবনের কড়া পাহাড়া। মূল গেইটে আইডি কার্ড দেখিয়ে তারপর ঢুকতে দিয়েছে। ওরা যখন অন্দরে এলো-ঠোঁট ফাঁকা করে ফেলল দুজনেই। গতকাল ঠিক যেমনটা দেখেছিল, তার সাথে এক বিন্দু মিল নেই আজ। সব যেন স্বপ্নের মতো সুন্দর। অর্কিড, গোলাপ আবার মাটির তৈরি ছোটো ছোটো পুতুল দিয়ে সাজানো। কত রংবেরঙের বেলুন ঝুলছে চারদিক। আরিশা মুগ্ধ হয়ে আওড়ায়, "কী সুন্দর করে সাজিয়েছে রে”

সেঁজুতির চোখেও সমান বিহ্বলতা। সেও ঘুরে ঘুরে অফিস দেখায় ব্যস্ত।

রুদ্রদের গার্মেন্টেসের সব থেকে ডিমান্ডেবল প্রোডাক্টসগুলো ম্যানিকুইনে পরিয়ে রাখা হয়েছে। কোটরদ্বয় সৌন্দর্যে ছড়িয়ে গেল ওর। ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখার ইচ্ছে হলো বড্ড। হাতটা বাড়িয়েও টেনে নিল সেঁজুতি। এত দামি দামি পোশাক, ছুঁলে যদি ধমকায়? থাক বাবা!

ছোটো ছোটো স্টলগুলোকে রাস্তার পাড়ের ফুডকোর্টের মতো মনে হচ্ছে সেঁজুতির। প্রত্যেকটির দায়িত্বে একেক জন আলাদা আলাদা হেড। ছেলেরা কালো প্যান্ট, নীল শার্ট। আর মেয়েরা কালো পাড়ের নীল শাড়ি।

আইডি কার্ডে লেখা স্টল নম্বর দেখে দেখে সেঁজুতি, আরিশা এগিয়ে যায়। কাকতালীয়ভাবে দুজনেরটা পাশাপাশিই পড়েছে। সেঁজুতি চারপাশটা যত দেখছে আশ্চর্য হচ্ছে তত। এরকম

CamScanner

জায়গায় যদি পাঁকাপোক্ত একটা চাকরি হতো ওর। এই ক্ষুদ্র জীবনে আর কোনো টানাহেঁচড়াই থাকত না।

মেয়েটা সবে চেয়ারে বসতে যাবে, অমনি দোর হতে ছুটে এলেন কেউ একজন। ঘোষণা দিলেন চাপা গলায়, "বস আসছে, বস আসছে।"

ব্যস! এক কথায় এলোমেলো অফিস তীরস্থ হয়ে পড়ল। আরিশা সেলফি তুলছিল, তড়িঘড়ি করে ফোন ভরল ব্যাগে। সেঁজুতি আর বসেনি। দাঁড়িয়ে রইল অমন।

দপ্তরের সামনে পরপর দুটো গাড়ি এসে ভিড়ে। অভ্র আর রেহান চৌধুরী একসাথে ঢুকল। বহু কোম্পানির বাঘা-বাঘা কর্মকর্তারা এসেছেন আজ। দেশের বাইরে থেকেও আগত অনেকে। অভ্র, রেহানের পেছনে সবার সঙ্গে হাত মেলাচ্ছিল, আলাপ করছিল। আচমকা ওর চোখ পড়ল সোজাসুজি স্টলটায়। শাড়ি পরুয়া এক সুদর্শণা দাঁড়িয়ে সেখানে। আহা, কী মারাত্মক লাগছে দেখতে! এই মেয়ের কী ধারালো রূপ! অভ্রর গলা শুকিয়ে গেল সেই
রূপের জৌলুসে। কিন্তু না, আজ তো খেই হারালে চলবে না। নিজেকে সামলায় সে। সাথে সামলে নেয় সকল বেহায়া নজর।

রুদ্র ঢুকল তার কিছুক্ষণ বাদে। বাম হাত পকেটে অন্য হাত মন্থর ঝুলছে। বুটের গটগটে শব্দটা আলোড়ন তুলেছে গোটা মারবেল মেঝেতে।

সৌম্যে উপচে পরা মুখটা দেখে শত নারী হুঁশ' খোয়ালেও এই মুহূর্তে চমকে উঠল সেঁজুতি। দপ করে নিভে গেল তার হাসিটানা মুখ। বৃহৎ আঁখিযুগল কোটর ছাড়িয়ে বাইরে আসতে চাইল। ও কি ভুল দেখছে? সেঁজুতি ঘন ঘন পল্লব ঝাপটায়। চোখ কচলে আরো ভালো করে তাকায়। না, ভুল নয়। সেই অভদ্র লোকটাই তো এখানে।

তার স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার মাঝেই আরিশার ফিসফিসে স্বর ভেসে আসে কানে। হা-হুতাশ করে বলছে, "ওরে সেঁজুতি রে, এই লোক এখানে কেন? আল্লাহ, কী হবে এখন?"

সেঁজুতির শুষ্ক আনন, আরো শুকিয়ে যায়। চুপসে আসে সবকিছু। শেষমেশ একটা অল্পবিস্তর চাকরি পেল, তাও এই লোকের অফিসে? এখন! এই তিনদিন কীভাবে কাটবে?

রুদ্র তখনো দেখেনি ওকে। সে আলাপ-আলোচনায় ব্যস্ত। কী দারুণ বাচনভঙ্গি। কী গলার স্বর। সব যেন উঁচু শৃঙ্গে ছুড়ে দেওয়া প্রতিধ্বনির ন্যায় শাণিত।

CamScanner

একটা সময় রেহান স্টলের সবাইকে ডাকলেন। পরিচিত হওয়ার জন্যে। সেই তালিকায় সেঁজুতিও পড়ে। মেয়েটা ঢোক গিলতে গিলতে স্টল রেখে বাইরে এসে দাঁড়াল। বুক কাঁপছে। সাথে টলছে দুনিয়া। ভবিতব্য ঘটনাগুলো ভাবতেই ফাঁকা হচ্ছে মস্তক।

ছেলে-মেয়ে সব মিলিয়ে সংখ্যায় মোট পনেরো জন। রুদ্র প্রত্যেকের ওপর চোখ বোলাল একবার। বেখেয়ালি নজর গিয়ে বর্তাল সেঁজুতিতেও। প্রথমে ও খেয়াল করেনি। চোখ সরিয়ে পাশের জনের দিক ফেলতে ফেলতেই মস্তিষ্ক সচেতন হয়ে উঠল। চেনা মুখের সংকেত ক্ষিপ্রবেগে লুফে নিয়েছে স্নায়ুরা। একপল থমকায় সে। পরপরই ক্ষিপ্ত বাঘের ন্যায় দৃষ্টি ফিরিয়ে আনে। শান্ত কোটরে মুহূর্তেই যেন আগুন জ্বলে উঠল। যেই আগুনের নিশানা হতেই সেঁজুতির শরীর পুড়ে যায়। গুটিয়ে আসে সত্তা। রুদ্র বাদামি চোখ ছোটো করল আরো। কপালে প্রগাঢ় ভাঁজ। অচিরে পালটে গেল চেহারা। নিরেট চিবুকের প্রস্তর রূপ ভয়ানক ঠেকছে ভীষণ। এত দিনের পুষে রাখা ক্ষোভের কাছে বিফল হলো পরিবেশ। স্থান-কাল সব ভুলে চ্যাঁচিয়ে উঠে সজোরে, "এই মেয়ে এখানে কী করছে?"

সেঁজুতির চিবুক তখন বক্ষদেশে। চিৎকার শুনে চোখ খিচে নিল। কণ্ঠ তো নয়, যেন প্রকাণ্ড বজ্রপাত। আরিশার শীর্ণ দেহ ছলকে উঠল ভয়ে। এমন চিৎকার সে বাপের জন্মে শোনেনি। শঙ্কায় মেয়েটা মাথাই তুলল না।

অফিসের সকলের তটস্থ চাউনি তখন রুদ্রর ওপর আটকে। রেহান কপাল কুঁচকে বললেন, "এখানে কী করছে মানে, ওকে তুমি চেনো?"

রুদ্র দাঁত চেপে কিছু বলতে গিয়েও থামল। মাথায় এলো সে কোথায়, কাদের সাথে দাঁড়িয়ে।

সমস্ত রুঢ়তা গিলে নিল সহসা। একটু আগের ক্রুদ্ধ স্বর ভীষণ শান্ত করে বলল, "নো ওয়ে। আমি আমার লেভেলের বাইরে কাউকে চেনার প্রয়োজনবোধ করি না।"

রুক্ষ কণ্ঠের শীতল অপমানেও সেঁজুতি চুপটি করে দাঁড়িয়ে। শুধু চোখের কোনা দিয়ে চাইল একপল।

চোখাচোখি হলো অপ্রত্যাশিত, অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে। নিভু নিভু চোখজোড়ার সহিত সন্ধি হলো রুদ্রর চণ্ড আঁখির। কীভাবে চেয়ে আছে দেখো, যেন এক্ষুনি গিলে খাবে। সেঁজুতির ভেতরের ডর চাপা দিয়ে সাহসী হতে চায়। সেই চিত্ত ফুঁসে উঠে বলে, "এভাবে কী দেখছিস? খেয়ে ফেলবি আমাকে? আয় না আয়, আমিও দেখিয়ে দেবে আমি কী জিনিস!"

CamScanner

কিন্তু কথাখানা জিভেই আহুতি দিলো। ঠোঁট ফুঁড়ে আর বাইরে এলো না। ফের চোখ নামিয়ে নিলো নিচে।

স্বভাবে বদমেজাজি হলেও রুদ্রর অদ্ভূত এক ক্ষমতা আছে। স্বীয় সত্তাকে সামলে নেওয়ার নিপুণ কৌশলে আত্মস্থ সে। ঠিক সেটারই প্রয়োগ ঘটাল এখন। যে মানুষটা এতগুলো দিন, এত হাজার ঘন্টা পণ করেছিল সেঁজুতিকে হাতে পাওয়া মাত্রই ক্ষমা চাওয়াবে, সেই মানুষ আজ চমৎকারভাবে দমিয়ে রাখল নিজেকে। বাইরের খোলসটাকে নিবিড় তরঙ্গ বানিয়ে ভেতরের বহ্নি যেন কয়েদ করে ছাড়ল। যে বহ্নির সামান্য আঁচেও সেঁজুতি হাজারবার ঝলসে যেতে পারে।

ঘড়িতে সকাল বহু আগেই পেরিয়েছে। অথচ অফিসে নাস্তার সময় দিয়েছে এখন। পনের জন ক্যান্ডিডেট আলাদা আলাদা টেবিল বেছে খেতে বসেছে ক্যান্টিনে। সেঁজুতির বদভ্যেস-সে আস্তেধীরে খেতে পারে না। না
মানে কখনোও না। তাই শেষ করল সবার আগেই। আরিশা তখনো যেতে ব্যস্ত। সাথে অন্যান্য মেয়েগুলোর সাথে বিস্তর গল্প জুড়েছে। সেঁজুতির আপাতত এসব গল্প-গুজবে মন নেই। সেথায় এখন ঘোর অমানিশা ছেঁয়ে। না চাইতেও ভবিষ্যৎ ৭২ ঘন্টা ওই লোকটাকে বস ভাবতে হবে। এটা ও কিছুতেই মানতে পারছে না। অমন নাক উঁচু, অহংকারী লোকের কর্মচার ভাবতেও ইচ্ছে করছে না নিজেকে। দুনিয়ায় কি আর কোনো কোম্পানি ছিল না। ও দুই গাল ফুলিয়ে শ্বাস ফেলল। ভাবল, ক্যান্টিনের এসব শোরগোলে না থেকে স্টলে গিয়ে বসবে। আরিশাকে বলে চলে গেল সেদিকে। ফ্লোর তখন সম্পূর্ণ ফাঁকা। সেন্টার টেবিলের ওপর টিস্যু বক্স দেখে সেঁজুতি এগিয়ে যায়। ফিনফিনে টিস্যু নিয়ে ঠোঁট মুছতে মুছতে পিছু ঘুরতেই চমকে উঠল পিলে। গতরের শিরা-উপশিরাও বিস্ময়ে শক্ত হয়ে গেল।

একদম চোখের সামনে দাঁড়িয়ে রুদ্র। একটুর জন্যে ধাক্কা লাগেনি। চোখমুখের অবস্থা দেখে সেঁজুতি ঘাবড়ে যায়। ভয়ে ভয়ে দেখে নেয় চারপাশ। কেউ নেই এখানে। ও আবার ফিরে চাইল রুদ্রর দিক। লাল রঙা অক্ষিকূটে জ্বলন্ত লাভা। যেন দপদপে অগ্নির স্ফুলিঙ্গ কোনও। তাকে এক পা এগোতে দেখেই সেঁজুতির বুকটা ছ্যাঁৎ করে ওঠে। দুকদম পিছিয়ে যায় অমনি। রুদ্র আরেক পা এগোয়। ঝিমঝিমে এসির বাতাসে, শূন্য মেঝেতে উৎকট শোনায় তার জুতোর আওয়াজ। সেঁজুতির আতঙ্ক হিমালয় ছুঁয়ে ফেলছে। কিছু বলার জন্য তিরতির করছে ঠোঁট।

এই লোক এভাবে কাছে আসছে কেন? লোকটা আবার লম্পট নয় তো? তাকে একা পেয়ে রাগের বশে কিছু করবে না কি? সেঁজুতির অন্তরাত্মায়ও কাঁপন ধরল ভয়ে। বক্ষস্পন্দন থেমে গেল রুদ্রর একদম নৈকট্যে আসায়। সরু কোমর ঠেকে যায় টেবিলে। রুদ্র কাছে এলো ঠিকই, তবে সচেতন দূরত্ব মেনে দাঁড়াল।

CamScanner

কিছু বলতে যাবে আচমকা হাজির হলেন রেহান। ফোনে কথা বলতে বলতে আসছিলেন তিনি। স্বর শুনেই স্থানে থমকে যায় রুদ্র। ছিটকে সরে আসে তড়িৎ। বড়ো বাঁচা বেঁচে গেল সেঁজুতি। বুকে হাত দিয়ে শ্বাস নিল জোরে।

রেহানের যখন নজর পড়ল এদিকে, চোখ সরু করলেন। ফোন নামিয়ে এগিয়ে এসে বললেন, "তুমি এখানে, রুদ্র? আমি তোমাকে খুঁজছিলাম। খাবে না?”

"হু।"

ভদ্রলোকের চোখ গেল টেবিল ঘেঁষে দাঁড়ানো সেঁজুতির ওপর। মেয়েটা এখনও ঘনঘন শ্বাস ফেলছে। উনি হেসে বললেন, "কী ব্যাপার, সেঁজুতি! কী অবস্থা, অফিস কেমন লাগছে? কোনও সমস্যা হচ্ছে না তো?"

মানুষটার চমৎকার ব্যবহারে একটু আশ্বস্ত হলো সেঁজুতি। ভয়ডর চেপে হাসি টানল ঠোঁটে।

"না আঙ্কেল, কোনো স..."

পথিমধ্যেই কথা কেড়ে নিল রুদ্র, "স্যার বলুন। এটা আপনার আত্মীয়ের বাড়ি নয়। এটা অফিস।"

সেঁজুতি চুপসে গেল।

দাঁত পিষে ভাবল, 'অসভ্য, তোর সাথে কথা বলছি আমি? তোর মতো শয়তান আমার আত্মীয় হবে কোন দুঃখে?'

রেহান বাধ সেধে বললেন, "আহা! রেগে যাচ্ছ কেন? আমিই ওকে বলেছি আঙ্কেল ডাকতে। আমার এসব স্যার ট্যার পছন্দ নয়।"

রুদ্র মুখের ওপর বলল, "এটাই তোমার সমস্যা, ড্যাড। কিছু মানুষকে আশকারা দিয়ে মাথায় তুলে ফেলেছ। কিন্তু যে যতটুকুর যোগ্য তাকে ঠিক ততটুকু দিতে শেখো। নাহলে এরাই একদিন মাথার ওপর বাঁদর নাচ নাচবে।"

আর এক মুহূর্ত না থেমে চলে গেল সে। মানহানীতে সেঁজুতির মুখবিবর ছোটো হয়ে আসে। ভেতরের প্রতিবাদী সত্তাটা চ্যাঁচিয়ে বলে "আমি বাঁদর? তুই বাঁদর, তোর চৌদ্দ গুষ্ঠি বাঁদর। এক থাপ্পড়ে তোর সব দাঁত ফেলে দিতাম বদমাশ। শুধু বয়সে বড়ো বলে কিছু বললাম না।"

CamScanner

ধ্যান ছুটল রেহানের নম্র স্বরে, "ইয়ে তুমি কিছু মনে কোরো না, মা। আমার ছেলেটা একটু এরকমই। কিন্তু ওর মনটা খুব ভালো বুঝলে।"

সেঁজুতি বিড়বিড় করল, 'কত যে ভালো মন সে কী আর বোঝা বাকী আছে?' মুখে বলল, "আমি কিছু মনে করিনি, স্যার।"

"বাহ। তাহলে তো হয়েই গেল। আসলে জীবনটা এরকমই। একটা রেইসের মতো। যত ছুটবে নতুন মাটি, নতুন জায়গা, নতুন মানুষ। প্রতিটা পদে একেকজন একেক কথা ছুড়ে দেবে তোমায়। কিন্তু সেসব কোনোভাবেই গায়ে মেখে শরীর ভারি করা যাবে না, তবে যে ক্রমাগত পিছিয়ে পড়তে হবে। কীভাবে এড়িয়ে যাবে সেসবও তোমাকেই রপ্ত করতে হবে। যদি 'একবার সফল হয়েই যাও।' দেখবে আর পেছনে তাকাতে হচ্ছে না। সামনের উইনিং বর্ডার দুহাত পেতে তোমার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। বুঝেছ?"

সেঁজুতি সবকটা কথা মুগ্ধ হয়ে শুনছিল। জবাবে ঘাড় নাড়ল শুধু। এই লম্বাচওড়া মানুষটাকে দেখে বাবাকে মনে পড়ছে ওর। রেহান ভ্রু উচিয়ে বললেন, "সবেতে মাথা দোলাচ্ছ, কাজের সময় মনে থাকবে তো?"

সেঁজুতি নিসঙ্কোচে বলে ফেলল, "কেন থাকবে না? মনে হচ্ছে আমার বাবা আমাকে উপদেশ দিচ্ছে। মেয়ে হয়ে সেই উপদেশ মানব না, অত সাহস আছে আমার?"

রেহান হেসে ফেললেন। আদুরে মেয়েটিকে দারুণ লেগেছে তাঁর। মাথায় নিবিড় হাত বুলিয়ে বললেন, "গড ব্লেস ইউ। তিনদিনের নয় বরাবরের মতো একটা ভালো চাকরি পেয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াও। দোয়া করি!"

সেঁজুতি বুকখানা হুহু করে উঠল। এভাবে তো বাবাও মাথায় হাত রাখতে পারতেন। আদর করে একটু বুলিয়ে দুটো কথা বলতে পারতেন। বাবা, তোমার মেয়েটাকে একটু ভালোবাসলে খুব কি ক্ষতি হতো তোমার?

আচমকা ক্যান্টিন হতে চ্যাঁচামেচি শোনা যায়। যেন তীব্র হইচই বেঁধেছে। রেহান-সেঁজুতির মনযোগ মুহূর্তে ঘুরে গেল। একপল মুখ চাওয়া- চাওয়ি করে দুজনে ত্রস্ত এগোলো সে দিকে।

১০.

ক্যানটিনে বড়ো জটলা বেঁধেছে। আর সেই জটলার মধ্যমণি আরিশা। সবার মধ্যে মেয়েটা মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে। উপস্থিত সকলে কুণ্ডলীর মতো ঘিরে রেখেছে চারপাশ। রেহানের সাথে সাথে

CamScanner

সেঁজুতিও সেথায় ছুটে এসে দাঁড়াল। রুদ্রও হাজির হলো তখন। প্রশ্ন ছুড়ল এসেই, "কী হয়েছে এখানে?"

ক্যান্ডিডেটদের একজন জানাল, "স্যার, উনি আইডি কার্ড হারিয়ে ফেলেছেন।"

সহসা চ্যাঁচিয়ে উঠল ও, "হোয়্যাট?"

ত্রাসে আরিশার রুহু উড়ে যায়। থুতনিটাকে চেপে রাখে গলার ভাঁজে।

"হাউ কেয়ারলেস! আইডিকার্ড কীভাবে হারিয়ে যায়?"

মেয়েটা মিনসে কণ্ঠে সাফাই দিতে গেল, "আসলে আমি, আমি..."

রুদ্র ধমকে বলল, "শাট আপ। আপনার থেকে কোনো এক্সপ্লেইনেশান শুনতে চাইছি না।"

আরিশা কেঁদে ফেলল। রাগে, অপমানে শুভ্র মুখটায় ভরতি হলো বিষাদ। সেঁজুতি কটমটিয়ে উঠল রুদ্রর প্রতি! এই লোকের সবকিছুতে বাড়াবাড়ি। একটা আইডিকার্ডের জন্যে এভাবে বলার কী আছে?

রেহান বললেন, "রুদ্র, থাক ছেড়ে দাও। হয়তো ভুল করে পড়ে গেছে কোথাও।"

"পড়ে গেছে মানে? ওনাদের বলে দেওয়া হয়নি যে আইডিকার্ড ছাড়া অফিসে কাউকে ঢুকতে দেওয়া হবে না?"

অভ্র দুচোখ ভরতি শীতল মায়া নিয়ে আরিশাকে দেখছে। মেয়েটার পিঠ ফেঁপে উঠছে বারবার। উনি কি কাঁদছেন? আহারে। অভ্রর মনের আশপাশ ঝুপ করে তলিয়ে গেল আঁধারে। আরিশার কান্না যেন বুকের মধ্যে খুঁচিয়ে যাওয়া তির।

ভাইকে বোঝাতে গেল, "ভাই, কার্ড হারালে তো সমস্যা নেই। আমরা না হয় আরেকটা প্রসেস করে দিয়ে দেবো।"

রুদ্র চোখ রাঙিয়ে চাইল ওর দিক। কর্কশ কণ্ঠে বলল, "কেন? ওনার জন্য এখন নতুন করে কার্ড বানাতে হবে কেন? স্টাফদের কি আর কোনো কাজ নেই? আর অভ্র তুই না সিলেকশনের দায়িত্বে ছিলিস? এরকম একটা ইরেস্পন্সেবল মেয়েকে কীভাবে বাছাই করলি? যাদের মধ্যে নূন্যতম যোগ্যতা নেই, তারা রুদ্র রওশন চৌধুরীর অফিসে কী করে কাজ করবে?"

CamScanner

বলতে বলতে তার চোখদুটো ঘুরে এলো ভিড়ে দাঁড়ানো সেঁজুতি হতে। কোটর ছাপানো ফুলকি তোলা বহ্নি যেন ঠিকড়ে দিলো ওর ওপর। সেঁজুতির বুঝতে বাকী নেই, লোকটা ওর রাগ আরিশার প্রতি ঝাড়ছে।

শান্ত জিভখানা ফুঁসে উঠতে চায় প্রতিবাদের আশায়। কিন্তু, সবসময় কি আর তা হয়? সেঁজুতি ঠোঁট টিপে নিল। সাথে চেপে রাখল ছুটতে যাওয়া কথার বাণ।

আরিশা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। এত এত মানুষের সামনে এই ভাবে অপমানিত হওয়াও লেখা ছিল কপালে?

এদিকে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে। স্টাফদের ফিসফিসানির সাথে রুদ্রর রাগ চড়াও হচ্ছে ক্রমশ। রেহান সবটা সামলে নিতে বললেন, "আচ্ছা ছাড়ো। সামান্য ব্যাপারে সিরিয়াস হওয়ার কিছু নেই, রুদ্র। অফিস থেকে আবার দেওয়া হবে। সমস্যা কোথায়?"

রুদ্র পালটা যুক্তি দিলো, "সমস্যাটা আইডিকার্ড নিয়ে নয়, ড্যাড। সমস্যা ওনাদের খামখেয়ালিপনায়। যে মেয়ে প্রথম দিনেই কার্ড হারিয়ে ফেলে, সে বাকি দুদিন কীভাবে কী করবে, হু নোস?"

এরপর বাকিদের দিক চেয়ে বলল, "এনি ওয়ে, এখানে দাঁড়িয়ে না থেকে নিজেদের কাজে যান। এক, দুজনের জন্যে তো আমার অফিস থেমে থাকবে না।"

এক ঘোষণায় সুরসুর করে চলে গেল সবাই। রুদ্র ঘাড় ঘুরিয়ে আরেকবার সেঁজুতিকে দেখে নেয়। যে চাউনিতে নম্রতার ছিটেফোঁটাও নেই। বরং নীরবে বুঝিয়ে দেয়, "শুধু একটা ভুল করে দেখুন, এর থেকেও হাজারগুণ অপমান ফেরত দেবো আপনাকে।"

ছেলের পেছন পেছন চলে গেলেন রেহান। পূর্ণ ক্যানটিন শূন্য হলো নিমিষে। কেবল দাঁড়িয়ে রইল সেঁজুতি, আরিশা আর এক কোনায় থাকা অভ্র।

সেঁজুতি ছুটে গেল বন্ধুর কাছে। কাঁধ ছুঁতেই ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল আরিশা। ওর গায়ে মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে চেয়ারে এনে বসাল সেঁজুতি।

আরিশা নাক টেনে বলল, "একটা সামান্য জিনিস হারানো নিয়ে এত কথা বলে গেল? বলার হলে অন্তত কেবিনে ডেকে নিত। এইভাবে সবার সামনে যা নয় তাই শোনানো লোকের আন্ডারে এত মানুষ কী করে কাজ করে, বল তো? কী রুড।"

CamScanner

সেঁজুতি দীর্ঘশ্বাস ফেলল। এই অভদ্র লোকটা যে কী, এই ক-ঘন্টায় তার ধারণা ছাড়িয়ে গেছে। প্রতি পদক্ষেপে চোখ দিয়ে ভস্ম করছে ওকে। উফ, জীবনে অশান্তির শেষ নেই। কোন কুক্ষণে যে এর গাড়ির কাচ ভাঙতে গেছিল।

সেঁজুতির হঠাৎ চোখ পড়ল সামনে। অভ্র এদিকেই আসছে। ও তৎক্ষণাৎ সোজা হয়ে দাঁড়ায়। কন্ঠ মিনমিনে, "স্যার আপনি?"

আরিশা ভেজা চোখ ঘোরাল। অভ্রর পুরুষালি দেহেও তরুণীর সেই দৃষ্টিতে কাঁটা ফুটল যেন। অশ্রুসিক্ত চাউনি নয়, যেন শর ছুড়েছে মেয়েটা। অদৃশ্যভাবে ঠিক বুকের বাঁ পাশটায় বিঁধে গেছে দেখো!

ধীরুজ পায়ে ওদের সামনে এসে দাঁড়াল অভ্র। পকেট থেকে রুমাল এনে বাড়িয়ে ধরল আরিশার দিকে।

মেয়েটা বিভ্রান্ত হয়। কপাল কুঁচকে একবার দেখে নেয় সেঁজুতিকে। তার চোখেও প্রশ্ন। সবকিছু ছাপিয়ে মুচকি হাসল অভ্র। ভণিতাহীন বলল, "কিছু কিছু মেয়েদের কান্নায় একদমই মানায় না, মিস আরিশা। এই যে দেখুন, আপনাকেও মানাচ্ছে না। মনে হচ্ছে মানুষ নয়, মনে হচ্ছে একটা ভেজা টসটসে স্ট্রবেরি বসে আছে এখানে। এন্ড দ্যাটস হোয়াই আই লাভ বেরিস টু মাচ।"

আরিশা আগামাথা কিছুই বুঝল না। চেয়ে রইল ড্যাবড্যাব করে। সেই এ মুহূর্তেই টেবিলের ওপর রাখা হাতটা তার টেনে নিল অভ্র। মেয়েটা চমকায়। থমকে থাকে সেঁজুতিও। অভ্র সেসব আমোলে নিলে তো! সংকোচহীন হাতের মুঠোয় রুমালটা ধরিয়ে দিয়ে ফের হাসল ছেলেটা। আর একটাও কথা না বলে চলে গেল নিশ্চুপ। বিস্ময়ে আরিশার কান্না শেষ। শুধাল ঠোঁট নেড়ে, "কী বলে গেল?"

সেঁজুতি বিস্ময় সামলে উঠেছে। অভ্রর হাবভাব তো সুবিধের লাগেনি। কাল ইন্টারভিউয়ের সময় আরিশাও বলেছিল ওকে দেখে হাঁ করে চেয়েছিলেন তিনি। তবে কি কোনোভাবে আরিশাকে পছন্দ করে লোকটা?

সময় দুপুর ২টা বেজে ১০ মিনিট।

অফিসের শুভ্র দেওয়ালে ঝুলন্ত বিশালাকার ঘড়িটা ঢংঢং শব্দ তুলতেই লাঞ্চ ব্রেক শেষ হয়। কাজের শুরু আবার। এক গাদা লিফলেট এনে একটা বড়ো টেবিলে রেখে গেলেন পিওন। মেয়ে স্টাফ মোট ছয় জন এখানে। ওদেরকেই ডাকা হলো ভাঁজ করে সাজানোর কাজে।

CamScanner

আরিশার মুখখানা তখনো ভার। এই অপমান সে জীবনে ভুলবে না। সেঁজুতি ঠিকই বলে, লোকটা টাকার কুমির হলে কী হবে? নূন্যতম ভদ্রতা জ্ঞান নেই।

ও আর সেঁজুতি দুটো চেয়ার টেনে বসল। গোটা ফ্লোর জুড়ে স্টল আর একটু দূরে বিশাল সোফাসেট রাখা। লাঞ্চ শেষ হওয়ার পর থেকেই অভ্র, রেহান, রুদ্র সেখানে বসে আছে।

বাকি দুজন গল্পে মত্ত হলেও রুদ্রর সাড়াশব্দ কম। তার ডান হাতে ফোন। কোনো প্রশ্ন ছুড়ে দিলে, হ্যাঁ-হুঁ-তে জবাব দিচ্ছে, এই যা!

মাঝেমধ্যে চোখের কোনা দিয়ে দেখছে দূরে বসা সেঁজুতিকে। মেয়েটা অন্যমনস্ক। কাজে মন নেই। সত্যিই তাই। সেঁজুতির মাথাটা চিন্তায় ফেটে যাচ্ছে। রুদ্রর ভেতরে কী মারাত্মক রাগ পোষা ওর জন্যে এতক্ষণে সব বুঝেছে ও। আরিশাকে নিশ্চয়ই তার সাথে সাথে চলতে দেখেই বুঝতে পেরেছে ওরা আপনজন। আর তাই ইনিয়ে বিনিয়ে ওকে কথা শোনাল। হায় আল্লাহ! এখন যদি ওর কোনো কাজে সামান্যও ভুল হয়, এই লোক যে ওকে কী করবে।

রুদ্র কপাল কুঁচকে ব্যাপারটা দেখল কিছুক্ষণ। সেঁজুতির লিফলেট ভাঁজের আনাড়ি হাত, আঙুল কাঁপাকাঁপি, আর উদাসীনতা মেজাজের খেই হারিয়ে দিলো। সবার মধ্যেই চ্যাঁচিয়ে উঠল আবার, "হেই ইউ, আপনার শরীরে জোর নেই? কাজ শেখেননি কখনও?"

পুরো অফিস ফ্লোর তটস্থ ছিল। কাজের আওয়াজ ব্যাতীত এখানে টা-টু ই শব্দ নেই। তাই রুদ্রর উচ্চবাচ্যে চমকে উঠল সব। সেঁজুতি বুঝতে পারেনি ওকে বলেছে। হতভম্ব হয়ে এদিক-ওদিক দেখে। রুদ্র রেগে যায় আরো। খেঁকিয়ে ওঠে ততোধিক, "আশেপাশে কী দেখছেন, আপনাকে বলছি।"

পরপরই দাঁড়িয়ে গেল সে। রেহানকে বলল, "আমি বুঝলাম না এ কেমন মেয়ে রেফার করা হয়েছে এবার? একটা লিফলেট ভাঁজ করতে গোট একদিন কাটাচ্ছে, একে দিয়ে ঠিক হবেটা কী?"

সেঁজুতির মুখটা ছোটো হয়ে গেল। রেহান ওকে শান্ত করতে বললেন "আচ্ছা আচ্ছা, কাম ডাউন। আমি দেখছি।"

উঠে, হেঁটে সেঁজুতির কাছে এলেন তিনি। কণ্ঠে নম্রতা, "তোমার কোনো সমস্যা হচ্ছে, সেঁজুতি?"

মেয়েটা আনত থেকে বলল, "সরি স্যার!আর ভুল হবে না।"

CamScanner

"মনোযোগ দিয়ে কাজ করো। অফিসের কাজ সবার আগে।"

সেঁজুতি মাথা নাড়ল। আরিশা রেগে বিড়বিড় করল, "অফিস না ছাই। আজব একটা চিড়িয়াখানা। একজন বদমেজাজি, আরেকজন লুচ্চা নাম্বার ওয়ান।"

বলতে বলতেই আড়চোখে একপল অভ্রর দিক চাইল সে। কী আশ্চর্য, ছেলেটাতো ওকেই দেখছে। কী দেখে এত? চোখাচোখিতে আরিশা থতমত খায়। চোখ ফেরায় ত্রস্ত।

"এই নে, এটা অ্যাডভান্স: খোঁজ দিলে বাকিটা পাবি।"

টাকার মোটা বান্ডিলটা ছেলেটির গায়ের ওপর ছুড়ে মারল রাফিন। হাহাকার করে লুফে নেয় সে। তালুর এলোমেলো চুল দুলিয়ে বলে, "কোনো চিন্তা নাই, স্যার। টাকা যখন পাইছি কাজ হইয়া যাইব ভাইবা লন।"

রাফিন তুষ্ট কণ্ঠে বলল, "তোর রিভিউ ভালো পেয়েছি বলেই কাজটা তোকে দিলাম। ফাঁকা আওয়াজ যেন না হয়! সত্যি সত্যি মেয়েটাকে আমার চাই।"

"পাইবেন। তবে ছবি লাগবে একটা। আছে?"

পাসপোর্ট সাইজের ছবিটা এগিয়ে দেয় সে। যেখানে জ্বলজ্বল করছে সেঁজুতির হাস্যোজ্জ্বল মুখ।

"এখন যা। কিছু জানলে ফোন করিস।"

"আচ্ছা স্যার। সালাম নেবেন।"

হেলেদুলে চলে গেল ছেলেটি। রাফিন গাড়ি চালু করল। পাশের সিটে সাগর বসে আছে। এতক্ষণে মুখ খুলল সে, "একটা মেয়ের জন্যে এত প্যারা নিচ্ছিস কেন? চলে গেছে যাক না, মেয়ের তো অভাব নেই।"

রাফিনের শক্ত জবাব, "যা বুঝিস না, তা নিয়ে কথা বলবি না।"

সাগর বলল, "হ্যাঁ ভাই, সেই তো। আমি কিছুই বুঝি না, সব তুই একা বুঝিস।"

রাফিন একপেশে হাসল। উত্তর দিলো ফটাফট, "মেয়ে তো হাজার আছে। কিন্তু এই মুহূর্তে আমার সেঁজুতিকেই লাগবে। আই ব্যাডলি নিড হার।"

CamScanner

সাগর চোখ বড়ো বড়ো করে বলল, "ইউ নিড হার? তাহলে ইনা, মিনা, টিনা এসব কারা?"

কথাটায় শব্দ করে হেসে উঠল ছেলেটা। যেন ভীষণ মজা পেয়েছে। পালটা রসিকতা করে বলল, "এরা আমার টাইম পাস। ঘরে স্ত্রী রেখে বাইরে ফুর্তি করলেই কি তারা স্ত্রীকে ভালোবাসে না? বাসে তো।"

মাথা ঝাঁকাল সাগর, "আচ্ছা আচ্ছা, তার মানে তুই চেয়েছিলি সেঁজুতিও থাকবে আর তোর বাকি গার্লফ্রেন্ড-রাও?"

রাফিন স্বীকার করল বিলম্বহীন, "হ্যাঁ চেয়েছিলাম। এতে খারাপ তী আছে বল তো? সেঁজুতি এসব জানতও না।"

"ভাই অমন মিডল ক্লাস একটা মেয়ের মধ্যে কী দেখলি, বল তো তুই? ওর থেকেও কত সুন্দর সুন্দর গার্লফ্রেন্ড আছে তোর!"

রাফিনের কন্ঠে অনুচিন্তন, "জানি না। এটা আমিও মাঝেমধ্যে ভাবি। কী আছে মেয়েটার মধ্যে? এত বেশি আকর্ষণ কাজ করে কেন? তবে ওর মাঝে না একটা ব্যাপার আছে জানিস, যেটা বাকিদের মধ্যে পাইনি। এক বছরে ওর হাত ধরা ছাড়া আর কোথাও ছুঁতে দেয়নি। বলতে পারিস আমিই ছুঁতে চাইনি। চাইব কী, কিছু হলেই এমনভাবে ফোঁস করে উঠত, ঘাবড়ে যেতাম। বুঝতে পারতাম, ও এসব পছন্দ করে না। ওই হয় না? সতি সাবেত্রী টাইপ কিছু মেয়ে? ও ঠিক অমন। তারপর কখনো কোনো আবদার করেনি। গিফট চাই, ফোন চাই, শপিং চাই কক্ষনোও না। এ যুগের মেয়ে অথচ সোশ্যাল মিডিয়ায় এক্টিভিটিস নেই বললেই চলে। আমি একবার ফোন গিফট করতে চাইলাম, মুখের ওপর মানা করে দিলো। এমন মেয়ে বউ হলে জীবনে তোর কোনো চিন্তাই থাকবে না, বুঝলি? এরা বিয়ের পর স্বামীকে মাথায় তুলে তো রাখবেই, আবার দ্বিতীয় পুরুষের কথা ভাববে অবধি না।'

সাগরের চোখেমুখে বিস্ময়।

"তাই তো মনে হচ্ছে। এখনকার মেয়েরা তো শখ পূরণের জন্যে একটা বড়োলোক বয়ফ্রেন্ডের আশায় বসে থাকে, ভাই। আর তা না পেলে সুগার ড্যাডি আছে না! সেখানে যা শোনালি তাতে মেয়ে বেশ সেল্ফ রেস্পেক্টিং মনে হচ্ছে।”

"ইয়েস, এজন্যেই ওকে আমার লাগবে।"

CamScanner

"কিন্তু ভাই তুমি গাছেরও খাবে তলারও কুড়াবে। এমন চেয়েছ বলেই এত তাড়াতাড়ি ধরা পড়ে গেলা।"

রাফিন চ সূচক শব্দ করে বলল, "এটাই বুঝতে পারিনি। আরেকটু সতর্ক হওয়া উচিত ছিল আমার। যাক-গে ছাড়। ধরা পড়লে পড়েছি। মেয়েদের কনভেন্স করা আমার বাঁ হাতের খেল। একবার ওকে পাই, সামনা- সামনি বসে দুটো ভালো কথা বলি, সব একদম আগের মতো হয়ে যাবে। এমনিতে আমাকে ভালোবাসে। আর স্বাভাবিক, মেয়ে মানুষ নিজের ভালোবাসার কাউকে অন্যের সাথে দেখলে অভিমান তো করবেই। আর আমাদের কাজই হলো সেই ভালোবাসাকে ইনিয়ে বিনিয়ে কাজে লাগিয়ে অভিমান গলানো। বুঝেছিস?"

রাফিন হাসল। কথার পিঠে ঘাড় নাড়ল সাগর। তবে সংশয়ী সে। যা সব শুনেছে মেয়েটার ব্যাপারে, মনে হচ্ছে না ওর কাজ এত সহজ হবে।

গাড়ির চাকা বসুন্ধরা পেরিয়ে যাওয়ার সময়, আচমকা রাফিনের চোখ পড়ল রাস্তার উল্টোপাশে। সেঁজুতি-আরিশা রিকশায় উঠছে। কপাল কুঁচকে আরো সজাগ নেত্রে চাইল সে।

"সেঁজুতি না?"

"হ্যাঁ সেঁজুতিই তো।"

সহসা ইউটার্ন নিল রাফিন। ঠিক তখনই সিগন্যালের লাল বাতি জ্বলজ্বল করে উঠল। পথের বুকের যানবাহন থমকে গেল একে একে। রাফিনের গাড়ি নিয়ে আর এপাশে আসা হয় না। জ্যামের ভিড়ে আটকে থেকে দেখে যায় রিকশা সমেত সেঁজুতির ছুটে যাওয়া। যে মেয়েটিকে খুঁজতে সে লোক ভাড়া করল, সে নাকের ডগা পেরিয়ে চলে গেল তার। রাফিনের গায়ে আগুন ধরে যায়। উষ্ণ মেজাজে গাড়ির হুইলের ওপর ঘুসি বসিয়ে আওড়ায়, "শিট।"

ঘরের দরজাটা শক্ত হাতে ঠেলে ভেতরে ঢুকল রুদ্র। ততোধিক জোরে লাথি দিতেই, বিকট শব্দে পূর্বস্থানে এসে বাড়ি খেল সেটা। রুদ্রর চওড়া দেহ ফেঁপে উঠছে ক্রোধে। পরনের স্যুট খুলেই মেঝেতে ছুড়ে মারল। তারপর লম্বা পায়ে গিয়ে ঢুকল ওয়াশরুমে।

শাওয়ারের নিচে স্তম্ভের মতো দাঁড়িয়ে আছে রুদ্র। ঠান্ডা জল ঝরনার ন্যায় গড়িয়ে পড়ছে মাথায়। গায়ের সফেদ রঙা শার্ট, ফোন, ওয়ালেট ভিজে
নির্নিমেষ চুপচুপে হয়। অথচ রুদ্র নিরুদবেগ তাও। তপ্ত চোখের পর্দায় আজকের গোটা দিন ভাসছে। অনিচ্ছায় হোক বা অনীহায়, সেথায় কেবল সেজুতির দখলদারি। রুদ্র কোনোভাবেই মেনে নিতে পারছে না এই বেয়াদব মেয়েটি তার অফিসে কাজ করছে এখন। অথচ এতগুলো দিন

CamScanner

ভেবে এসছে ওকে সামনে পেলেই ক্ষমা চাওয়াবে। যে জুতোতে থুথু ফেলেছে সেই জুতোটাই আবার মোছাবে। স্বীকার করাবে নিজের ভুল, নিজের অন্যায়। কিন্তু কিচ্ছু হলো না। পরিস্থিতির প্রতিকূলতায় একটা টু শব্দ অবধি করতে পারেনি সে। রুদ্রর মানস্পটে ফের স্পষ্ট হয়ে ধরা দেয় সেই কদাকার দৃশ্য। সেঁজুতির টাকা ছুড়ে মারা। না, এই মেয়েকে সে ক্ষমা করবে না।

কী যেন বলেছিল সেদিন?

"এই যদি হয় হায়্যার ক্লাসদের নমুনা, তবে মিডল ক্লাস থাকাই ভালো।"

রুদ্র কোপের তোপে দাঁত পিষে ধরল। আমার অফিসে কাজ করতে এসেছেন না, মিস সেঁজুতি? একটা সুযোগ আসুক হাতে, শুধু একটা। তারপর বুঝবেন ধারালো কথার অস্ত্র কাকে বলে। যে অস্ত্রের ধার সামলানোর শক্তি আপনার নেই।

১১.

সেঁজুতির গোলগাল মুখখানা বিভ্রমে ডুবে। অফিসে আসার পর থেকেই এই বিভ্রান্তির শুরু। কারণ ঘড়িতে এগারটা পেরিয়েছে কিন্তু রুদ্র কোথাও নেই। গোটা ফ্লোরে দেখা যায়নি তাকে। সেঁজুতি মনে মনে তার সবচেয়ে অপছন্দের লোকটিকে খুঁজে বেড়াল। অকারণে নয়, কারণেই। লোকটা যতক্ষণ অফিসে থাকে চ্যাঁচায়, ধমকায়, রাগ দেখায়। দুদন্ড কাউকে স্বস্তিতে বসতে দেয় না। সে মানুষ এখনো না আসায় সব কেমন ঠান্ডা, নিরিবিলি।

কিন্তু কোথায় উনি? আজ কি আসবেন না? কৌতূহল যে ওর একার হচ্ছে তা নয়। আরিশাও সমান চিন্তিত। ঠিকঠাক কাজে মন দিতে পারছে না। রুদ্র কোথায় আছে এটা না জানলে একেবারেই চলছে না কারো। অফিসে কি আছে, না নেই? দেখা গেল নেই ভেবে একটু আরাম করতে বসেছে আর অমনি খ্যাঁক খ্যাঁক করতে হাজির হয়ে গেল।

বলা যায় না বাবাহ!

রেহান স্টলে কয়েকবার এসে ঘুরে যান। সবকিছু তাল মেনে চলছে কী না দেখতে। এই তো আরেকবার এলেন। সেঁজুতি ওনাকে দেখেই স্টল থেকে বেরিয়ে আসে। ছটফটে কণ্ঠে শুধায়, "রাগী স্যার কি আজ আসবে না, স্যার?"

আরিশা টাস করে চড় মারল কপালে। এই মেয়েটাও না। বাপের কাছে গিয়ে ছেলেকে 'রাগী স্যার' বলছে?

CamScanner

ভদ্রলোক প্রথম দফায় বোঝেননি। ভ্রু গোছাতে দেখে ঘাবড়ে গেল সেঁজুতি। মিনমিন করে বলল, "না মানে আসলে.."

তক্ষুনি হো-হো করে হেসে উঠলেন রেহান। আরিশা নিজেও ভয় পেয়ে গেছিল। ওনাকে হাসতে দেখে দুটো মেয়েই শ্বাস ফেলল স্বস্তির।

রেহান বললেন, "ভালো নাম দিয়েছ ওর। সত্যিইত, অত রাগারাগি কেউ করে?"

সেঁজুতিরও একই কথা। এত রাগারাগি কেউ করে? রাগ থাকবে মানুষের এক ফোঁটা। শুধু হাসি থাকবে ঠোঁটে। এই যে সেঁজুতির বুকের মধ্যে এত কষ্ট জমানো। এত গ্লানি, এত হতাশা। কই ও তো রেগে যায় না। খুব বাধ্য নাহলে কাউকে কখনো কড়া জবাবও দেয়নি। সবসময় সবার সাথে হেসে হেসে কথা বলেছে। আর এই লোক। নাকের ডগায় মেজাজের জাহাজ নিয়ে ঘোরে।

জিজ্ঞেস করল পুনর্বার, "উনি আসবে না, স্যার?"

"না। আজকে আসবে না। অন্য ব্রাঞ্চে কনফারেন্স আছে তো। সেখানে গিয়েছে।"

রেহান বলেই চলে গেলেন। ফিরে চাইলে দেখতেন, কীভাবে একটা ক্ষুদ্র মুখে পূর্ণিমার জ্যোৎস্না নেমে এলো। সেঁজুতির খুশির সীমা নেই। রুদ্র আসবে না এই জীবনে যেন এটাই সবচাইতে বড়ো খুশির খবর। আরিশাও সমান আনন্দিত। দুটোতে মিলে উচ্ছ্বাসে লাফাতে পারছে না শুধু।

কিন্তু এই আনন্দ বেশিক্ষণ টিকল না। দুপুর নাগাদ আরিশার শাড়ির কুচি খুলে গেল। চট করে ওয়াশরুমে ছুট লাগায় সে। আজকে ঘুম থেকে দেরি করে উঠেছিল। সেজন্য সময় নিয়ে তৈরি হওয়া হয়নি। তাই বলে শাড়ি খুলে যেতে হবে? ভাগ্যিস, কারো সামনে খুলে পরেনি।

সব ঠিকঠাক করে যখন বের হলো বাইরে, অমনি এসে দাঁড়াল অভ্র। আরিশা দেখেও ভান করল না দেখার। একপল চাইলও না। আলগোছে পাশ কাটাতে যাবে ডেকে ওঠে অভ্র, "শুনুন।"

ও দাঁড়িয়ে যায়। ফিরে চায় পেছনে, "আমাকে বলছেন?"

অভ্র মৃদু হাসল, "এখানে আপনি আর আমি ছাড়া কে আছে?"

"তাও ঠিক। কিছু বলবেন?"

আরিশার মুখায়বে অস্বস্তি। কথাতেও তাই। ও জিজ্ঞেস করল, "কেমন আছেন?"

CamScanner

মেয়েটার ছোটো জবাব, "জি আলহামদুলিল্লাহ!"

"আমাকে জিজ্ঞেস করলেন না?"

আরিশা লজ্জা পায়। ঠিক তেমনই বেড়ে আসে বিব্রতভাব। মৃদু কণ্ঠে বলল, "সরি! আপনি কেমন আছেন?"

অভ্র মুচকি হেসে বলল, "সত্যি বলতে ভালো নেই।"

আরিশা ভ্রু গোটাল, "কেন?"

সরাসরি বলে বসল সে, "আপনি যদি আমার সাথে এক কাপ কফি খেতেন, তাহলে ভালো থাকতাম।"

হোঁচট খেল মেয়েটা। অবাক হয়ে বলল, "আমি!"

"জি। কেন, অসুবিধে আছে?"

আরিশা এমন কিছু আশা করেনি। এই লোকের সঙ্গে ও কফি খাবে কোন দুঃখে। এমনিতেই দেখলে গা জ্বলে যাচ্ছে। তার ওপর কেমন কেমন করে তাকায়। কিন্তু বস মানুষ। মুখের ওপর তো মানাও করা যায় না। কী যে করবে!ভারি মুসিবতে পড়ে গেল বেচারি।

অভ্র বলল, "আপত্তি থাকলে থাক। আমি বাইরে খাওয়ার কথা বলিনি। অফিস ক্যানটিনের কথাই বলেছি।"

আরিশা ইতস্তত করে বলল, "কিন্তু আমি আপনার একজন সামান্য কর্মচারী। একসাথে কফি খেতে দেখলে অন্যরা কী বলবে?"

"সমস্যা নেই। ডিউটি টাইম তো, ক্যানটিনে কেউ থাকে না এখন। আপনি রাজি কি না সেটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ।"

আরিশা আর মানা করল না। এক কাপ কফিই তো। একটু চুপ থেকে বলল, "ঠিক আছে চলুন।"

CamScanner

অভ্র খুশি হয়ে যায়। হাত লম্বা করে পথ দেখিয়ে বলে, "লেডিস অলওয়েজ ফার্স্ট, আপনি আগে যান।"

ঠোঁটে হাসি টানল আরিশা। পা ফেলে হেঁটে গেল সামনে। অভ্র পিছু নেয়। মেয়েটার খোলা লম্বা চুল দেখে ভাবে, "এইভাবে যদি আপনার মন দিতেও রাজি হন, তবে আর কিছু চাওয়ার নেই আমার।"

সেঁজুতি স্টলে বসে আছে। চনমনে, ফুরফুরে মেজাজ। হাত-পা শান্ত রইলেও কলকণ্ঠে তার গুনগুনে গান। কাজ যা ঘাড়ে পড়েছে সব করা শেষ। লাঞ্চের পর আবার নতুন কাজ দেওয়ার কথা। ততক্ষণ মুক্ত বিহঙ্গে শ্বাস ফেলা যাবে। কিন্তু এই বাধ ভাঙা খুশি আজ দীর্ঘস্থায়ী হলো না। আচমকা তলপেট চিনচিন করে উঠল। সেঁজুতি আমোলে নেয়নি প্রথমে। বসে ছিল অমন। কিন্তু আস্তেধীরে ব্যথা গাঢ় হয়। যন্ত্রণা পেট ছাপিয়ে নেমে আসে কোমরে। এতসময়ের উৎফুল্ল মেয়েটা চুপসে গেল অমনি। বসা থেকে সটান দাঁড়িয়ে পড়ল। বিড়বিড় করে বলল, "এই রে, পিরিয়ডস। এবার কী হবে?"

এই এক ঝামেলা, একটা মাসেও তারিখ ঠিক থাকে না। যখন ইচ্ছে শুরু হয়ে যায়। কিন্তু এখন? কোনো পূর্বপ্রস্তুতি নেই, কিছু না। সমস্ত জামাকাপড় দেখে যাবে না? আতঙ্কে মেয়েটার বুক কাঁপে। ওদিকে পেট ব্যথা বাড়ছে। আরিশাটাও নেই। কখন ওয়াশরুমে গেল এখনো আসেনি। সেঁজুতি ওর অপেক্ষায় না থেকে নিজেই সেদিকে যায়। কিন্তু আরিশা সেখানে নেই। ওয়াশরুম ফাঁকা পড়ে আছে।

হতাশ চেহারায় ফিরে এলো মেয়েটা। উরু হতে স্রোত নামার স্পর্শেই শঙ্কায় মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। কাকে বলবে, কার কাছে যাবে? ওদের ছাড়াও এখানে চারটে মেয়ে ছিল। বাকি তিনজনকে আজ নিয়ে গেছে অন্য ফ্লোরে। যে মেয়েটা আছে, এত হিংসুটে। গতকাল আরিশা আর সে রুদ্রর থেকে কথা শোনার পর ওদের নিয়ে ইঙ্গিতে ইঙ্গিতে বেশ হাসাহাসি করেছিল। এমন মেয়ের কাছে সেঁজুতি জন্মেও সাহায্য চাইবে না। কিন্তু করবেটা কী? ও আশেপাশে তাকাল। মনে মনে খুঁজে বেড়াল আরিশাকে। ব্যর্থতায় চোখের জল ছুটে আসে এবার। শব্দহীন কান্নায় রাঙা ঠোঁট ভেঙে ওঠে চূড়ায়।

রেহান কিছু দরকার এসেছিলেন। একেবারে মাঝখানে সেঁজুতিকে স্তম্ভের মতো দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে গুছিয়ে নিলেন ভ্রু। বাকি সবাই কাজে ব্যস্ত, তাহলে এই মেয়েটা এখানে কেন? চটপট এগিয়ে এলেন তিনি।

পাশে কারো উপস্থিতিতে সংকীর্ণ মুখ তুলে চাইল সেঁজুতি। টলমলে চোখ দেখেই বিস্মিত হলেন রেহান। কণ্ঠে উদ্দ্বেগ এনে বললেন, "এ কী, কাঁদছ কেন, সেঁজুতি? কিছু হয়েছে?"

CamScanner

মাথা নামিয়ে নেয় ও। দুপাশে নেড়ে বোঝায়, কিছু হয়নি।

রেহান বুঝে নিলেন হয়তো। মাথায় হাত রেখে বললেন, "কোনো সমস্যা হলে আমাকে বলতে পারো তুমি। আমি তো তোমার বাবার মতোই।"

সেঁজুতি নিশ্চুপ। উত্তরের বদলে ঠোঁটদ্বয় টিপে নিল আরো।

"তোমার কি শরীর খারাপ লাগছে?"

এবার ওপর-নিচে ঘাড় নাড়ল মেয়েটা। খুব আস্তে জানাল, "তলপেটে ব্যথা করছে।"

রেহানের গোছানো ভ্রু উবে যায়। বুঝতে আর বাকি নেই কিছু। অথচ কুণ্ঠায় চৌচির সেঁজুতি। এরকম একটা ব্যাপার নিয়ে সে আলোচনা করতে চায়নি। কিন্তু না বলেও যে উপায় নেই। একটা সাহায্য যদি পায়!

রেহান সাবলীল ভাবে বললেন, "আচ্ছা, আমার সঙ্গে এসো।"

পুরো অফিসে তখন গিজগিজে লোকজন। কেবল রুদ্রর কেবিনই শুধু পড়ে আছে। সে আজ আসেনি। আসার কথাও নয়। মেয়েটা অসুস্থ যখন, এখানেই বসুক। রেহান সেঁজুতিকে সাথে করে একেবারে রুদ্রর কেবিনে নিয়ে এলেন। ভেতরে ঢুকেই চোখ কপালে তুলল মেয়েটা। এটা কেবিন না বাড়ি?

উনি বললেন, "তুমি এখানে বসো। আমি একটা ব্যবস্থা করছি।"

সেঁজুতির অস্বস্তি হচ্ছে। হাত দুটো কচলে যাচ্ছে সমানে। ওভাবেই একটু মাথা নাড়ল শুধু। লজ্জায় গাঁট হয়ে ভালো মানুষটার দিকে চাইতেও পারছে না। রেহান হাবভাবে বুঝে নিয়েছেন। চমৎকার লোকটা তেমন চমৎকার হেসে বললেন, "এসবে লজ্জার কিছু নেই, মা। এটা তো সৃষ্টিকর্তারই দান। আর এইজন্যেই না মেয়েরা মা হতে পারে?”

সেঁজুতি বিস্ময়াভিভূত হয়ে চোখ তোলে। টের পায় অক্ষিকূটের জ্বালাপোড়া। মুহূর্তেই যা ভিজে পুকুর তৈরি করল। এইভাবে আশ্বাস, ভরসা কোনোদিন বাবাও দেয়নি। সেঁজুতি কৃতজ্ঞতায় ভেতর ভেতর লুটপাট হয়।

CamScanner

টলটলে চোখ দেখে রেহান উদ্‌দ্বিগ্ন হয়ে বললেন, "আবার কাঁদছ কেন মেয়ে? খুব খারাপ লাগছে? আচ্ছা তুমি বসো, আমি এক্ষুনি আসছি।"

দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেলেন তিনি। সেঁজুতি ঠাঁয় দাঁড়িয়ে রইল। চোখ মুছে নজর বোলাল চারদিক। এত পরিপাটি আর টিপটপ কেবিন দেখে ভীষণ মুগ্ধতায় বুঁদ হলো নয়ন। কোথাও কোনো কিছুর কম-বেশি নেই। দেওয়ালের রং থেকে আসবাব, এমনকি টেবিলের ডিজাইন অবধি চোখে শান্তি দেওয়ার মতো। এখানে আট ঘন্টা কেন, সেঁজুতি আটশ ঘন্টাও বসে কাজ করতে পারবে। ও ধরেই নিয়েছে এটা রেহানের কেবিন। চারপাশটা দেখতে দেখতে ভাবল, "আঙ্কেলের ব্যবহারের মতো ওনার রুচিটাও দারুণ!"

পিওনকে দিয়ে ন্যাপকিন আনিয়েছেন রেহান। কিন্তু সত্যি বলতে এখন ওনার নিজেরও সংকোচ হচ্ছে। মেয়েটা যেভাবে লজ্জা পাচ্ছিল সরাসরি এটা নিতে তো আরো অস্বস্তিবোধ করবে।

ভদ্রলোক আরিশাকে ডেকে পাঠালেন। জানা গেল সে স্টলে নেই। পিওনের ঘাড়ে দায়িত্ব বর্তাল ওকে খুঁজে আনার।

ওদিকে মাত্রই দুটো কফিমগ এনে রাখা হয়েছে আরিশা-অভ্রর সামনে। অভ্র চুমুক দিয়ে কথা শুরুও করতে পারেনি এরমধ্যেই হাজির হলেন লোকটা। বললেন বিনয়ী গলায় "স্যার ডাকছেন।"

উগড়ে দিয়েই চলে গেলেন আবার। এরপর আর বসে থাকার সাধ্য আরিশার নেই। কফি-টফি ফেলে ত্রস্ত ছুট লাগায় সে। পেছনে শুভ্র পুরুষের কালো মুখবিবর একবার ফিরেও দেখেনি।

আরিশার বুক দুরুদুরু। রেহান চৌধুরী হঠাৎ কেবিনে ডেকে পাঠিয়েছেন, এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না। সেই সাথে বেড়ে এসেছে ভয়। ওকে কাজ ফেলে অভ্রর সাথে কফি খেতে গেল, সেজন্যই কি ধমকাবেন এখনও ইস। রুদ্র নেই ভেবে নাচতে নাচতে গেছিল। কিন্তু রেহান চৌধুরীও তে অফিসের চেয়ারম্যান। বাপ কা ব্যাটা হলে, ব্যাটা কা বাপ হতে কতক্ষণ? যে ছেলের অমন রাগ, তার বাবা তো আর ধোয়া তুলসিপাতা হবে না।

হাজারখানেক চিন্তা মনে সাজিয়ে কেবিনের দরজায় এলো আরিশ কিন্তু কষ্ট করে ভেতরে ঢুকতে হয়নি। এর আগেই অধৈর্য হয়ে বেরিয়ে এসেছেন রেহান। ওকে দেখেই বললেন, "এসেছো তুমি। তোমার বন্ধুর একটা সমস্যা হয়েছে। দেখো তো একটু! আর এটা ওকে দিয়ে দিও।"

কোনোরকম হাতে দিয়েই চলে গেলেন তিনি। মেয়ে মানুষ তো! আরিশার বুঝতে সময় লাগেনি এটা কী! এই রে। ও ঝড়ের বেগে ছুটল সেঁজুতির কাছে।

CamScanner

গিয়ে দেখল স্টল ফাঁকা। ওয়াশরুমও তাই। এখন এত বড়ো অফিসের কোথায় খুঁজবে ওকে? স্যার তো বলেও গেলেন না, ও কোথায়!

সূর্য যখন মাথা বরাবর আটকে, ঠিক সেই সময় অফিসে ঢুকল রুদ্র। চিবুকের শ্বেত রঙা চামড়া লালচে আজ। ক্রমে ফুঁসছে চোখা নাক। চোখেও চাউনিতে জ্বলন্ত ভাব। এই প্রথমবার ওর প্রোডাক্টের ডিল ফাইনাল হয়নি প্রচারণার আগেই, রুদ্রর অ্যাসিস্ট্যান্ট লুকিয়ে-চুরিয়ে প্রডাক্ট স্যাম্পল অন্য পক্ষের হাতে তুলে দিয়েছে।

যে মানুষটার অভিধানে পরাজয় নেই, আজ প্রথম বিফল হয়ে ফিয়ে এসেছে সে। একটা সম্ভাব্য ডিল মুখের সামনে থেকে অন্য কোম্পানি ছিনিয়ে নিয়েছে। রুদ্র ক্ষুব্ধতায় একাকার হয়ে অ্যাসিস্ট্যান্ট ছেলেটিকে জেলে অবধি দিলো। মিটিংয়ের মধ্যেই সব ছেড়েছুড়ে বেরিয়ে এসেছে। অথচ এক বিন্দু ভাটা পড়েনি রাগে।

রুদ্র সবার আগে রেহানকে খুঁজল। ডেকে ডেকে নয়, নীরবে চোখ ঘুরিয়ে। কেবিনেও ছিলেন না তিনি। অভ্র, রেহান দুজনেই এই অফিসে বিধায় খোলাখুলি আলোচনা দরকার।

কাউকে না পেয়ে স্বীয় কেবিনের পথে এগোয় সে।

তেজি হাতে দরজা ঠেলে ঢোকে। অমনি নজর পড়ল সেঁজুতির ওপর। চেয়ারেই বসে মেয়েটা। উশখুশে চিত্তে এদিক-ওদিক দেখছে। হাত কচলাচ্ছে কখনও।

"হোয়াট দ্য হেল ইজ দ্যাট!"

নিস্তব্ধ কক্ষে হঠাৎ রুঢ় স্বরে চমকে উঠল সেঁজুতি। চৌকাঠে রুদ্রকে দেখেই দাঁড়িয়ে পড়ল তড়াক করে। রুদ্র লম্বা পায়ে এগিয়ে আসে। দগদগে তার কন্ঠ, "আপনি এখানে কী করছেন? কেন ঢুকেছেন এখানে?"

ঢোক গিলল সেঁজুতি। সাফাই দিতে বলল, "ইয়ে মানে আমাকে আঙ্কেল..

রুদ্র চেতে যায়, "আঙ্কেল নয় স্যার।"

সেঁজুতির কথা থামে। ভীতসন্ত্রস্ত ছাপ বসে আননে। জিভে ঠোঁট চুবিয়ে বলে, "জি, আমাকে স্যার এখানে নিয়ে এলেন।"

CamScanner

"কেন? কেন একজন সামান্য কর্মচারীকে আমার কেবিনে আনবেন শুনি?"

সেঁজুতি হোঁচট খেল। এটা ওনার কেবিন? জবাব দিলো নিভু স্বরে, "সরি! চলে যাচ্ছি আমি।"

আরিশাও ঠিক সেসময় এসেছে। রুদ্রকে দেখেই উদ্‌বেগী কথাবার্তা গিলে ফেলল সব। ডাকল মিনসে গলায়, "সেঁজুতি, আয় আমার সাথে।"

নতমস্তকে রুদ্রর পাশ কাটাল সেঁজুতি। নরম পায়ে দোর অবধি গেল। সহসা রুদ্রর চোখ পড়ল এতক্ষণ ওর বসে থাকা জায়গায়। ছাই রঙা ফোমের কেদারায় লাল দাগটা বড্ড চিহ্ন তুলে চেয়ে আছে। রুদ্র এমনিতেই খ্যাপে ছিল। তিরিক্ষ মেজাজ তুঙ্গে উঠল সহসা। কুৎসিত সেই দাগ দেখে মিটে গেল হিতাহিত জ্ঞান। অহংকারী ছেলেটার মাথায় কিচ্ছু ঢুকল না আজ। মেয়ে মানুষের এমন সমস্যাও না। তুরন্ত কাঠের চেয়ার মাথায় তুলে আছাড় মারল সে। শব্দে কেঁপে উঠল সেঁজুতি, আরিশা। হকচকিয়ে দাঁড়িয়ে গেল দুজন। মেঝেতে হেলায় পড়ে থাকা ভাঙা কাঠের টুকরো দেখে হতবাক হয়ে পড়ল। রুদ্র চিৎকার ছুড়ল অমনি, "ড্যাড, ড্যাড।"

জোরালো আওয়াজ পৌঁছে গেল অফিসের কোনাকুনিতেও। কী না কী হয়েছে ভেবে ছুটে এলো সবাই। এত সময়ের ফাঁকা কেবিন মুহূর্তে ভরতি হলো মানুষে। আরিশা-সেঁজুতি মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছে। কী ঘটেছে কেউই বুঝতে পারছে না। আবার কোন খেল দেখাবেন এই লোক? রেহানের প্রথমেই নজর পড়ল ভাঙা কেদারার দিকে। আর্তনাদ করে বললেন, "এ কী, এটার এই অবস্থা কেন?"

রুদ্র সেই জবাব দিলো না। সরাসরি আঙুল তুলল সেঁজুতির ওপর।

প্রশ্ন করল ক্রুদ্ধ স্বরে, "এই মেয়েকে আমার কেবিনে বসিয়েছে কে?'

সেঁজুতির বক্ষস্পন্দন থেমে যায়। বোধে আসে কাহিনি। ইস, আবার আরেকটা না জেনে ভুল করে বসেছে। লোকটা তো সুযোগ খুঁজছিল ওকে হেনস্তা করার। আর ও সেটা নিজেই হাতে তুলে দিলো। এখন যে কী করবে আল্লাহ।

রেহান ওর দিক একবার চেয়ে জানালেন, "আমি, কেন?"

রুদ্রর উচু স্বর, "কেন বসিয়েছ?"

কারণটা সবার সামনে বলতে পারলেন না ভদ্রলোক।

CamScanner

"ওর একটু সমস্যা..."

কথা কেড়ে নেয় সে, "সমস্যা যাই থাকুক, এই মেয়ে কেন আসান এখানে? কোন সাহসে আমার কেবিনে ঢুকবে? আমার চকচকে কেবিন নোংরা হলো এই মেয়ের স্পর্শে। আমার এত দামি চেয়ার..."

সেঁজুতি লজ্জায় চোখ নামিয়ে ফেলল। রুদ্র রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে থেমে যায়। রেহান বোঝাতে চাইলেন ছেলেকে। কণ্ঠে নম্রতা, "রুদ্র, মেয়েটা অসুস্থ। অফিসের সব জায়গায় লোক, শুধু তোমার কেবিন খালি বলেই আমি ওকে এখানে এনেছিলাম।"

রুদ্র হাত উঁচু করল। কঠিন তার কণ্ঠ, "আমি কোনো অজুহাত শুনতে চাই না, ড্যাড। এই নোংরা, বেয়াদব মেয়েকে আমার সহ্য হয় না। আর সেই মেয়ে কি না আমার কেবিনে এসেছে? হাউ কুড ইট বি!"

রেহান-অভ্র হতবুদ্ধিভাবে একে-অপরকে দেখলেন। বুঝতে না পেরে বললেন, "কেন? সেঁজুতি কী করেছে?"

সেঁজুতি ঢোক গিলছে বারবার। রুদ্র অফিসে আসবে না শুনে সকালে ভেবেছিল আজকের দিনটা সবথেকে ভালো কাটবে। অথচ..

রুদ্র বাবার উত্তর দিলো না। বরং সোজাসুজি ওর দিকেই চাইল। সবার মধ্যেই বলে বসল, "এই মেয়ে এই, তুমি আর কোথায় কোথায় বসেছিলো ব্লাড কোথায় কোথায় লাগিয়েছ?"

আরিশা হাঁ করে ফেলল। এতগুলো পুরুষের সামনে এমন কথায় সেঁজুতি স্তব্ধ, বিমূঢ়। চোখ খিচে বুজে নিল লজ্জায়। নিজেকে বাঁচাতে শুধু মাটিতে মিশে যেতে পারে না। যারা এতক্ষণ কিছুই বোঝেনি, ওদেরও এবার মাথায় ঢুকল সব। ঘোলা জল মুহূর্তেই চোখের সামনে পরিষ্কার হয়ে গেল। কানাঘুষা শুরু হলো মিনিটে। ছেলের কাণ্ডে রেহানও সমান হতচেতন।

রুদ্র নিজের মধ্যে নেই। ফরসা চেহারা যেন পশ্চিমের রক্তলাল সূর্য। মাথার তালু ফুটন্ত, টগবগে। কিন্তু তাই বলে এমন লাগামহীন কথা বলে মানুষ?

রেহানও রেগে গেলেন। কন্ঠ পুরু করে বললেন, "এবার কিন্তু তুমি বাড়াবাড়ি করছ, রুদ্র। মেয়েটা নিজে আসেনি, আমি ওকে এনেছি। আর তুমি বুঝেশুনেও এতগুলো লোকের সামনে ওকে এইভাবে ছোটো করতে পারো না। এই শিক্ষা আমি তোমাকে দিইনি।"

CamScanner

অভ্রও মুখ খুলল, "ভাই, ভাই মাথা ঠান্ডা করো। বিষয়টা অন্যভাবে মিটিয়ে নিলে হতো না?"

"তুই চুপ কর। সিকিউরিটি ডাক, এক্ষুনি এই মেয়েকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বার করে দে। রাইট নাউ। আমি ওকে সহ্যই করতে পারছি না। ওকে দেখার পর থেকে আমার সাথে কিচ্ছু ভালো হয়নি। প্রথমবারের মতো রুদ্র রওশন চৌধুরী হেরে গেছে। পাওয়া জিনিসটা হাত ফসকে বেরিয়ে গেছে তার।"

রুদ্র টেবিল থাপড়ে চিল্লিয়ে ওঠে। নিঃশ্বাসে হিসহিসে শব্দ হয়।

রেহান মৃদু ধমকে বললেন, "রুদ্র! শান্ত হও। ডিল হাতছাড়া হলে সেঁজুতির কী দোষ?"

ও খ্যাপে বলল, "তুমি কোনো কথা বলবে না, ড্যাড। এই রাস্তার মেয়েকে চাকরি দিয়ে অফিসটাকেই নোংরা বানিয়ে ফেলেছ। আমি..."

"ব্যস!"

রুদ্র আরো কিছু বলতেই যাচ্ছিল। হঠাৎ চিৎকারে থমকে যায়। ওর সাথে সাথে বাকি সবগুলো নজর এক সাথে নিক্ষেপ হয় সেঁজুতির ওপর। একটু আগে নিঃশব্দে কাঁদা মেয়েটা মুখ শক্ত করে দাঁড়িয়ে। চোখের মধ্যে আত্মগরিমা! কিংবা অজানা কোনো দাপট। যেই দর্প ঠিকড়ে এলো কন্ঠেও, "মুখ সামলে কথা বলবেন মিস্টার রুদ্র রওশন চৌধুরী। চাকরি দিয়েছেন বলে আমাকে যা নয় তাই শোনানোর সাহস কোথায় পেয়েছেন আপনি?"

রুদ্র বিমূর্ত, স্তম্ভিত। আনুকূল্যে থাকা পরিবেশ বদলে গেল অচিরে। উষ্ণ অক্ষি ছড়িয়ে গেল অবিশ্বাসের তোপে। সবার অবাক চোখ তখন সেঁজুতিতে আটকে। সে কটমট করে বলল, "হাউ ডেয়ার ইউ! আপনি আমার সাথে গলা তুলে কথা বলছেন? আমার সাথে?"

সেঁজুতি পালটা জবাব দিলো, "হ্যাঁ বলছি। আর বেশ করছি বলে। অনেকক্ষণ ধরে সহ্য করছিলাম আপনাকে। কিন্তু আর নয়। কী ভাবেন নিজেকে? টাকার কুমির বলে কাউকে মানুষ মনে হয় না? এত শিক্ষা, এত পড়াশুনার দৌড় বুঝি এই? রেডিকিউলাস!"

রুদ্র হুঙ্কার ছাড়ল, "জাস্ট শাট আপ!"

“ইউ শাট আপ। মাত্র তিনদিনের বেতনভুক্ত কর্মচারী হয়েছি বলে আপনি আমায় কিনে নেননি। এরকম অভদ্রের মতো ব্যবহার করলে আমি কিন্তু মেনে নেব না। যে অন্যকে সম্মান দিতে জানে না, তাকে আমিও সম্মান দেবো এমন ভাবা ভুল। আমি এখানে যেচে বসিনি। আপনার বাবা

CamScanner

নিজে বসিয়ে দিয়ে গিয়েছেন। আমি যদি জানতাম এটা আপনার কেবিন, মরে গেলেও পা রাখতাম না। কেবিন তো দূরের কথা যেখানে আপনি থাকবেন সেই জায়গায় ফিরে দেখারও ইচ্ছে আমার নেই। আরে, আমি তো এটাই জানতাম না যে এই অফিসেও আপনি আছেন। জানলে আমার জুতোও আসত না এখানে।"

রুদ্র বিস্ময়ে বাকরুদ্ধ। চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, "মাইন্ড ইওর ল্যাংগোয়েজ। ভুলে যাবেন না আপনি কার সাথে কথা বলছেন। আমি চাইলে.."

সেঁজুতি কথা টেনে নিল, "কী, আপনি চাইলে? বের করে দেবেন? তার দরকার নেই। আমি নিজেই চলে যাচ্ছি। এত কিছুর পরেও এখানে কাজ করব, অমন নির্লজ্জ আমি নই।"

একটু থেমে বলল, "তবে একটা কথা না বলে পারছি না। যেই ব্যাপারটা নিয়ে আপনি আজ এতগুলো মানুষের সামনে আমায় অপমান করলেন, এই একটা কারণেই কিন্তু আপনার মা আপনাকে জন্ম দিতে পেরেছিলেন। অবশ্য এসব ভালো কথা কি আর আপনার মাথায় ঢুকবে? অহংকারী মানুষের মস্তিষ্ক তো অচল পয়সার মতন। তবে আমার মনে হয় কী, জানেন? আজ যদি মেয়েরা এই রোগে না ভুগত, যদি আপনার মা-ও এই রোগে না ভুগতেন, হয়তো সেটাই ভালো ছিল। অন্তত আপনার মতো লোক জন্মে এই সুস্থ পৃথিবীটাকে অসুস্থ বানাতে পারত না।"

রুদ্র কিংকর্তব্যবিমূঢ়। গোটা অফিস কর্মচারী, বাবা, ভাই সবার সামনে এমন কথায় নিস্তব্ধ হয়ে পড়ল। তপ্ততায় হারিয়ে গেল তার সমস্ত বাক্য।

সেঁজুতি যেতে নিয়েও দাঁড়ায়। ফিরে চায় বাকরহিত রেহানের পানে। কণ্ঠে বিনয়, "আমায় ক্ষমা করবেন, স্যার। আপনাকে ছোটো করার জন্যে কিছু বলতে চাইনি। তবে শুনতে খারাপ লাগলেও একটা কথা সত্যি, আপনি কিন্তু আপনার ছেলেকে মানুষ করতে পারেননি।"

আর এক মুহূর্ত থামল না মেয়েটা। সবাইকে ছাপিয়ে বীরের ন্যায় বেরিয়ে গেল। আরিশা সঙ্গে সঙ্গে ছুট লাগায় পেছনে। রেখে যায় ঠাঁয় দাঁড়ানো হিংস্র রুদ্রকে। যার রক্তের শিরা-উপশিরা অবধি কেঁপে উঠল এই অপমানের তোপে।

রেহান ফোঁস করে শ্বাস ঝাড়লেন। কিছু বলতে যাবেন, আচমকা রুদ্র লাথি বসাল কেবিনে রাখা অ্যাকোরিয়ামের গায়ে। বিকট শব্দে ভেঙে পড়ল সব। কাচের টুকরো, নীল জল, ছোটো ছোটো মাছ ছিটকে গেল এদিক- সেদিক। ভরকে পিছিয়ে যায় সকলে। রেহান আঁতকে বললেন, "রুদ্র, কী করছ তুমি?"

CamScanner

ওর কানে সেসব যায়নি। গলা ফাঁটাল চিৎকারে, "আউট। আই সোড আউট, এব্রিওয়ান আউট ফ্রম হিয়্যার।"

এরপরে এক দণ্ড দাঁড়িয়ে থাকার সাহস কারো নেই। ত্রস্ত পায়ে প্রস্থান নিল সবাই। পারল না দৌড়ে যেতে। রেহান বুঝলেন পরিস্থিতি খুব গুছিয়ে বিগড়ে গেছে। এই ছেলেকে এখন কিছুই বলা যাবে না। অভ্রকে ইশারা করলেন তিনি।

বেরিয়ে গেলেন দুজনে। রুদ্র ঝুঁকে টেবিলের কাচ খামচে ধরল। ছিন্ন হলো হাতের ত্বক। কাটল, বেরিয়ে এলো গলগলে তরল। অথচ উদ্বেগহীন সে ফুঁসছে এখনও। কাঁপছে তার বলিষ্ঠ শরীর। এসির মধ্যেও পরনের শার্ট ঘামে চুপচুপে হয়েছে। ফেঁপে উঠছে কপালের শিরা।

"আই উইল নট স্পেয়্যার ইউ মিস সেঁজুতি। এই অপমান, এই অপমান রুদ্র ভুলবে না। যতক্ষণ না আমার পায়ে এসে লুটিয়ে পড়বেন, নাকে খদ দেবেন, ততক্ষণ অবধি শান্তি দেবো না আপনাকে। এক মুহূর্তও না। ইটস মাই প্রমিস!"

বলতে বলতে আস্ত টেবিলটাকে উলটে দেয় সে। সেঁজুতির মুগ্ধ হওয়া সেই গোছানো কেবিনে, মুহূর্তেই বইয়ে আনে এক সরব ধ্বংসযজ্ঞ।

যানবাহনে ব্যস্ত রাস্তার একপাশে ইট বিছানো ফুটপাত। তার ওপর হতে বিধ্বস্ত চিত্তে হেঁটে যাচ্ছে সেঁজুতি। নম্র চিবুকে কাঠিন্য। অথচ একটু পর পর জল মুছছে চোখের। এই লোকটাকে সে কোনোদিন ক্ষমা করবে না।

আরিশা ছুটতে ছুটতে ওর ছোঁয়াছুঁয়ি হলো। অথচ টু শব্দবিহীন হেঁটে চলল পা মিলিয়ে। সুশ্রী মুখবিবরে তার ঘোর অমানিশা। চোখ ভরতি প্রিয় বন্ধুর জন্য উথলে পড়া মায়া। কিছু বলতে চেয়েও থেমে গেল মেয়েটা।

ফুটপাতের কোনায় পাতানো বেঞ্চে বসে পড়েছে সেঁজুতি। আরিশার বসল তার পাশে। কথা বলার জন্যে জিভখানা নিশপিশ করছে বড্ড। কিন্তু কী বলবে জানে না। একটা ভরা অফিসে যে মানহীনতার স্বীকার হয়েছে মেয়েটা, সেই জখম সারাতে আদৌ কি কোনো সান্ত্বনা কাজে দেবে? আরিশা হাঁসফাঁস করে ওঠে। পরপর নিশ্চুপ বসে রয়। সম্মুখের রাস্তা হতে শাশ করে একেকটি গাড়ি ছুটছে।

মাথার ওপর রুক্ষ দুপুরের উত্তপ্ত রোদ। সেঁজুতি কিছুক্ষণ নিথরের মতো বসে থাকে। চোখ দুটোতে ঘন বর্ষাকাল। আচমকা দুহাতে মুখ ঢেকে হুহু করে কেঁদে উঠল সে। আরিশা বিচলিত

CamScanner

হয়ে পড়ে। গলবিলের কাছটা ফ্যাসফাসে লাগে বড়ো। কাঁধে হাত রাখতেই মুখ তুলল সেঁজুতি। পরপরই জড়িয়ে ধরল ওকে।

প্রলাপ করল ভেজা স্বরে, "আমি ওনাকে কোনোদিন ক্ষমা করব না। আরিশা,কোনো দিন না।

১২.
শহরজুড়ে রাত নেমেছে। নৈসর্গে তখন অন্ধকার। ঠিক যতটা অন্ধকারে ডুবেছে সেঁজুতির চন্দ্রমুখী আদল। মাথার ওপর এই যে, তারাশূন্য দ্যুলোক। ঝোঁপের ফাঁকে উড়তে থাকা আলোহীন জোনাকি, সব কিছুতে কেমন বিষণ্নতা লুকিয়ে। বাতায়ণে শীতলতার ছিটেফোঁটা নেই।

এই বিষণ্নতা কীসের? প্রকৃতির না সেঁজুতির জীবনের? যে বিষাদ পিরিয়ডের অসহ্য ব্যথাকেও হার মানায়! সেঁজুতি খোলা আসমানে চাইল। পোড়া কপালে সুখ কি কোনোদিন আসবে না? যা একটু আশার আলো দেখল, তাও শেষ।

সহসা দুশ্চিন্তারা কামড়ে ধরে বুক। এই সেমিস্টার ড্রপ দেওয়া ছাড়া হাতে আর কোনো উপায় নেই। সেমিস্টার ফি-ই যেখানে নয় হাজার টাকা! এত টাকা কে দেবে ওকে? অসহায়ত্বের যাতাকলে পিষ্ট হয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে ফেলল সেঁজুতি। আচ্ছা, এই চারতলা থেকে ঝাঁপ দিলে ও কি মরে যাবে? মরলে নিশ্চয়ই সব জ্বালা মিটত। আত্মহত্যা মহাপাপ না হলে তো কবেই মরত। যেদিন রাফিন ঠকিয়েছে। মাথা থেকে হাত তুলে নিয়েছেন বাবাও সেদিনই জীবনের মানে খুইয়েছে সে। গভীর রাতে একা দাঁড়িয়ে সেঁজুতি দুহাত তুলে চাইল, একটা কোনো ব্যবস্থা হোক। কিছু একটা।

টানা দুইদিন বাড়ি ফেরেনি রুদ্র। অফিসে সেবার তাকে শেষ দেখা গেছে। এরপর থেকেই আর কোনো খোঁজ নেই। রেহান, অভ্রর হাজারটা ফোনকল এড়িয়ে গেল সানন্দে। চিন্তায় ছটফট করলেন সকলে। অথচ গোঁয়ার ছেলে তোয়াক্কা দেখায়নি। তবে এই লাপাত্তা হওয়ার কারণ একটু হলেও আঁচ করেছেন রেহান। জীবনে এরকম অসম্মান কখনো হয়নি তো। মেনে নিতে সময় লাগছে।

রেহানাকে অফিসের ঘটনা কেউ বলেনি। না অভ্র, না রেহান। ভদ্রমহিলার ধারণাও নেই, কী নিদারুণ ঘটনা ঘটেছে ওখানে। তারপর একটা সময় কল করে করে ক্ষান্ত দিলেন রেহান। ফোন ধরছে না যখন, ও ছেলে
আর ধরবেও না। এর প্রত্যেকটি লোমের কূপ তার পরিচিত কি না। সব জানে।

CamScanner

এদিকে অভ্ররও সমান তালে মন-মেজাজ খারাপ। কিন্তু কারণ ভিন্ন। আরিশার সঙ্গে ভালো করে একটা কথাও হলো না। প্রথম দেখায় মনের ভেতর রাজত্ব চালানো মেয়েটা তো জানতেই পারল না কিছু। কত কী বলতে চেয়েও পারেনি অভ্র। গত দুদিন যাবৎ সে লাগাতার চেষ্টা করছে আরিশাকে খুঁজে পেতে। পায়নি।

বিরস চিত্তে শ্বাস ফেলতে ফেলতেই হঠাৎ টনক নড়ল অভ্রর। আচ্ছা, করিম সাহেব না আরিশাকে রেকমেন্ড করেছিলেন? ওনার কাছে নিশ্চয়ই ওর ফোন নম্বর থাকবে। ছেলেটার তমশায় ঘিরে থাকা চেহারা সবেগে ঝলকে উঠল। তৎপর বসেই ফোন তুলল হাতে।

বিশালাকার কক্ষের একটা লম্বা ডিভানে বসে আছে রুদ্র। প্রশস্ত বাইশেপস হাতলে ছড়ানো। পাশের ঠাড ছোটো টেবিলে চকচকে মদের বোতল রাখা। কাছেই রাখা তার দামি ফোন। একের পর এক কল আসছে সেখানে। ভাইব্রেটের সাথে সাথে সাদা স্ক্রিন জ্বলছে, নিভছে। রুদ্র স্ক্রিনে চেয়ে চেয়ে চুমুক দিলো গ্লাসে। কল বেজে বেজে কেটে যাওয়া অবধি অপেক্ষা করল। পরপরই কল এলো আবার।

তবে এবার অন্য নাম্বার হতে এসছে।

তুরন্ত, রুদ্রর বীতঃস্পৃহ অভিব্যক্তি উবে যায়। তাকায় সতর্ক চোখে। এন্ড রিসিভ করতেই ওপাশ থেকে কারো হইহই স্বর ভেসে এলো, "মেয়েটিকে পেয়েছি, স্যার।"

রুদ্রর ভ্রুটিযুক্ত কপাল টানটান হয় সহসা। ফুটে উঠল দুধারের দ্বৈত চোয়াল।

"কোথায় থাকে?"

"উত্তরাতেই, স্যার। সব ইনফরমেশন নিয়েছি আমি।"

"বলো।"

"স্যার, মেয়েটার বাড়ি নারায়নগঞ্জে। ঢাকায় এসেছে একমাসও হয়নি। বান্ধবীর সাথে থাকে। কাজ খুঁজছে শুনলাম। বাসার ঠিকানাও জোগাড় করেছি।"

রুদ্র একপেশে হাসল। কণ্ঠে ঝরঝরে আওয়াজ, "দ্যাটস মিন, সি নিডস মানি!”

শক্ত মুঠোয় কাচের গ্লাস চেপে ধরল পরপর। লাইন কেটে মাথা এলিয়ে দিলো ডিভানে। বক্র হাসিতে মেতে ওঠে পুরুষালি নিটোল ওষ্ঠদ্বয়। সৌম্যে এগিয়ে থাকা মানুষটির সেই হাসি, আভাস

CamScanner

দেয় প্রকাণ্ড কোনো ঝড় আসার। তারপরই চট করে সোজা হয়ে বসল রুদ্র। মারবেল মেঝেতে বর্তাল তার হিংস্র দৃষ্টিযুগল।

"কংগ্রাচুলেশনস মিস সেঁজুতি। রুদ্রর পাতা ফাঁদে আপনাকে স্বাগত।"

ভরদুপুরে গভীর ঘুমে থাকা আরিশা হঠাৎ নড়েচড়ে ওঠে। মনে হলো মাথার নিচের বালিশ শুদ্ধ কাঁপছে। অতল নিদ ছুটে গেল অমনি। টের পেল রিংটোনের শব্দ। আরিশা বিরক্ত হয়। চোখ-নাক গুটিয়ে চ-সূচক শব্দ তোলে জিভে। স্ক্রিনে না দেখে রিসিভ করল কোনোরকম।

"হ্যালো।"

"হ্যালো মিস আরিশা, আমি করিম শেখ বলছি।"

ব্যস, ঘুম শেষ মেয়েটার। তড়াক করে উঠে বসে বলল, "জি, স্যার বলুন।"

"আপনি একবার কাল স্টুডিয়োতে আসুন।"

"কেন স্যার, আমার কী কাজটা..."

"জি, আপনাকে স্টেজ শো দেওয়া হবে। আপনি কাল চলে আসুন।"

আরিশার নিজের কানকেই বিশ্বাস হলো না। খুশিতে কিছুক্ষণ স্তব্ধ বনে রইল। এতদিনের পরিশ্রম ফলছে ওর? এতদিনে আল্লাহ মুখ তুলে চেয়েছেন? মেয়েটার চোখ ভিজে ওঠে খুশিতে।

জড়ানো জিভে জানায়, "জি স্যার, আসব।"

লাইন কেটেই তাড়াহুড়ো করে বিছানা থেকে নামল আরিশা। সেঁজুতিকে এক্ষুনি খবরটা দিতে হবে। সে ভেবেছিল মেয়েটা রান্নাঘরে থাকবে। পা বাড়ানোর আগেই হাজির হয় সেঁজুতি। আরিশার ঠোঁটদুটোয় হাসির ফোয়ারা তখন। কিছু বলতে যেয়েও থামল। সেঁজুতির বেশভূষা দেখে কপাল কুঁচকে বলল, "কোথাও যাচ্ছিস?"

ওর মলিন স্বর, "হুঁ। চাকরি খুঁজব।"

"এখন। এই দুপুরবেলা? বাইরে তো অনেক রোদ!"

CamScanner

"সমস্যা নেই। শোন না, আমি দুপুরের রান্না করেই যাচ্ছি। সময় করে খেয়ে নিস।"

"আর তুই, তুই খাবি না?"

"খিদে নেই।"

আরিশা বলল, "খিদে নেই? তুই তো রাত থেকে কিছুই খেলি না। এখন আব.."

পুরোটা শেষ করার সময় সেঁজুতি দিলো না। চলে গেল বিলম্বহীন। আরিশার মন খারাপ হয়। বুক ছিঁড়ে বাইরে আসে দীর্ঘনিঃশ্বাসের শব্দ। বন্ধুর দুঃখে খুইয়ে যায় তার একটু আগের বাধ ভাঙা উচ্ছ্বাস।

বিকেলের শেষ ভাগ। চারপাশে তখন সূর্যের নরম আলোর হুটোপুটি। রোদের তেজ কমছে। রং পালটাচ্ছে আকাশের। পাখিরা যাত্রা করেছে নীড়ে। বুক-চোখ জুড়িয়ে দেওয়া এই সময়টায় রাস্তা দিয়ে নিষ্প্রভ চিত্তে হেঁটে যাচ্ছে সেঁজুতি। ধীরুজ পায়ের বেগ। মৃগনেত্র ছাপিয়ে জল চুইয়ে পড়ছে। গত চার ঘণ্টা হন্যে হয়ে চাকরি খুঁজে বেড়াচ্ছে। অথচ কেউ গেইট মাড়িয়ে ঢুকতে অবধি দেয়নি। কোথাও টিউশনির বিজ্ঞাপন দেখে ছুটে গেলেও, লাভের লাভ হলো না। বেতন মাত্র এক-দেড় হাজার টাকা। এতে কী হবে? এক হাজার টাকায় আজকাল গরম জল পাওয়া যায়? সেখানে একটা মেয়ের সমস্ত খরচ। গতকাল থেকে সেঁজুতি কিচ্ছুটি মুখে তোলেনি। তার ওপর চিন্তায় হাঁসফাঁস করে কাটানো গোটা নির্ঘুম রাত।

না খাওয়া, না ঘুমানো, পেট ব্যথা সবকিছু ছাপিয়ে ছুটে বেড়ানো মেয়েটার দিনশেষে হাতের মুঠো শূন্য বলা যায়!

ঠিক কয়েক মিটার দুরুত্বেই দাঁড়িয়ে আছে একটা চকচকে কালো গাড়ি। যার ভেতরে বসে এক সুদর্শন যুবক। অথচ দর্শনের মতোই ভয়ানক তার তাকানোর ধরন। বন্ধ জানলার স্বচ্ছ কাচ মাড়িয়ে ওই শক্ত দৃষ্টি একভাবে সেঁজুতিকে দেখছে। টানা তিনদিন খুঁজে বেড়ানোর পর শেষমেশে হদিস মিলেছে মেয়েটির। তবে আজকের এই দেখা অনাকাঙ্ক্ষিত। রুদ্র এই রাস্তা দিয়েই যাচ্ছিল। হঠাৎ চোখে পড়ল সেঁজুতি। সে গাড়ি থামায় সচেতন দূরুত্বে। ক্রোধে দপদপে আঁখিদ্বয় হিংস্র হয়ে চেয়ে রয় তারপর।

সেঁজুতি ক্লান্ত, বিপন্ন! ক্রমে নেতিয়ে আসছে আরো। আর এক পা এগোনোর শক্তিটুকুও নেই। খালি পেট মুচড়ে উঠছে ব্যথায়। খিদের জ্বালায় নাড়িভুঁড়ি সুদ্ধ পাক খাচ্ছে। আস্ত পৃথিবী দোদুল্যমান। অচিরাৎ দাঁড়িয়ে গেল মেয়েটা। মাথা চক্কর কাটছে। চোখের সামনে ক্রমশ নেমে আসছে অন্ধকার। সেঁজুতি শুষ্ক ঠোঁট জিভে ভেজাল। চোখ বুজে শ্বাস টেনে পা বাড়াল ফের।

CamScanner

বিধিবাম। বিশীর্ণ দেহ সমেত নিজেই লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। রুদ্র এদিকেই চেয়েছিল, চমকে উঠল অমনি। আশপাশ হতে লোকজন ছুটে ছুটে যাচ্ছে।

জটলার মধ্যে সেঁজুতি হারিয়ে যায়। অচেতন শরীরটাকে ভিড়ভাট্টায় আর খুঁজে পাওয়া গেল না।

রুদ্রর কিছু যায় এলো এতে? সে পুরুষ এসব গায়েই মাখেনি। সেঁজুতি মরল কি বাঁচল তাতে ওর কী? এই মেয়েটা ওর প্রথম নারী শত্রু। না, শত্রু কেন হবে? রুদ্র রওশন চৌধুরীর সাথে শত্রুতা করতে হলেও একটা নূন্যতম যোগ্যতা থাকা উচিত। এই মেয়ে তো তার নখের যোগ্যও নয়।

রুদ্র ভ্রুক্ষেপহীন। দূরের রাস্তায় নিথরের ন্যায় পড়ে থাকা মেয়েটিকে নিয়ে কোনো চিন্তাই হলো না। নিরুদ্বেগ ভঙ্গিতে গাড়ির ইঞ্জিন চালু করতে গেল। থামল হঠাৎ। কী ভেবে ফিরে চাইল আবার। সেঁজুতি তার দুচোখের বিষ হলেও, এমন ভরা রাস্তায় একা পড়ে আছে মেয়েটা। মুখ দেখে তো মনে হচ্ছিল অসুস্থ। এভাবে সব জেনেবুঝেও চলে যাওয়া কি ঠিক হবে?

রুদ্রর রক্তপ্রবাহেও অহমিকা মিশে। মেজাজ তার চুলের ডগায়। কিন্তু অবিবেচক!তা তো নয়। ছেলেটার মানবিকতার দরজায় টোকা পড়ে। ভেতর থেকে কেউ একজন বলে দেয়, "তোমার ওকে সাহায্য করা উচিত, রুদ্র। তা না করে তুমি এইভাবে চলে যাচ্ছ?"

ও বিরোধাভাস করল, "কেন সাহায্য করব? ওই মেয়ে তো আমার কেউ না।"

অদেখা সত্তাটা বোঝাল, "কেউ না হলেও সে মানুষ, তুমিও মানুষ। মানুষ কি মানুষের পাশে দাঁড়ায় না?"

নাছোড়বান্দা বিবেকের কাছে হার মানল রুদ্র। তীব্র অনীহা নিয়ে নেমে গেল গাড়ি থেকে। ভিড় ঠেলে সামনে আসতেই দেখল অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে আছে সেঁজুতি। কী মলিন মুখখানা। অফিসের দুটোদিন যতটাই পরিপাটি দেখেছিল এখন ততোধিক এলোমেলো। একজন প্রৌঢ়া নারী সেঁজুতির মাথাটাকে কোলে নিয়ে বসেছেন। চোখেমুখে জল ছেটালেও জ্ঞান ফেরার খবর নেই। ব্যাপারটায় হই-হট্টগোল বেঁধেছে এখানে। একেকজন কানাঘুষা, আলোচনার ঝুড়ি মেলে বসলেও সাহায্যের হাত বাড়ানোর নাম নেই।

রুদ্র খ্যাঁক করে বলল, "আশ্চর্য তো। একটা মেয়ে এভাবে রাস্তার মধ্যে পড়ে আছে আর আপনারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছেন? এতক্ষণে তো হাসপাতালেও নেওয়া যেত।"

কারো কোনো উত্তর এলো না। কিছুটা মিইয়ে গেল তবে। রুদ্র অপেক্ষাও করে না জবাবের। এক হাঁটুভেঙে সেঁজুতির পাশে বসল সে।

CamScanner

প্রৌড়ার হাত থেকে বোতল নিয়ে নিজে পানি ছেটাল মুখে। কিন্তু লাভ কিছু হয়নি। সেঁজুতির নেত্রপল্লব তিরতির করলেও শরীরের নড়চড় শূন্য।

ভদ্রমহিলা বললেন, "মেয়েটা মনে হয় অনেক বেশিই অসুস্থ। ডাক্তারের কাছে নেওয়া উচিত। এভাবে রাস্তায় কতক্ষণ পড়ে থাকবে?"

রুদ্র ফোন বের করল অ্যাম্বুলেন্সে কল দিতে। থামল পরপর। সামান্য জ্ঞান হারানো তো হাসপাতালে নেওয়ার মতো সিরিয়াস কিছু নয়। শ্বাস নিচ্ছে, চোখের পাতা কাঁপছে। কিন্তু ঝগড়ারবেলায় যে মেয়ে একশ, তার হঠাৎ এমন দুর্দশা কেন?

সে নিষ্পোষ্ঠ কামড়ে চিন্তায় ডুবে গেল। কী করবে এখন? ওকে বাসায় পৌঁছে দেবে?

ভদ্রমহিলা বারবার সেঁজুতির গায়ের ওড়না ঠিকঠাক করছেন। চারপাশে পুরুষে ভরা। শকুনের নজর কি আর থেমে থাকে? রুদ্রর ঈগল নেত্রে বিষয়টা ধরা পড়ল। খারাপ লাগল কিছুটা। হোক তার চক্ষুশূল, কিন্তু মেয়ে তো। একটা মেয়ের এভাবে সম্মানহানী যে চোখে লাগার মতোই।

রুদ্র আর কিছু ভাবল না। রাগ-ক্ষোভ সরিয়ে নিজেকে বোঝাল, "বিপদে পড়েছে তাই সাহায্য করছি। দ্যাটস ইট!"

তারপর উঠেই সেঁজুতির নরম শরীরটাকে তুলে নিল দুহাতে। সোজাসুজি গাড়ির দিকে এগোলো। সেঁজুতির পড়ে থাকা ব্যাগ সমেত। ভদ্রমহিলাও পেছনে ছুটতে ছুটতে এলেন। ব্যস্ত হাতে গাড়ির দরজা খুলে দিলেন নিজেই। রুদ্র সেঁজুতিকে ভেতরে শোয়াতেই প্রশ্ন করলেন, "কোন হাসপাতালে নেবে?"

সে হাস্যহীন বলল, "হাসপাতালে নিতে হবে না। বাড়িতে দিয়ে আসব। তারপর বাড়ির লোকেরাই যা ইচ্ছে করবে।"

"বাড়িতে? তুমি চেনো মেয়েটিকে?

রুদ্রর ধাতে এত কৈফিয়ত দেওয়া নেই। তাও বলল, "হু।"

এতক্ষণে নিশ্চিন্তের শ্বাস নিলেন নারীটি। বললেন, "যাক তবে তো হলোই। আমি আসলে মেয়েটাকে চিনি না। কিন্তু মুখটাতে এত মায়া। নিজের মেয়ের কথা মনে পড়ে গেল। তাই এত কথা বললাম তোমায়!"

CamScanner

রুদ্রর কানে কিছু ঢুকল না। নিবেশন পড়ে রইল মাঝের একটি লাইনে। মুখে এত মায়া। সে বিরক্ত হয়ে ভাবে, "মায়া? রেডিকিউলাস!"

ভদ্রমহিলা ব্যাগ বুঝিয়ে দিয়ে চলে গেলেন। রুদ্র উঠে বসল গাড়িতে। ভিউ মিরর দিয়ে একবার নজর বুলিয়ে আনল সেঁজুতির ওপর। যেই মেয়ে একদিন তার গাড়ির কাচ ভেঙেছিল, আজ তাকেই ওঠাতে হলো গাড়িতে? ভাগ্যের অত্যাচার কাকে বলে। সে চ সূচক শব্দ করে। এসব উটকো ঝামেলাকে ওর ঘাড়েই পড়তে হবে কেন?

আরিশার মন-মেজাজ ভালো নয়। নিজের এতদিনের স্বপ্ন পূরণের ব্যাপারটা একটু ইচ্ছেভরে উপভোগ করতেও পারছে না। ক্রমাগত পায়চারি করছে ঘরে। মাঝেমাঝে ব্যগ্র নয়ন তুলে চাইছে দেওয়ালঘড়ির দিক। সেঁজুতি সেই দুপুরে বের হলো, এখন সন্ধ্যে। কোথায় গেছে, কী করছে কিন্তু জানে না। মেয়েটা যে শহরে একেবারেই নতুন। কিছু চেনে ভালো করে?

ওকে সাথে নিলে কী হতো। দুটো কথা বলার অবধি সময় দিলো না।

সামনে থেকে উড়ে গেল যেন। অস্থিরতায় আরিশা নিজেও খায়নি। একটা খোঁজ যে নেবে, সেঁজুতির কাছে তো ফোনও নেই। এখন যদি কোনো বিপদ হয়, ও ক্ষমা করতে পারবে নিজেকে?

তার ভাবনার মধ্যেই ডোরবেল বাজল।

সেঁজুতি এসেছে ভেবে আরিশা ছুটে গেল দরজায়। লক টেনে খুলতেই, ওপাশের দৃশ্যটায় আকাশ থেকে থুবড়ে পড়ল মাটিতে। ঠোঁট ফুঁড়ে বেরিয়ে এলো, "রুদ্র রওশন চৌধুরী!"

পরপর নিস্তব্ধ হলো সেঁজুতিকে দেখে। রুদ্র কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ওকে। এ বড়ো আজব, আশাতীত দৃশ্য। এমন দৃশ্য কেউ কল্পনায় আনারও সাহস করবে কখনও?

বিস্ময়ে বাকরুদ্ধ আরিশার কণ্ঠে কোনো কথা নেই। শুধু ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে আছে। রুদ্র বিরক্ত হলো। নিজেই শুধাল, "ভেতরে আসতে পারি?"

সম্বিৎ ফিরল মেয়েটার। হুঁশে এলো সেঁজুতির কথা। অমনি উদ্বিগ্ন হয়ে বলল, "কী হয়েছে ওর?"

রুদ্র সাগ্রহে প্রশ্ন এড়িয়ে পালটা জিজ্ঞেস করল, "বেডরুম কোন দিকে?"

CamScanner

ব্যাচেলর মেয়েদের ফ্ল্যাটে একজন তাগড়া যুবক এসেছে। তার ওপর কোলে একটা মেয়ে। সিনেম্যাটিক মুহূর্তে সাক্ষী হতে পাশের রুম থেকেও উকি দেয় অন্য মেয়েগুলো। আরিশার ওসব নিয়ে ভাবার সময় নেই।

“আসুন আমার সাথে।"

সে ত্রস্ত শোবারঘরের দিকে যায়। রুদ্র সেঁজুতিকে নিয়ে পিছু নিল। ওকে শোয়াল বিছানায়। সোজা হয়ে দাঁড়ানো মাত্রই আরিশার ছটফটে প্রশ্ন তেড়ে আসে, “ওর কী হয়েছে? এই অবস্থা কেন? আর আপনি ওকে পেলেন
কোথায়?"
রুদ্রর থমথমে জবাব, "সেটা উনি উঠলেই জিজ্ঞেস করে নেবেন।"

ব্যস, আর একটাও কথা বলেনি সে। সৌজন্যতায় বিদায় অবধি নেয়নি। হনহন করে বেরিয়ে গেছে বাইরে।

আরিশা নাক-চোখ কুঁচকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। এই লোকের এত ভাবের আমদানি হয় কোত্থেকে?

সেঁজুতির জ্ঞান ফিরল আরো এক ঘন্টা পর। ঘুমের মধ্যেই গুঙিয়ে উঠল দুবার। সহসা ধড়ফড় করে পাশে বসল আরিশা। গায়ে হাত দিতেই তালুর চামড়া পুড়ে যায়। এই রে, এত জ্বর! বলেছিলাম এই রোদের মধ্যে যাস না। আমার কথা শুনলে তো! আরিশা তড়িঘড়ি করে উঠতে চাইল জলপট্টি দেওয়ার জন্য। আচমকা হাতটা টেনে ধরল সেঁজুতি। ও ফিরে চায়। সেঁজুতি চোখ মেলেছে দেখে আবার বসে পড়ে পাশে। মাথায় হাত বুলিয়ে বলে, "শরীর খারাপ লাগছে?"

সেঁজুতির ভাঙা স্বর, "মাথা ঘুরছে খুব!"

"কেন গেলি এই অবস্থায়? সারাক্ষণ শুধু টাকার চিন্তা করলে হবে? নিজের কথা ভাবতে হবে না?"

সেঁজুতি নিরুত্তর। পানসে মুখে চুপটি করে থাকে। হঠাৎই চোখ বড়ো বড়ো করে দেখল চারপাশ। অবাক হয়ে বলল, "আমি বাসায় কী করে এলাম? আমি তো রাস্তা দিয়ে হাঁটছিলাম। এখানে কে দিয়ে গেল?"

আরিশা ফোঁস করে শ্বাস ফেলে জানাল, "ভাবের জমিদার দিয়ে গেছে।"

CamScanner

ও বুঝতে না পেরে বলল, "সেটা আবার কে?"

"কে? কে সে তো আমার চেয়েও তুই ভালো জানিস। যাক-গে, একটু কষ্ট করে উঠে বস। আমি খাবার নিয়ে আসছি।"

"কিন্তু..."

আরিশা কোনো কথাই শুনল না। ঠিক করে কিছু বললও না। চলে গেল। সেঁজুতি ঠোঁট ফোলায়। দুশ্চিন্তায় ভুগে ভাবে, "ভাবের জমিদার কে? কেই-বা দিয়ে গেল আমায়?"

১৩.

সকাল সকাল স্টুডিয়োয়ের জন্যে রওনা করেছে আরিশা। মেয়েটার শরীর কাঁপছে উত্তেজনায়। নার্ভাসনেসে গলা শুকিয়ে আসছে। স্বপ্ন ফলার প্রফুল্ল চিত্তকে জোর করে মনের মাঝে বেঁধে রাখল তাও। রিকশা ভাড়া মিটিয়ে যখনই পিছু ঘুরল, করিম শেখ ছুটে এলেন তখন। আরিশা ভাবল, উনি কোনো কাজে এসেছেন হয়তো। শশব্যস্ত বিনয়ী কণ্ঠে সালাম দিলো। ভদ্রলোক যেন ওর অপেক্ষাতেই ছিলেন। নিমিষে হইহই করে বললেন, "আসুন আসুন। আপনার জন্যেই দাঁড়িয়ে ছিলাম।"

আরিশা হোঁচট খায়। কণ্ঠে অবিশ্বাস নিয়ে বলে, "আমার, আমার জন্য?"

"জি। প্লিজ আসুন।"

আন্তরিকতা যেন উপচে পড়ছে কথাতে। নিজের আগে হাত লম্বা করে পথ দেখালেন করিম। আরিশার সব স্বপ্ন স্বপ্ন ঠেকল। এত বড়ো চ্যানেলের মালিক, হঠাৎ ওর মতো এমন সাধারণ একটা মেয়েকে এত তোষামোদ করছে?

বিভ্রমে হাবুডুবু খেতে খেতে কোনোরকম ভেতরে ঢুকল আরিশা। করিম ওকে একদম নিজের চেম্বারে নিয়ে এলেন। টেবিলের ওই পাড়ের চেয়ার দুটোর একটাতে আরো একজন বসে। আরিশার ভীষণ পরিচিত মুখ! কফি খাচ্ছিল সে। ফিরে চাইতেই মেয়েটা থেমে দাঁড়াল স্থানে। বিস্মিত হয়ে বলল, "আপনি?"

অভ্রর আর্ত চাউনি লুকিয়ে রইল তার স্বচ্ছ হাসির ভাঁজে। উফ! কতগুলো দিন পর আবার সেই মুখখানার দেখা। বুকের মধ্যে কী দারুণ শীতলতা এখন। যেন এর চেয়ে স্বস্তির, শান্তির আর কিচ্ছুটি নেই। সে কফি মগ নামিয়ে রেখে উঠে দাঁড়ায়। হেসে কিছু বলবে এর আগেই ফট করে বলে বসলেন করিম, "হ্যাঁ, অভ্র আহমেদ। চেনেন না? আপনাকে যেখানে রেকমেন্ড করলাম, সেই

CamScanner

চৌধুরী গ্রুপের জুনিয়র এমডি উনি। উনিই তো আপনার আজকের পুরো শোটাকে স্পনসার করছেন।”

আরিশা চমকে উঠল সহসা। তেমনই থমকে বলল, "কী!"

ওর কী বলার ধরনে অভ্র ঘাবড়ে যায়। এই রে, এই ভয়টাই পাচ্ছিল। করিম সাহেবও না। কথাটা এমন গড়গড় করে এক্ষুনি বলতে হলো?

আরিশা নাক ফুলিয়ে তাকাতেই অভ্র নিভে যায়। ও রেগেমেগে বলদ "আপনি আমার শো স্পনসর করছেন? কী শুনছি এসব?"

ছেলেটা গলা খাঁকারি দিলো। করিমের দিক চেয়ে বলল, "আপনি যান করিম সাহেব, শো শুরু করার ব্যবস্থা করুন।"

মাথা নাড়লেন।"জি।"

উনি বেরিয়ে যেতেই চেয়ারে ধপ করে বসে পড়ল আরিশা। শুরু করে কেঁদে ফেলল হঠাৎ। প্রলাপ করল বোজা স্বরে, "আমি কত বোকা! কল পেয়ে ভাবলাম আমার গান পছন্দ হয়েছে ওনাদের। অথচ ঘুণাক্ষরেও বুজিনি এর পেছনে আসলে বড়ো কারো হাত থাকতে হয়। ব্যাক সাপোর্ট' না থাকলে টিভিতে কি আর আসা যায়? আমার মতো যোগ্যতাহীন মানুষের সাধ্যই-বা কী যে টিভিতে আসব?"

মেয়েটার আচমকা কান্নায় অভ্র ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছিল। বিচলিত হয়ে পড়ল এবার। পাশের চেয়ারটায় বসতেই আরিশা মুখ ঘুরিয়ে নেয়। কণ্ঠে তেজের জোয়ার, "আপনি এসব করে আমাকে অপমান করলেন, স্যার আমি এমন কোনো কিছু কখনো আশা করিনি। যে শো পাওয়ার জন্যে এত ব্যকুল ছিলাম, সেটা পায়ে হেঁটে আমার কাছে এলো তাও কারো সুপারিশ আর টাকার জোরে। ছিঃছিঃ"

পরপরই চোখ মুছে শক্ত করল মুখ। ঘোষণা দিলো দৃঢ় চিত্তে, "এই শো আমি করব না। কারো টাকার জোরে আমার শো পাওয়ার কোনো দরকার নেই।"

আরিশা উঠতে নিলেই আবার টেনে বসিয়ে দিলো অভ্র। কী নিঃসংকোচ স্পর্শ তার। যেন কত অধিকার ওর ওপর। আরিশা অবাক হলো। অভ্র সেই বিস্ময় আমোলে নেয় না। উলটে কপালে ভাঁজ ফেলে বলল, "সেই তখন থেকে একা একাই বকবক করে গেলেন, আমার কথাটা তো শুনতে হবে একবার। তাই না?"

CamScanner

আরিশা চটে বলল, "কী শুনব? আপনি এসব করে কী প্রমাণ করতে চাইলেন সেটা শোনাবেন? হ্যাঁ জানি তো। ওইদিন আমার বন্ধু আপনার বড়ো ভাইকে মুখের ওপর জবাব দিয়ে আসায় আপনি আমার পেছনে লেগেছেন আমাকে চোখে আঙুল দিয়ে বোঝাতে চাইলেন যে মিস আরিশা আপনি ফালতু শিল্পী হবেন। আপনার আসলে কোনও প্রতিভাই নেই। এই যে শো পেলেন এটা কিন্তু আমার জন্যেই।”

অভ্র দুই ঠোঁট ফুলিয়ে শ্বাস ফেলল। কপাল চাপড়ে বলল, "হে আল্লাহ, আমি এই মেয়েকে কীভাবে বোঝাব? ভালো মানুষগুলোর সাথে সবসময় এমন কেন হয় বলো তো।"

আরিশা একটু দমল এবার। বলল বাঁকা ভাবে, "ঠিক আছে, ঠিক আছে। অত কপাল চাপড়াতে হবে না। বলুন কী বলবেন?"

অভ্র স্বস্তি পায়। মৃদু হেসে বলে, "ধন্যবাদ। শুনুন মিস, শো আপনাকে আমি টাকার জোরে পাইয়ে দিচ্ছি এটা সত্যি। কিন্তু দর্শক প্রিয়তা? সেটা কিন্তু আপনি আপনার প্রতিভার জোরেই পাবেন। সেখানে আমার কেন, দুনিয়ার কারোর হাত থাকবে না। আপনি শো পেলেন আমার জন্যে মেনে নিলাম। কিন্তু গান তো নিজের মতো গাইবেন। মানুষ সেই গান শুনেই আপনাকে ভালোবাসবে। দশজনের মধ্যে একজন করে চিনবে। এসব কী আমার টাকার জোর খাটবে? না কি ওরা তখন খুঁজতে আসবে এই শিল্পী কার সাহায্যে শো করেছে দেখি গিয়ে, হুঁ?" অভ্র ভ্রু উচাল।

আরিশা বলতে গেল, "কিন্তু তাই ব.."

সে কথা টেনে নেয়, "উঁহু,আপনি আর কোনো আপত্তি করবেন না প্লিজ। আচ্ছা বেশ, টাকা নিয়ে সমস্যা হচ্ছে তো? এর সমাধানও আমি দিয়ে দিচ্ছি। যখন আপনি খুব জনপ্রিয় হয়ে যাবেন? দেশ-বিদেশে আপনার নাম ছড়িয়ে পড়বে। অনেক টাকা হবে? তখন না হয় শোধ করে দেবেন। ব্যস! মিটে গেল। দেখবেন, তখন আবার জনপ্রিয়তা পেয়ে এই অধমকে ভুলে যাবেন না যেন।"

আরিশা সুচাল চোখে চাইল। অভ্র অনুনয় করল কাতর স্বরে, "প্লিজ।"

সাথে দু-আঙুল ঠোঁটের কাছে টেনে বোঝাল হাসতে। আরিশা সত্যিই হেসে ফেলল এবার। বুক ভরে শ্বাস নিলো অভ্র। মনে মনে ভাবল, "এই হাসির জন্য এরকম শো কেন আরিশা, একটা গোটা রণক্ষেত্রে স্বেচ্ছায় আমি যুদ্ধে নেমে যাব।"

CamScanner

শো শেষ। শ্যুটিং মিলিয়ে তিন ঘন্টার মতো সময় লেগেছে। আজকে নিজের সবটুকু দিয়ে গান গেয়েছে আরিশা। এখন শুধু প্রোগ্রাম টেলিকাস্ট হওয়া বাকি। আল্লাহ জানে, মানুষ কীভাবে নেবে!

আরিশা বাইরে এসে সবার আগে অভ্রকে খুঁজল। কোথাও পায়নি। শেষে রিসিপশানে জিজ্ঞেস করতেই বলল, "উনি চলে গিয়েছেন।"

ব্যস! এতক্ষণের উচ্ছ্বাস ঝুপ করে নেতিয়ে গেল মেয়েটার। সেদিনের সেই শেষ না হওয়া কফি আর একটা ধন্যবাদ যে মানুষটার পাওনা থেকে আরিশা যখন ঠায় দাঁড়িয়ে, করিম সাহেব পেছনে এসে দাঁড়ালেন।

মুখের কাছে হাত নিয়ে কাশতেই চকিতে ঘুরে চাইল ও। করিম নিজেই কথা শুরু করলেন, "আপনি কিন্তু আজকে চমৎকার গেয়েছেন। এই গান সবার পছন্দ হবেই হবে।"

আরিশা নিশ্চিন্ত মনে মুক্তার ন্যায় হাসে।

ভদ্রলোক ফের বললেন, "মিস আরিশা, আসলে আমার আপনার সঙ্গে একটু দরকার ছিল বুঝলেন। সেজন্যেই এই সময় স্টুডিয়ো ফেলে এখানে এসেছি।'

"হ্যাঁ স্যার, বলুন না।"

করিমের কথায় কোনো ভণিতা নেই। সরাসরিই বললেন, "ব্যাপারটা হয়েছে কী, আমার খুব কাছের একজন, তার অফিসের পিএ পোস্ট-এর জন্য একটা মেয়ে চেয়েছেন। উম, ফ্যাশন ডিজাইনিং নিয়ে পড়ছে এমন কাউকে আর কী! আসলে এত ব্যস্ত মানুষ না! এই মুহূর্তে বিজ্ঞাপন দিয়ে লোক বাছাবাছি করার সময় ওনার নেই। তাই আমাকেই বললেন কাউকে রেকমেন্ড করতে। কী বলব বলুন! আমার কাঁধে কেন যেন সবসময় এই রেফারেন্সের দায়িত্বই পড়ে। তা আপনার চেনা-জানা এমন কেউ আছে?"

আরিশা দুপাশে মাথা নাড়তে গিয়েও থমকাল। ফিরে চাইল চটক কাটার ন্যায়। সতর্ক কন্ঠে বলল, "ফ্যাশন ডিজাইনিং নিয়ে পড়া মেয়ে লাগবে, স্যার? জি, আছে একজন। আমার বন্ধু। ভীষণ কাজের মেয়ে!"

করিম হৃষ্ট চিত্তে বললেন, "বাহ! এ তো মেঘ না চাইতেই বৃষ্টি। তাহলে তো ভালোই। আপনি বরং গিয়ে ওনাকে জানিয়ে দিন। সিভি তৈরি করতে। বলুন। বাকিটা আমি দেখে নিচ্ছি। আপনার বন্ধু তো, ধরে নিন চাকরি পাকা।"

CamScanner

আরিশা কৃতজ্ঞতায় পারল না লুটিয়ে পড়তে। খুশিতে আপ্লুত হয়ে বলল, “থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ সো মাচ!"

সেঁজুতি হাঁ করে চেয়ে থাকে। অবিশ্বাসের তোপে ঝাঁঝিয়ে আসে কান। স্তরের ন্যায় দাঁড়িয়ে থাকা দেখে দুপাশে মাথা নেড়ে হাসল আরিশা। কাঁধ ধরে ঝাঁকিয়ে বলল, "ওরে সেঁজুতি, এসব স্বপ্ন নয়, সত্যি। তোর চাকরি হরে গেছে।”

মেয়েটা তখনও জড়ের মতো চেয়ে। নেত্রপল্লবের পতন অবধি নেই। শুধু ঠোঁট নেড়ে বলল, "আমার চাকরি হয়ে গেছে? এত বড়ো একটা সুযোগ পাব আমি?"

"হ্যাঁ রে বাবা, হ্যাঁ। দিনরাত যেভাবে কান্নাকাটি করে চেয়েছিস। আল্লাহ মুখ ফেরাতে পারেন? যাক বাবা। শান্তি। তোর কাজটা হয়ে গেলে আমি একটু আরামে ঘুমাতে পারব। আমি নিজেই এত চিন্তায় ছিলাম।"

আরিশা কথা বলতে বলতে খেয়াল করল সেঁজুতির শক্ত বনে থাকা। কন্ঠ উঁচু করে বলল, "এবার কিন্তু গায়ে পানি ঢেলে দেবো। এত অবাক হওয়ার কী আছে? মানুষ যে কোনও কাজের সুযোগ এমনভাবেই পায়।"

সেঁজুতি আত্মস্থ হলো। তবে ভীষণ চিন্তা নিয়ে বলল, "কিন্তু তাই বলে পায়ে হেঁটে চাকরি এলো? তাও অত বড়ো পোস্টে? কোম্পানির নামই তো জানি না। তোকে কিছু বলেছে?"

"না। বললেন পরে মেইল করে দেবেন। আচ্ছা বাদ দে না। অমন নাম করা চ্যানেলের মালিক কি ফ্রড হবে বল? চাকরি যে তোর পাকা তাতে কোনো সন্দেহ নেই।"

সেঁজুতির সুন্দর চোখদুটিতেও আশার আলো জ্বলে উঠল। বিড়বিড় করে বলল, "তাই যেন হয়!"

চারদিনের মাথায় বাড়ির চৌকাঠে এসে দাঁড়িয়েছে রুদ্র। তখন প্রায় মধ্যরাত। কলিংবেলের এক শব্দেই ঘরের সকলে ছুটে এলো নিচে।

দরজা খুললেন রেহান। এই তো, যা আন্দাজ করেছেন তাই। গুণধর ছেলে বাড়ি ফেরার নাম নিয়েছে।

CamScanner

রুদ্র চুপচাপ ভেতরে ঢোকে। বাঁ-কাঁধের ওপর কোর্ট ঝুলছে। দুটো বোতাম খোলা শার্ট হতে বেরিয়ে এসেছে বুক। পাশ কাটাতে গেলেই প্রশ্ন ছুড়লেন তিনি, "কোথায় ছিলে?"

"উত্তরার ফ্ল্যাটে।" রুদ্রর সংক্ষিপ্ত জবাব।

"সেটা বলতে পারতে না? অন্তত একবার কারো কল রিসিভ করতে পারতে। আমরা কত চিন্তায় ছিলাম জানো?"

রুদ্র বলল, "আমি তো বাচ্চা ছেলে নই, ড্যাড। অহেতুক চিন্তা কেন হবে?"

রেহানা বললেন, "তবুও রুদ্র, একবার জানিয়ে রাখলে ভালো হতো।"

ও সোজা হেঁটে এসে সোফায় বসল। কোটটা ফেলে রাখল পাশে। কথা তুলল ভিন্ন প্রসঙ্গে, "তোমাদের সাথে আমার কিছু কথা ছিল, ড্যাড।"

বলতে বলতে এসি বাড়িয়ে দেয়। গরম লাগছে বুঝতে পেরে রেহানা নিজ উদ্যোগে পানি আনতে গেলেন।

রেহান শুধালেন, "কী বলবে?"

"কাল থেকে বসুন্ধরার অফিসে আমি থাকব না।"

উনি অবাক হয়ে বললেন, "থাকবে না। কেন?"

"উত্তরায় থাকব।"

ভদ্রলোক একপল অভ্রর দিক চাইলেন। তার চোখেও সমান বিভ্রান্তি। তবে উশখুশে চিত্ত মেটাতে প্রশ্ন করতে পারল না। রুদ্র বড়ো ভাই। মুখের ওপর ছোটোদের প্রশ্ন সে একদম পছন্দ করে না।

রেহান উদ্‌দ্বেগ নিয়ে বললেন, "হঠাৎ এই কথা কেন? তুমি তো বলেছিলে উত্তরায় ভালো লাগে না।"

"এখন লাগছে।" রুদ্রর দায়সারা জবাব।

CamScanner

এর মাঝে পানি নিয়ে ফেরত এলেন রেহানা। এগিয়ে দিতেই রুদ্র হাত দিয়ে ঠেলে দেয়। মুখের ওপর বলে, "লাগবে না।"

ভদ্রমহিলা আহত হলেন কিছু। ভালোবেসে আনলেন, আর ছেলেটা হাত দিয়ে কীভাবে ঠেলে দিলো।

মাঝেমধ্যে মনে হয়, রুদ্রর ওনার প্রতি অশেষ রাগ। শুধু সম্পর্কের দোলাচলে দেখাতে পারে না। এই যে মুখ কালো করলেন, একবার ফিরেও তাকায়নি।

রেহান কিছুক্ষণ ঠান্ডা চোখে দেখলেন ছেলেকে।

রুদ্র উঠে দাঁড়াল। বলল, "এখানকার অফিসে তো তোমরা আছ। আমার মনে হয় না, সমস্যা হবে। এখন থেকে আমি উত্তরার ফ্ল্যাটেই থাকব। বাড়ি ফিরব এই অপেক্ষায় আর কেউ বসে থেকো না।"

"তুমি কি আমার অনুমতি চাইলে, না নিজের সিদ্ধান্ত জানালে?"

রুদ্রর অকপট জবাব, "সিদ্ধান্ত জানালাম।"

এরপর আর বলার কিছু নেই। রুদ্র রওনা করল ঘরে। রেহান হতাশ ভঙ্গিতে শ্বাস ফেললেন। বোন, অভ্র সবাইকে দেখে বললেন, "ঘুমোতে যাও। ওকে নিয়ে ভেবে লাভ নেই। যা বলেছে তাই করবে।"

"চৌধুরী ইন্ড্রাস্ট্রিজ"

শোধিত অফিসের ওপর এই নামের বড়ো নেমপ্লেট ঝুলছে। বিশালাকার গেইট মাড়িয়ে মাত্রই বের হলো সেঁজুতি। বুকের সাথে শক্ত করে

সিভির ফাইল চেপে রাখা। ইন্টারভিউ দিয়েছে কেবল। এমন বিরাট অফিস, অথচ ইন্টারভিউ নিয়েছে মাত্র একজন। তার ওপর কয়েকটা বাচ্চাদের প্রশ্ন ধরে ছেড়ে দিয়েছে। এরকম একটা পোস্টের জন্যে এমন দায়সারা ইন্টারভিউ আবার হয় নাকি? এর জন্যে তো রীতিমতো কাড়াকাড়ি লেগে যায়। সেখানে ও কোনও অ্যাপ্লাই ছাড়া কী করে পেয়ে গেল? শুধু করিম সাহেবের সুপারিশেই কি এসব হচ্ছে? না কি ভেতরে অন্য গল্প লুকিয়ে?

CamScanner

সেঁজুতির মাথায় কিছু ঢুকল না। কোনো কিছু বিশ্বাসেও কূলোয় না। হাঁটা থেকে দাঁড়িয়ে চট করে চিমটি কাটল হাতে। নিজেই লাফিয়ে উঠল ব্যথায়। হাত ডলতে ডলতে ভাবল, "ব্যথা লেগেছে যখন, এর মানে সব সত্যি?"

কিন্তু এমন আজগুবি কাণ্ড ও আগে কখনও দেখেনি। চাকরি কনফার্ম তো হলোই সাথে চুক্তিপত্রেও সই নেওয়া শেষ।

যদিও পুরো চুক্তিনামা ভালো করে দেখে সই করেছে ও। গণ্ডগোলের কোনও চান্স নেই। সন্দেহজনক কিছু ছিলও না। তবে তিন বছরের আগে চাকরি ছাড়লে জরিমানা দিতে হবে। সেঁজুতির তখন হাসি পেয়েছিল। ওনারা তো আর জানে না। এত সাধের চাকরি! সে এমনিই ছাড়বে না। এমন বেহাল জীবদ্দশায় এই চাকরিটা যে একমাত্র আশীর্বাদ। কিন্তু তাও, মনের মধ্যে খচখচে ভাব থেকেই যাচ্ছে। কেন যেন মনে হচ্ছে কিচ্ছু ঠিক নেই। সেঁজুতি রিকশা ডাকল। উঠতে গিয়ে আরেকবার ফিরে চাইল উঁচু ভবনের দিকে। ছোট্ট শ্বাস ফেলে ভাবল, "কপালে কী আছে, কে জানে!"

এদিকে সিসি টিভি থেকে চোখ সরাল রুদ্র। প্রশস্ত পিঠ এলিয়ে দিলো চেয়ারে। ওষ্ঠপুটে তার তীর্যক হাসির বাণ। অথচ দাঁত চিবিয়ে বলল, "আপনার জীবনে রুদ্র নামক দুর্ভোগ আসছে সেঁজুতি। তৈরি থাকবেন কিন্তু!"

১৪.

সবকিছু ভালোই চলছিল। কিন্তু সেঁজুতির অফিসের প্রথম দিন, মেঘ আর আকাশ মিলে লিপ্ত হলো কোনো অদ্ভুত ষড়যন্ত্রে। সমস্ত পরিকল্পনায় গন্ডগোল বাঁধিয়ে ঝপাৎ করে ফেলে দিলো বৃষ্টি। মেজাজ এত খারাপ হলো সেঁজুতির। এই হলো আষাঢ়ে বর্ষার খামখেয়ালি চরিত্র। কথা নেই, বার্তা নেই হুটহাট ডাকাডাকি। এখন অফিসে যাবে কী করে?

মেয়েটা সেই থেকে গালে হাত দিয়ে বসে আছে বারান্দায়। আজ অফিসের প্রথম দিন, ওর যে তাড়াতাড়ি যাওয়া উচিত। অথচ এ কী সর্বনাশা কাণ্ড! এত বৃষ্টিতে রাস্তাঘাট দেখা যায় না। সেখানে আবার অফিস!

মুষলধারার সেই আক্রমণ থেমে গেল এক ঘন্টার মাথায়। সেঁজুতি যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেয়েছে। চটপট তৈরি হয়ে ঝটপট রওনা করল সে পথে। শেষ রক্ষে হলো। ঘড়ির কাঁটায় যখন দশটা, সেই সময় অফিসের গেইট ছুঁলো মেয়েটা। দারোয়ান বাধা দিলেন না। কাল মেয়েটি ইন্টারভিউ দিতে এসেছিল, মুখ চিনে গিয়েছেন। তবে সতর্ক করলেন আগ বাড়িয়ে, "আইডিকার্ড পরে নিন, ম্যাডাম। স্যার দেখলে কিন্তু ভীষণ রাগ করবেন।"

CamScanner

সেঁজুতি মাথা নাড়ে। দ্রুত ব্যাগ হতে কার্ড নিয়ে গলায় ঝোলায়। জিজ্ঞেস করে, "আমার বসার জায়গা কোনটা বলতে পারবেন?"

"না ম্যাডাম। ম্যানেজার স্যারকে জিজ্ঞেস করুন।"

"তাকে কোথায় পাব?"

"সোজা গিয়ে বাম দিকে ওনার ডেস্ক।"

"আচ্ছা, ধন্যবাদ।"

ম্যানেজার মাহবুব চমৎকার লোক! কী দারুণ করে কথা বলেন। ঠোঁট থেকে হাসি তো সরে না বললেই চলে। একেবারে নিজে সাথে করে ওকে কেবিনে পৌঁছে দিলেন ভদ্রলোক। সেঁজুতির এত ভালো লাগল সবকিছু! অফিস, অফিসের মানুষজন সাথে আস্ত কেবিনটা দেখে মুগ্ধতায় হাজারবার শুকরিয়া বলে ফেলল।

মাহবুব চলে গিয়েছেন। সেঁজুতি চেয়ারের গায়ে হাত বোলাল। অধরজুড়ে তৃপ্ত হাসির স্রোত। আচ্ছা, একেই কি ভাগ্য বলে? পরশুদিনও যে মেয়েটা টাকার চিন্তায় ছটফট করল, আজ এই চেয়ারে তার জায়গা হয়েছে। সেঁজুতি বুক ভরে শ্বাস নেয়। এসি বন্ধ করে খুলে দেয় বড়ো জানলার কপাট। প্রবল হাওয়ার তোড়ে দুলে ওঠে কাঁধের দুপাশের চুল। অনেকদিন, অনেকগুলো দিন পর আজ সেঁজুতি মুক্ত শ্বাস টানল। দরজায় টোকা পড়ল তখনই। প্রশ্ন ছুড়ল কেউ একজন, "মে আই কাম ইন, ম্যাডাম?"

সেঁজুতির ধ্যান ভাঙে। ফিরে আসে জায়গায়।

"জি আসুন।"

পিওন বশির দরজা ঠেলে ভেতরে এলেন। সালাম ঠুকলেন বিনয়ী গলায়।

"আমি বশির, ম্যাডাম। এই অফিসের পিওন। প্রায় চার বছর ধরে আছি।"

সেঁজুতি ভেতর ভেতর নার্ভাস। এত বয়স্ক লোক ম্যাডাম ডাকায় কিছু থতমতও খেল। এসব অভ্যেসে নেই কি না। ও হাসল কোনোরকম।

CamScanner

উনি পরপরই বললেন, "আপনাকে বস ডাকছেন, ম্যাডাম। আমি আসি এখন। কিছু লাগলে ডাকবেন।"

'বস' শব্দটা শুনতেই সেঁজুতির স্যাতসেঁতে গলবিল শুষ্ক হলো অচিরাৎ। বুক দুরুদুরু করে উঠল। এমন দানবাকার অফিসের মাথা যিনি, কেমন হবে সে?

সেঁজুতি ঠোঁট ফুলিয়ে শ্বাস ফেলে। সময় নিয়ে সাহস টানে বক্ষে। মাহবুব কেবিনে আসার পথে দেখিয়েছিলেন, তার পাশেই বসের কেবিন। হিসেব মিলিয়ে সেঁজুতি এসে থামল সেথায়। কথা বলতে গিয়ে কেঁপে এলো গলা, "আ..আসব স্যার?"

ভেতর থেকে উত্তর আসেনি কোনও। তবে চোখের সামনে কাচের দরজাটা হাঁ করে খুলে গেল। কিছু ভরকে গেল সেঁজুতি। একা একা দরজা খুলল কী করে? মেয়েটা উকিঝুঁকি দিয়ে চেষ্টা করল বোঝার। অমনি ভেসে এলো একটি দগদগে পুরু স্বর, "আই ডোন্ট হ্যাভ অল দ্যা ডে! আসতে হলে আসুন, নাহলে সংয়ের মতো দাঁড়িয়ে থেকে আমার সময় নষ্ট করবেন না।"

কী জলদগম্ভীর আওয়াজ! সেঁজুতির মস্তিষ্কের প্রতিটি নিউরন অবধি সজাগ হয়ে পড়ে। সেখানে প্রথমেই হানা দিলো রুদ্রর নাম। যাকে এই মুহূর্তে পৃথিবীতে সবচাইতে ঘৃণা করে সে। উৎসুক্যে সেঁজুতির দাঁড়িয়ে থাকা হলো না। ভেতরে ঢুকল ত্রস্ত পায়ে। কেবিনের ভেতর সোজাসুজি টেবিলের দিকে চোখ যেতেই থমকে গেল স্থানে।

রুদ্র দাঁড়িয়ে। সুঠাম দেহ ঠেস দিয়েছে টেবিলে। ডান পা-টা একটু এলবো করে ভাঙা। তাতে দাগ তুলেছে কালো পলিশ করা বুট। গোছানো শার্টের হাতা নিখুঁত করে ভাঁজ করে কনুই অবধি গোটানো। দুটো ধারালো আঙুল ধরে রেখেছে একটা অর্ধ পোড়া সিগারেট। লালচে ঠোঁটে একটু পর ধরছে সেটা।

অথচ সুদর্শন এই যুবককে দেখেই নিস্তব্ধ হয়ে পড়ল সেঁজুতি। চোখের সামনে স্পষ্ট পৃথিবী যেন ঝাপসা হলো বিস্ময়ে। মূর্তির ন্যায় চেয়ে থাকা মেয়েটার শরীরে এক ফোঁটা নড়চড় দেখা যায় না। শুধু ঠোঁটফুঁড়ে বেরিয়ে এলো আওয়াজ, "আপনি।"

রুদ্রর ওষ্ঠপুটে সূক্ষ্ম হাসির রেশ। ঘুরে গিয়ে চেয়ারে বসল এবার। চাকা দুটো, দুদিকে একটু নাড়িয়ে বলল, "সিট!"

সাথে সামনের চেয়ার দেখাল সে। সেঁজুতি ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে। বিশ্বাস, অবিশ্বাসের দোলাচলে এখনও দুর্বল জমিন দুলছে। রুদ্র ফের বলল একই কথা। তবে আগের থেকে তপ্ত শোনাল আওয়াজ, "আই সেইড সিট হেয়্যার।"

CamScanner

মেয়েটা নড়ে উঠল এবার। তোলপাড় হওয়া বুকটাকে চট করে সামলে এসে বসল কেদারায়।

অমনি একটা অপ্রত্যাশিত কাণ্ড ঘটাল রুদ্র। সিগারেটে টান বসিয়ে ঝুঁকে এসে ফুঁ দিলো সামনে। সাদা-কালো পোড়া ধোঁয়া হুড়মুড় করে সেঁজুতির নাকে এসে লাগে। নাসারন্ধ্রের হামলায় খুকখুক করে কেশে উঠল মেয়েটা। কোনওরকম ধাতস্থ হয়ে রুষ্ট চোখে চাইল। ভয়ানক খ্যাপে বলল, "কোন ধরনের অসভ্যতা এসব?"

রুদ্র একইরকম হাসছে। উত্তর না দিয়ে জিজ্ঞেস করল, "কেমন আছেন, মিস সেঁজুতি?"

কথায় পরিষ্কার শ্লেষ। প্রশ্নের বদলে জানতে চাওয়া, আমাকে এখানে দেখে কেমন লাগছে?

সেঁজুতি সোজাসাপটা শুধায়, "আপনি এখানে কী করছেন?"

রুদ্র ভ্রু নাঁচাল, "কী করছি? আমার অফিস, আমি থাকব না?"

মেয়েটা উৎকণ্ঠিত, "আপনার অফিস? আপনার অফিস তো আ.."

রুদ্র কথা টেনে নেয়, "ইয়েস, আরআরসি ইন্ডাস্ট্রিজ মানেই রুদ্র রওশন চৌধুরী ইন্ড্রাস্ট্রিজ। শর্টকার্টে চৌধুরী ইন্ড্রাস্ট্রিজ।"

সেঁজুতি প্রহৃত বনে রইল। লোকটার শয়তানি বুদ্ধির তল পেতে একদণ্ড সময় লাগেনি তার।

তাও শান্ত গলায় বলল, "আমাকে এখানে কাজ দেওয়ার মানে?" মেয়েটা বাইরে থেকে শক্ত। অথচ ভেতরটায় বয়ে যাচ্ছে কালবৈশাখির হাওয়া।

রুদ্র হঠাৎ টেবিলের ওপর দুই পা ওঠায়। একটার ওপর আরেকটা মেলে ক্রস বানাল। জুতোর তলদেশ গিয়ে ঠেকল ঠিক সেঁজুতির মুখ বরাবর। স্তব্ধ হয়ে গেল মেয়েটা। সে কপালের পাশ চুলকে বলল, "এই যে আমার টেবিলের ওপর ল্যাপটপ, ফোন, আরো অনেক দামি দামি জিনিস আছে? এর মধ্যে আমি পায়ের জুতোটাও তুলে দিলাম। ঠিক সেইভাবে আপনার মতো একটা যোগ্যতাহীন, সস্তা মেয়েকে চাকরি দিলাম আমার মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে। রুদ্র রওশন চৌধুরী চাইলে সব হয়। পেলেন প্রমাণ?"

বাকরুদ্ধ সেঁজুতির শব্দভান্ডার শূন্য তখন। অপ্রত্যাশিত অপমানে মুখখানা থমথমে হয়ে আসে। স্তম্ভিত আওড়াল, "আপনি কি আমাকে অপমান করতে চাকরি দিয়েছেন?"

CamScanner

রুদ্রর দৃঢ় কণ্ঠের দৃঢ় স্বীকারোক্তি, "না। দিয়েছি আপনার অপমানের জবাব দিতে। সেদিন বলেছিলেন না? আপনি আমার মাত্র তিনদিনের কর্মচারী? আমার অফিসে না কি আপনার জুতোও আসবে না? তাই আমি আপনাকে আমার অফিসের তিন বছরের কর্মচারী বানিয়ে নিলাম। আপনি সেদিন আমাকে যা যা বলেছেন, সেসব আমি ভুলিনি, সেঁজুতি। কিন্তু দেখুন, আমি কত উদার! এত কিছুর পরেও আপনার মতো একটা মিডলক্লাস, গাইয়া মেয়েকে আমার পিএ বানিয়েছি। যেখানে আপনার জুতো ফেলারও যোগ্যতা নেই, সেখানে স্বয়ং আপনি বসে আছেন। বলতেই হচ্ছে,এটা আপনার সাত জন্মের ভাগ্য!"

সেঁজুতি স্তম্ভের ন্যায় বসে। কী ধুরন্ধর জাল বিছিয়ে লোকটা ফাঁসিয়েছে তাকে, ভাবতেই চোখের সামনে অন্ধকার লাগছে সব। রুদ্র টেবিল থেকে পা নামাল। ফের বুকে এসে সিগারেটে টোকা দিয়ে ছাই ফেলল অ্যাস্ট্রেতে। পুরোটা সময় নিটোল ওষ্ঠভাঁজে লেপটে থাকে চকচকে জয়ের হাসি। এই জয়, সেঁজুতিকে হারিয়ে দেওয়ার। ফেরত দেওয়া তার সমস্ত অপমান। কড়ায়-গভায় বুঝিয়ে দেওয়া, রুদ্র রওশন চৌধুরী কত মারাত্মক! কত সাংঘাতিক।

সেঁজুতি তখনও নিথরের ন্যায় বসে। গোটা ব্যাপারটায় কেবল টের পেল নিজের অসহায়তার। আজ যদি টাকার এত দরকার না হতো, এভাবে কারো এক কথায় চাকরি খুঁজতে আসত না। আর না এই লোকটা ওকে ফাঁসাতে পারত এভাবে। তার ফরসা মুখটা বিবর্ণ হলো নিমিষে। রুদ্র সূচাল চোখে দেখে নেয় একপল। বড্ড উপভোগ্য লাগে এই চেহারা, এই চাউনিদের।

বিদ্রুপ করে বলে, "কী" নিজের বোকামির জন্য খারাপ লাগছে? না কষ্ট পাচ্ছেন?”

পরপরই বদলে এলো কণ্ঠস্বর। তেমনই পালটে গেল চোখের ভাষা। দুধারের পোক্ত চিবুক মটমট করল ক্রোধে। সবটুক অনল কণ্ঠে ঢেলে বলল, "গোখরার লেজে পা দিয়েছেন সেঁজুতি, বিষদাঁতের প্রহার সইবেন না। সেদিনই বলেছিলাম, রুদ্রকে আপনি চেনেন না। কারো লাইফ হ্যেল করতে আমার যাস্ট দু-সেকেন্ড লাগে।"

এসির ঝিম ধরা কক্ষে, পুরুষালি নিরেট বুলি আরো শক্ত শোনাল। সবকিছুর পর সেঁজুতির একটা দারুণ প্রতিক্রিয়া আশা করেছিল রুদ্র। ভয় পাবে, নত হবে। অথচ মেয়েটা শ্বাস ফেলল ফোঁস করে। বলল ভণিতাহীন, "আমি বুঝতে পেরেছি। আপনি আমাকে চাকরিটা এই জন্যে দিয়েছেন, যাতে কাজের আড়ালে আমাকে নিজের গোলাম বানাতে পারেন। আপনার কথায় আমি উঠব, আপনার কথায় বসব, তাই তো?"

রুদ্র দুই ভ্রু উচাল, "ইম্প্রেসিভ। এত তাড়াতাড়ি বুঝে নিলেন? আপনার ব্রেইন দেখছি আপনার জিভের মতোই ভীষণ ফাস্ট।"

CamScanner

সেঁজুতি ঠোঁটে হাসি টেনে বলল, "ধন্যবাদ! তবে আপনিও একটা কথ শুনে রাখুন। আমাকে হেনস্তা করার কী মতলব আপনি এঁটেছেন আমি জানি না, তবে আমার ধৈর্য সম্পর্কে আপনার কোনো ধারণাই নেই।”

রুদ্র হাসল। বড়ো তুচ্ছতাচ্ছিল্যের হাসি। পরিহাস করে বলল, "ধৈর্য? তিন বছরে আপনার এমন অবস্থা হবে যে ধৈর্য শব্দটাই ভুলে যাবেন আপনি সাপের ছুঁচো গেলার মতো দশা বানাব আপনার। না পারবেন চাকরি ছাড়তে, না পারবেন করতে।"

সেঁজুতি মুচকি হেসে বলল, "চ্যালেঞ্জ এক্সেপটেড।" রুদ্র বিভ্রান্তিতে ভ্রু বাঁকায়। ও উঠে দাঁড়াল এবার।

"এখন আমি যেতে পারি?”

রুদ্র বিদ্রূপ করে বলল, "কনফিডেন্ট ইজ গুড, মিস সেঁজুতি। বাট ওভার কনফিডেন্ট ইজ নট গুড ফর এনিওয়ান। আপনার মনে হচ্ছে না আপনি একটু বেশিই আত্মবিশ্বাস দেখাচ্ছেন?"

সেঁজুতি সোজাসাপটা বলল, "প্রথম কথাটা পড়েছিলাম কোথাও। সাথে এটাও পড়েছি, অহংকার পতনের মূল।"

মুখের ওপর মোক্ষম জবাব। রুদ্রর বক্র হাসি মুছে গেল অমনি। রূঢ় চাহনি উপেক্ষা করে সামনে পা বাড়ায় সেঁজুতি। তপ্ত বাতায়ণে ঘোষণা হয়, দুজনের নীরব ঠান্ডা এক যুদ্ধের।

সেঁজুতি বেরিয়ে যাওয়ার জন্যে দরজা অবধি এলো, সহসা ডাক ছুড়ে রুদ্র।

"দাঁড়ান।"

থামল সে। পেছন ফিরল গতিতে।
রুদ্র বাক্যব্যায় করে না। চট করে টেবিলের ওপর রাখা বেল টিপে দেয়। সেকেন্ড কয়েকেই কেবিনের সামনে হাজিরা দিলেন বশির। অনুমতি নিয়ে ঢুকে, সালাম ঠুকলেন বিনয়ে।

সেঁজুতি তখনও ওভাবেই দাঁড়িয়ে। চেহারা জুড়ে বিভ্রম। কোনো কিছুই ঠিকভাবে ঢুকছে না মাথায়। আবার কী করতে চাইছে লোকটা?

রুদ্র সোজাসুজি প্রশ্ন করল, "তোমাকে আমার হয়ে কী কী কাজ করতে হয়, বশির?"

CamScanner

ভদ্রলোক থমকালেন ভ্রান্তিতে। হঠাৎ এই কথা কেন? কিন্তু বসের মুখের ওপর প্রশ্ন করার স্পর্ধা ওনার নেই। জবাব দিলেন বিলম্বহীন, "আপনার সব কাজ করতে হয়, স্যার। কফি বানানো, লাঞ্চ রেডি করা, ফাইল গোছানো। এসব ছাড়া যখন যেটা বলেন সেটাই করে দেই।"

রুদ্র তুষ্ট চিত্তে মাথা নাড়ল। দু-আঙুলের ফাঁকে যে বলপেন গাঁথা? আচমকা সেটা তাক করল সেঁজুতির দিকে।

"এখন থেকে এইসব কাজ উনি করবেন। আমার কাজ থেকে তোমার ছুটি। যাও।"

বশির হোঁচট খেলেন। গোল গোল চোখ করে সেঁজুতিকে দেখলেন একবার। মেয়েটা তো স্যারের অ্যাসিস্ট্যান্ট হয়ে জয়েন করেছে। তাহলে তার কাজ কেন করবে?

কিন্তু পিওন হয়ে এসব নিয়ে মাথা ঘামানোর অধিকার কই? রুদ্রর নির্দেশে নিশ্চুপ চলে গেলেন কাজে।

এদিকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ল সেঁজুতি।

রুদ্রের ওষ্ঠাধরে ক্রুর হাসির বাণ। ক্রমে বেড়ে চলল তা। বাঁকা চোখে ফিরল। জিজ্ঞেস করল শ্লেষ নিয়ে, "কিছু বলার আছে আপনার?"

ও ভেবেছিল মেয়েটা দমে যাবে। কাঁদবে দূর্বল সব নারীদের মতো। তারপর ছুটে এসে লুটিয়ে পড়বে পায়ে। যেমনটা সে চাইছে। অথচ ভীষণ সাবলীল ভঙ্গিতে মুখ খুলল সেঁজুতি, "কফি কি ক্যানটিন থেকে আনব, স্যার?"

রুদ্রর জ্বলন্ত হাসিটা দপ করে নিভে গেল অমনি। চোখ ফেলল বিমূর্ত বনে। সেঁজুতি নিজেই বলল, "আমি বরং বশির ভাইয়ের কাছ থেকে সব ডিটেইলসে জেনে আসি।"

চোখের সামনে থেকেই বেরিয়ে যায় সে। শুভ্র পুরুষ হতবাক হয়ে চেয়ে থাকে কেবল। কেবিনের বাইরে এসে ঠোঁট চেপে হাসল সেঁজুতি। শ্বাস ফেলল গাল ফুলিয়ে। বিড়বিড় করল দাঁত পিষে, "কেমন লাগছে এখন? আপনিও আমায় চেনেন না, মিস্টার চৌধুরী। আপনি বুনো ওল হলে, আমিও বাঘা তেঁতুল।"

রুদ্র ক্যানটিনের কফি খায় না। তাকে কেবিনের মেকার দিয়ে বানিয়ে দিতে হয়। এবং সেটাও হাতে গ্লাভস পরে, চোখের সামনে থেকে। কথাটা শোনার পর বিরক্তিতে ভেংচি কাটল সেঁজুতি। কী আদিখ্যেতা। সারা অফিসের মানুষ ক্যানটিনের কফি খেতে পারে। আর এনার শুধু ঢং!

দশ মিনিটের মাথায় আবার কেবিনে ঢুকল সে। গিয়ে রুদ্রর সামনে দাঁড়াল একদম। কন্ঠনালিতে উপচে পড়ছে নম্রতা, "আপনি কি এখন কফি খাবেন, স্যার?"

রুদ্র ফাইলে ডুবে রইল। জবাব দিলো ক্ষুদ্রাকারে, "হু।"

মেকারের জন্যে সেঁজুতিকে খোঁজাখুঁজি করতে হয়নি। রুদ্রর কেবিনের এক কোনায় আস্ত একটা কফি কর্নার বসানো। ও এগিয়ে যায় সেদিক। সহসা চোখের কোনা দিয়ে চাইল রুদ্র। মেয়েটার এত স্বাভাবিক থাকায় বিভ্রান্ত হচ্ছে সে। যেখানে তার উত্তেজিত হয়ে কেঁদেকেটে একাকার করা উচিত। উচিত রুদ্রর থেকে নিস্তারের আশায় দুহাত জড়িয়ে ক্ষমা চাওয়া। সেখানে কী আনন্দ নিয়ে খাটছে। এরকম হলে কী করে চলবে?

কাজকর্মে সেঁজুতি যথেষ্ট নিপুণ। বেশ যত্ন নিয়ে, মন দিয়েই কফি বানিয়েছে। সব শেষ করে মগটা রুদ্রর সামনে রেখে বলল, "আর কিছু লাগবে, স্যার?"

রুদ্র বিচক্ষণ। অন্তত ছোটো থেকে সবার কাছে নিজের ব্যাপারে এমনই শুনে এসেছে। অথচ আজ এক তরুণী রীতিমতো ব্যবহার দিয়ে ঘোল খাওয়াচ্ছে তাকে। বিন্দুমাত্র তল পাচ্ছে না হাবভাবের। সে কপাল কুঁচকেই মগ হাতে তুলল। ঠোঁট বসাল মন্থর বেগে। সেঁজুতি তখনও উত্তরের আশায় চেয়ে। লোকটা শুধু একবার মুখ দিয়ে বের করবে, "আর কিছু লাগবে না।"

ব্যস। নিজের জায়গায় ফিরে প্রাণ ভরে নিঃশ্বাস নেবে একটু।

অথচ এমন কিছু ঘটল না। উলটে কফি মুখে দিয়েই রুদ্র চেহারা বিকৃত করে ফেলল। আগুন চোখে চাইল ওর দিকে। কোনো কিছু বোঝার আগেই, কাপের গরম কফিটা ছুড়ে মারল সেঁজুতির গায়ে। প্রকাণ্ড হকচকাল মেয়েটা। ভরকে, চমকে পিছিয়ে গেল দু-কদম। উষ্ণ কফির তোপে গলার চামড়া জ্বলে যায়।

রুদ্র রেগেমেগে বলল, "আমি কফিতে মিষ্টি খাই না। বশির আপনাকে বলেনি?"

তার চিৎকারে সবকিছুর রূপ পালটে যায়। প্রতিধ্বনি হয় দেওয়ালে দেওয়ালে। অথচ সেঁজুতি বিনয় সমেত বলল, "আমি আবার বানিয়ে দিচ্ছি, স্যার।"

CamScanner

মগটা তুলে আবার চলে গেল ও। কফি ছুড়ে মারায় যতটা না চমকেছিল সে? তার থেকেও বেশি চমকে গেল রুদ্র। নিরুত্তাপ মেয়েটিকে দেখে বিহ্বলতায় গুছিয়ে এলো চোখ। পেছনের সবকিছু বাদ। এই ঘটনার পরেও এত শান্ত কী করে মেয়েটা?

রুদ্রর হাত থেকে ছাড়া পেতে পেতে বেলা গড়াল সেঁজুতির। নিজের কেবিনে ফিরে মেয়েটা ধপ করে বসে পড়ল কাউচে। গলার কাছে নরম হাত বোলাল কয়েকবার। জ্বলছে খুব। ফোস্কা পড়বে হয়তো। সেঁজুতি বিষণ্ন চোখ তুলে সামনের শুভ্র দেওয়াল দেখল। শক্ত চিবুক বদলে এলো কান্নার তোপে। আচমকা মুখ চেপে হুহু করে কেঁদে ফেলল মেয়েটা। আবার সেই রুদ্র রওশন চৌধুরী। আবার সেই অপমান! এবার তো এমনভাবে ফাঁসল, পালাবার কোনও উপায়ই নেই। তিন তিনটে বছর এসব সহ্য করতে হবে। প্রথম দিনেই যদি এই হয় ওনার ব্যবহার, ধীরে ধীরে না জানি কত ভয়ানক হবে।

রুদ্রর চোখ তখন ল্যাপটপের স্ক্রিনে। সেঁজুতির কেবিনেও একটা মিনি সিসিক্যামেরা আছে। নতুন নয়, আগেও ছিল। মেয়েটাকে কাঁদতে দেখে তার আনন্দ পাওয়ার কথা। পৈশাচিক খুশিতে ফুঁসে ওঠা উচিত। অথচ কেন যেন ভীষণ খারাপ লাগছে। গরম কফিটা ছুড়ে মারা কি ঠিক হলো? রুদ্র অনুতপ্ত হতে হতেই সতর্ক হলো হঠাৎ। খেয়াল করল সেঁজুতি মুখ তুলেছে। কথা বলছে একা একা। কৌতূহলে তৎপর মাইক্রোফোনের বাটন টিপল সে। শুনতে পেল মেয়েটা কটমটিয়ে উগলে দিচ্ছে ক্ষোভ, "অসভ্য, অভদ্র, জালিম একটা। আমাকে বোকা বানিয়ে, অফিসে কাজ দিয়ে এখন টর্চার করছিস? মরবি তুই। শয়তান কোথাকার।

"বাকিটুকু না শুনেই রুদ্র দুম করে ল্যাপটপ বন্ধ করে দেয়। যাও একটু মায়া লাগছিল এতক্ষণ, মুহূর্তে উবে গেল সব। উলটে ভীষণ রাগে ফেঁপে মাল চোয়াল। দাঁত পিষে টেবিলের বেল টিপল সে। যেটা শব্দ করে বেছে উঠল সেঁজুতির কেবিনে। আওয়াজ শুনে আহত মেয়েটা নিহত হয় এবার। বুঝতে বাকি নেই এ কীসের সংকেত। শয়তান লোক আবার ডাকছেন। কোন ফন্দি এঁটেছে কে জানে।

সারাদিনের ধকল শেষে নয়টা নাগাদ বাড়ি ফিরল সেঁজুতি। শরীরে তখন শক্তি নেই। দুচোখ ভেঙে ঘুম আসছে। এক্ষুনি গিয়ে ঝাঁপ দিতে ইচ্ছে করছে বিছানায়। কোনোমতে কলিংবেল টিপতেই বাতাসের গতিতে এসে দরজা খুলল আরিশা। হাওয়াই মিঠাইয়ের মতো এক টুকরো মিষ্টি করে হাসল। ব্যস। সেঁজুতির সমস্ত অবসাদ মিটে গেল মৃত্তিকায়। মেয়েটা তার সব ক্লান্তির পথ্য হচ্ছে আজকাল। সারাদিনে এই প্রথম হাসল সেঁজুতি। ভেতরে ঢুকতেই আরিশা ছটফটে কণ্ঠে শুধাল, "কেমন কাটল অফিস? বস কেমন?"

সেঁজুতি উলটো ঘুরে জুতো খুলছিল। কথার পিঠে দাঁত চেপে বিড়বিড়

CamScanner

করল, "আস্ত একটা শয়তান।"

ফিরে বিস্তর হাসি টানল ঠোঁটে।

"খুব ভালো মানুষ। কী দারুণ ব্যবহার, শুনলে তুই পাগল হয়ে যাবি।"

আরিশা নিশ্চিন্ত হয়ে বলল, "যাক বাবা। শান্তি। এত চিন্তা হচ্ছিল আমার। এই চাকরিটা মন দিয়ে কর, দেখবি তোকে আর পেছনে তাকাতেই হবে না। আমিও আজকে একটু আরাম করে ঘুমোব জানিস। তোর জীবনে আর কোনো সমস্যা নেই মানে, আরিশার সব অশান্তি শেষ!"

সেঁজুতি চুপ করে থাকে। কাষ্ঠ হেসে ভাবে, "সমস্যা? আমার জীবনের বড়ো সমস্যাটাই আমার অফিসে রে, আরিশা। কাল থেকে রোজ যার জ্বালাতন সহ্য করে করে আমায় টিকে থাকতে হবে। জলে বাস করে কুমিরের সাথে লড়াই করতে আদৌ পারব তো আমি?"

১৫.

তারপর দিনগুলো থেকে সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। সেঁজুতিকে দু-সেকেন্ড দম ফেলারও ফুরসত দেয় না রুদ্র। কথায় কথায় ডেকে পাঠায় কেবিনে। এটা ওটা কাজ দিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা খাটিয়ে মারে। নিজের একটা আলাদা চেয়াটা থাকা সত্ত্বেও আজ অবধি সেখানে আশ মিটিয়ে বসতে পারেনি সেঁজুতির চেয়ারটা যেন প্রতিবার ওকে হায় হায় করে ডাকে। মন খারাপ করে বলে, "আমাকে ছেড়ে যেও না।"

সেঁজুতি দীর্ঘশ্বাস ফেলল। সব কষ্ট বুকে চেপে আবার এসে দাঁড়াল রুদ্রর কেবিনে। মোমের মতো নরম গলার স্বর, "ডেকেছিলেন, স্যার?"

রুদ্র ফাইল থেকে চোখ তুলে চাইল। না চাইতেও দৃষ্টি পৌঁছুল মেয়েটার গলার খাঁজে। শুভ্র ত্বক লালচে হয়ে আছে। ফোস্কা পড়ার দাগ স্পষ্ট বোঝা যায়। রুদ্রর পরিতাপ ফেরত এলো আবার। না, কাজটা একদম ঠিক করেনি। রাগ-ক্ষোভের বসে কাউকে শারিরীক অত্যাচার করার মতো মানুষ সে নয়।

ওকে এইভাবে তাকিয়ে থাকতে দেখে অপ্রস্তুত হলো সেঁজুতি। গায়ের মেলে রাখা ওড়না ঠিকঠাক করল ত্রস্ত। অমনি রুদ্রর মেজাজ চটে যায়। ওড়না টেনে কী বোঝাল মেয়েটা? ও কি খারাপভাবে দেখছিল? মেয়েটা ইনিয়ে-বিনিয়ে প্রশ্ন তুলল ওর চরিত্রে? রুদ্রর আত্মসম্মানে অহেতুক আঘাত লাগল। কন্ঠ গুমোট করে বলল, "আজকের স্ক্যাজিয়্যুল বলুন?"

CamScanner

সেঁজুতির হাতে নোটস। রুদ্র যখন যা বলে সব টুকে রাখতে হয়। তারপর জনাবের হুকুম মতো পড়ে শোনাতে হয় আবার। এবারেও ঠিক তাই তাই করল। পাতা উলটে লেখাগুলোয় একবার চোখ বুলিয়ে জানাল, "সন্ধ্যায় অহরাম কোম্পানির ম্যানেজার আসবেন, স্যার। স্যাম্পল নিয়ে কথা বলবেন। এ ছাড়া আর কোনো ইম্পর্টেন্ট মিটিং নেই আজ।"

"কফি দিন।"

মাথা নাড়ল সেঁজুতি। নোটবুক নামিয়ে রেখে চলে গেল দ্রুত। রুদ্র নিম্নোষ্ঠ চেপে দেখে গেল কিছুক্ষণ। তার ঈগল চোখের ফাঁকফোকরেও মেয়েটার এক ফোঁটা বিরক্তি ধরা পড়ছে না। না দেখছে হতাশ হতে। এরকম হলে সে আনন্দ পাবে কী করে? রুদ্র নিজের ওপরেই বিরক্ত হলো আজ। একটা কোনও উপায় কি নেই এই মেয়েকে জব্দ করার মতো? কিছু একটা...

ভাবতে ভাবতেই হঠাৎ চেহারা টানটান করল সে। দারুণ পরিকল্পন মস্তিষ্কে দপদপ করে উঠতেই ক্রুর হাসল রুদ্র। আরাম করে চেয়ারে হেলান দিলো। দুপাশে দোল খেয়ে ভাবল, "এবার আপনার কী হবে, সেঁজুতি?

"মেয়েটা তখন চামচ নাড়ছিল কাপে। সুগভীর মনযোগে ভাটা পড়েনি কোনো পুরুষের চেয়ে থাকায়। কিংবা আদৌ ভেবেছিল? সুদর্শন এক পুরুষ তাকে একটু হেনস্তা করার আশায় কী জঘন্য প্ল্যান সাজিয়েছে?”

চৌধুরী ইন্ডাস্ট্রিজ ছুটি হয় ঠিক রাত আটটায়। সেঁজুতি ব্যাগ গোছাচ্ছিল। আর তক্ষুনি শব্দ হলো বেল বাটনে। ত্রস্ত দেওয়ালঘড়ি দেখল মেয়েটা। সাতটা পঞ্চান্ন বাজছে। এখন আবার ডাকছে কেন এই লোক? দুই গাল ফুলিয়ে অতীষ্ঠ শ্বাস ফেলল ও। অনিচ্ছায় এগোলো রুদ্রর হুকুম পালন করতে।

টেবিলের ওপর এক গাদা ফাইল রাখা। উচু শৃঙ্গসম সেই ফাইলের চূড়া দেখিয়ে আদেশ করল রুদ্র, "এগুলো চেক করে ফাইলিং সিস্টেম গুছিয়ে নিয়ে আসুন।"

সেঁজুতির বিষম খাওয়ার জোগাড় হলো এবার। ক-হাত চোয়াল ঝুলিয়ে বলল, "এতগুলো ফাইল একসাথে? কিন্তু অফিস তো একটু পরেই ছুটি হয়ে যাবে।"

রুদ্র চোখ ছোটো করে, "তো? আপনি আপনার বাসার রাস্তা চেনেন না? কাজ শেষে চলে যাবেন।"

CamScanner

ও উদ্‌দ্বেগ নিয়ে বলতে গেল কিছু, এর আগেই হাত উচিয়ে থামিয়ে দেয় রুদ্র। শক্ত কণ্ঠে অনীহা, "সময় নষ্ট করবেন না, যান।"

সেঁজুতি হতাশ শ্বাস ফেলল। নিরুপায় সে। যা বলবে তা না করে যাবে কোথায়? মুখ কালো করে একটার ওপর একটা ফাইল তুলল সে। পিছু ঘুরে এক পা বাড়াতেই চট করে ধ্বসে পড়ল সব। মেয়েটা অসহায় চোখে রুদ্রর দিক চাইল। মানুষটার হয়তো একটু দয়া হলো এবার! বশিরকে ডাকল অমনি। ভদ্রলোক ফাইল নিয়ে সেঁজুতির কেবিনে দিয়ে এলেন।
সেঁজুতি পিছন পেছন যায়।

দৃষ্টির আড়াল হতেই বিজয়ী হাসল রুদ্র। এই এতদিনে সেঁজুতির বিপন্ন চেহারা দেখেছে সে। কী যে শান্তি লাগছে বুকে! এতটা শান্তি তো কিছুতে নেই। অবশ্য এখনও যে আসল মজা বাকি। রুদ্র হাতঘড়ি দেখল। আর মাত্র চার মিনিট। তারপর...

আটটা বাজা মাত্রই বিশালাকার অফিস ফাঁকা হয়ে গেল। সমস্ত আলো নিভিয়ে ডিমবাতি জ্বালিয়ে দিলেন বশির। সারা অফিসে কেবল দুটো রুমের আলো জ্বলছে তখন। এক, ফাইলের চূড়ায় ডুবে থাকা সেঁজুতি। আর দুই রুদ্রের কেবিনের। সবসময় সবার আগে বের হয় সে। অথচ আজ যেন নড়ছেই না। বশির ফাঁকে সেঁজুতিকে চা দিয়ে এলেন। মেয়েটার জন্যে ভীষণ মায়া হয় ওনার। এই তো সাতদিন হলো জয়েন করেছে এখানে। অথচ মনে হচ্ছে গায়ে দুকেজি মাংস নেই। বস সারাদিন এত খাটায় ওনাকে। এত কাজ তো তার নিজেরও নেই।

সর্বদা রুদ্র বের হলে তবেই বাড়ি ফেরেন বশির। কিন্তু আজ তার ওপর হুকুম ছিল আগে চলে যাওয়ার। সেই মতো সব কাজ সেড়ে বিদায় নিলেন তিনি।

রুদ্র বেরিয়ে এলো এবার। আশপাশটা চিলের নজরে দেখে সেঁজুতির কেবিনের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। কাচের দরজা। অথচ কাজে বুঁদ থাকা মেয়েটা রুদ্রকে খেয়াল অবধি করেনি। আর সেই সুযোগটাই দুহাতে লুফে নিল সে। চট করে কেবিনের দরজায় তালা ঝুলিয়ে দিলো।

চাবির রিং শূন্যে ছুড়ে ফের ধরে ফেলল মুঠোয়। হুট করেই কঠিন করল চিবুক। বড়ো পাষণ্ডের ন্যায় বলল, "আজই আপনাকে বোঝাব, সেঁজুতি। রুদ্র রওশন চৌধুরী কত ভয়ঙ্কর হতে পারে!"

রুদ্র গেইটে আসা মাত্র তড়িঘড়ি করে দাঁড়িয়ে গেলেন দারোয়ান। সালাম ঠুকলেন নম্র গলায়। ও দাঁড়াল। আদেশ করল দরাজ স্বরে, "তুমি বাড়ি চলে যাও। এখানে থাকতে হবে না।"

লোকটি ঘাবড়ে গেলেন। চাকরি জীবনে এমনটা কক্ষনো হয়নি।

CamScanner

ভয়ে ভয়ে বললেন, "কেন স্যার? কিছু করেছি আমি?"

"প্রশ্ন কম। যাও।"

মেজাজি বসের উষ্ণ চোখে লোকটি দ্বিতীয় বাক্য তুললেন না। বাধ্যের ন্যায় ঘাড় নেড়ে সাইকেল সমেত বিদায় নিলেন। রুদ্র ঠোঁট কামড়ে হাসল। তৎপর উঠে বসল গাড়িতে। অন্ধকারে মাখোমাখো ভবনের দিক চাইল আরেকবার।

"আজকের পর থেকে রুদ্র রওশন চৌধুরীকে ভয় পাবেন, সেঁজুতি। ভীষণ ভয়!"

রাত যখন বারোটা? বাইরের দেওয়ালে থাকা ঘড়িটা ঢং ঢং করে উঠল। নিস্তব্ধ অফিসের সেই শব্দে চমকে মুখ তুলল সেঁজুতি। এই শব্দ করে সে বহুবার শুনেছে। কিন্তু অফিসের কোলাহলে এতটা কানে লাগেনি। মেয়েটা হাতঘড়িতে চোখ বোলাল ফটাফট। ঘন্টার কাঁটা বারোর ঘরে দেখেই ভ্রু তুলল কপালে। এইরে। এত রাত হয়ে গেছে? আর ও কিচ্ছু টের পেল না।সেঁজুতি তড়িঘড়ি করে ফাইল গোছাতে নেয়। আর অল্প কয়েকটা বাকি। সব শেষ করতে গেলে গোটা রাত এখানেই পার হবে। এর থেকে বাড়ি নিয়ে যাবে, রাত জেগে বাকিটা করে ফেলবে না হয়।

সেঁজুতি বের হওয়ার জন্যে হন্তদন্ত পায়ে কেবিনের দোর অবধি এলো। হাতল ধরে টানল, তবে দরজা খুলল না। গায়ের জোর দিয়ে টানল ক-বার তাও না। বুঝে নিল, দরজা বাইরে থেকে লাগানো। মেয়েটার ফরসা মুখ ফ্যাকাশে হলো অমনি। ঝুপ করে কাঁপন ধরল গায়ে। দরজা বাইরে থেকে লাগানো কেন? কে লাগিয়েছে? বশির ভাই তো দেখেই গেলেন ও ভেতরে।

সেঁজুতি কিছুক্ষণ অশান্ত হাতে টানাটানি করে। প্রতিবারই শূন্য আসে ফল। শেষে চ্যাঁচিয়ে বলল, "কেউ আছেন? শুনতে পাচ্ছেন আমাকে?"

ওপাশ থেকে কোনো সাড়াশব্দ এলো না। আসবে কী করে? কেউ থাকলে তো। সেঁজুতি আতঙ্কে দিশা হারিয়ে ফেলছে। এত বড়ো বিল্ডিংয়ে সে একা ভাবতেই জমে যাচ্ছে শরীর। মেয়েটা উড়ে জানলার ধারে এলো। কপাট খুলে একইরকম চ্যাঁচাল, "কেউ আছেন? হেল্প। আমি আটকে গেছি। হেয় প্লিজ।"

উত্তরার এই দপ্তর বেশ জায়গা নিয়ে তৈরি। আশেপাশে দালানকোঠা নেই বললেই চলে। তবে নিচ থেকে যানবাহনের ছুটে যাওয়া স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে সেঁজুতি। সেই শব্দ আর বাতাসের তোড়ে চিৎকার মিলিয়ে যায় তার। বিফল ভঙ্গিতে ফিরে আসে মেয়েটা। এখন কী করবে? কাকে ডাকবে? একটা ফোন থাকলে তো কাউকে খবর দেওয়া যেত। আচমকা চোখ পড়ল টেবিলের ওপর। টেলিফোনটা দেখেই মনের মধ্যে আশার আলো ফুটল। ছুটে এলো সেঁজুতি। ব্যস্ত হাতে

রিসিভার তুলে আরিশার নাম্বার ডায়াল করল। বিধিবাম। কল যাওয়ার আগেই কল ডিসকানেক্ট হয়ে যাচ্ছে। রুদ্র আগেই এসব কারসাজি করে রেখেছিল। সরল মেয়েটা সেসব জানল অবধি না। যখন বুঝল, বের হওয়ার সব পথ বন্ধ। নিথরের ন্যায় ধপ করে বসে পড়ল ফ্লোরে।

ল্যাপটপের স্ক্রিনে এসব দেখে দেখে হাসছিল রুদ্র। নিষ্ঠুরতার বিভৎস হাসি। হাতের মুঠোয় তার লালচে মদের গ্লাস। চকচকে চাউনিতে এক ভাবে দেখছে সেঁজুতির চুপসে থাকা মুখ। এই যে মেয়েটা কাঁদছে? ছুটছে ছটফটিয়ে? এসবে আনন্দে ভরে যাচ্ছে বুকটা। এই আনন্দ তুলনাহীন। ব্যবসার সবথেকে বড়ো ডিলটা পেয়েও এতটা খুশি হয়নি রুদ্র।

সেঁজুতির পিঠ দেওয়ালে। জড়সড়ো হাঁটু দুটো বুকের সাথে মিশে। এসির মাঝেও ঘামে চুপচুপ করছে শরীর। কাগজ ওড়ার শব্দ পেলেও আঁতকে উঠছে ত্রাসে। সেই ত্রাস বাড়াতে আচমকা লোডশেডিং হলো। মেয়েটার শীর্ণ বুক ছ্যাঁৎ করে উঠল অমনি। ভয়ডরে "মা" বলে চিৎকার ছুড়ে লুটিয়ে পড়ল মেঝেতে।

স্ক্রিনে অন্ধকার নামতেই রুদ্রর ভ্রু বেঁকে যায়। আয়েশ রেখে সোজা হয়ে বসে। লোডশেডিং হলেও ফ্ল্যাটের জেনারেটর চলছে। কিন্তু অফিসে তো জেনারেটর চালু হয়নি। ওয়াচম্যানই যে নেই।

রুদ্র স্পষ্ট শুনতে পেয়েছে সেঁজুতির চিৎকারের শব্দ। অমনি মস্তিষ্কের কোষগুলোও সচল হলো তার। রাগের বসে একটু বেশিই করে ফেলল না তো? কোনো বিপদ হয় যদি? রুদ্রর বিবেক সজাগ হলো ফের। দাপট সমেত কড়া নাড়ল মনে। বোঝাল, "তোমার একবার গিয়ে দেখা উচিত।"

ও আজ যুক্তি খণ্ডাতে গেল না। ত্রস্ত উঠে দাঁড়াল। ট্রাউজার পরা অবস্থাতেই ছুটে বেরিয়ে গেল বাইরে।

রুদ্র অফিসের সামনে গাড়ি ব্রেক কষতেই হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন দারোয়ান। পথে ওই কল করে ডেকেছিল। উদ্বিগ্ন চিত্তে শুধালেন, "কিছু হয়েছে, স্যার?"

রুদ্রর ব্যস্ত জবাব, "গেইট খোলো, ফাস্ট!"

গেইট খোলা মাত্র রুদ্র যেন ছুটল না, ডানা মেলে উড়ে গেল ভেতরে। পেছনে দারোয়ান আসতে চাইছিলেন, সে বারণ করে দিলো।
অফিসে তখন ঘুটঘুটে অন্ধকার। রুদ্র সুইচ টিপে আলো জ্বালাল প্রথমে।

CamScanner

ছটফটে পায়ে এসে কেবিনের সামনে দাঁড়াল সেঁজুতির। তালা খুলে, ফোনের ফ্ল্যাশ জ্বালিয়ে চোখ বোলাল চারপাশে। হাঁটার মাঝেই জুতোর তলা গিয়ে ম্যাশ দুটো নরম আঙুলের ওপর। তুরন্ত থমকে দাঁড়ায় সে। ফ্ল্যাশের কড়া ঠেকল্য সমালো ঠিকড়ে আনে সেথায়। সেঁজুতি নিথরের ন্যায় পড়ে আছে। সাদা দেহটা লেপ্টে মারবেল মেঝের বুকে। রুদ্রর কপালের ঘাম গড়িয়ে কপোলে এলো। ধড়ফড় করে পাশে বসল মেয়েটার। গাল চাপড়ে ডাকল "সেঁজুতি, মিস সেঁজুতি? শুনতে পাচ্ছেন আমার কথা? সেঁজুতি?"

সাড়া নেই তার। সমস্ত মুখে চটচটে ঘাম। হাত-পা শীতল হচ্ছে ক্রমে। রুদ্র নিজেই ঘাবড়ে গেল এতে। ভয় পেলে মানুষের মৃত্যু অবধি হয়। ও তো চায়নি মেয়েটা মরে যাক। রুদ্র আর এক দণ্ড ভাবল না। ত্রস্ত সেঁজুতিকে তুলে নিল দুহাতে।

ঘরময় অশান্ত পায়ে পায়চারি করছে আরিশা। চিন্তায় বুকের ভেতরটা ফ্যাসফ্যাসে লাগছে। বারাবার চোখ তুলে দেখছে দেওয়াল ঘড়ির কাঁটা। রাত বারোটা ছাড়াল, অথচ সেঁজুতি ফেরেনি। সাথে ফোনও নেই যে একটা খবর পাবে কোনো। মেয়েটা ঠিক আছে তো? কোনো বিপদ হলো না তো? আরিশার একবার মনে হলো, আমিরকে কল দেওয়ার কথা। পরপর পিছিয়ে আনল নিজেকে। সেঁজুতি এসে যদি এ নিয়ে রাগারাগি করে? আঙ্কেল নিজে থেকে তো ওর খোঁজ নেয়নি, তাহলে যেচে খোঁজ দেওয়াও ঠিক হবে না। কিন্তু কী করবে এখন? এভাবে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকবে?

ঠিক তক্ষুনি ফোন বাজল আরিশার। অচেনা নাম্বার দেখে প্রথমেই মনে এলো সেঁজুতির কথা। ওর তো ফোন নেই। যদি অন্য কারোর ফোন থেকে কল করে? আরিশা দুরন্ত হাতে রিসিভ করল। কানে গুঁজে কিছু বলবে, পূবেই ভেসে এলো একটি থমথমে কন্ঠ, "আপনার বন্ধু সেঁজুতি ক্রিসেন্ট হসপিটালে অ্যাডমিট। দেখা করতে চাইলে তাড়াতাড়ি আসবেন।"

আরিশার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। আর্তনাদ করে বলল, "কী। কী বলছেন? সেঁজুতি হাসপাতালে? কী হয়েছে ওর? আর আপনি, আপনি কে?"

উত্তর এলো বিলম্বহীন, "রুদ্র রওশন চৌধুরী।"

তারপর খট করে লাইন কেটে যায়। আরিশার এত ভাবার সময় নেই। সেঁজুতি হাসপাতালে ভর্তি, এই শিরোনাম মাথায় সাজিয়ে হাওয়ার বেগে ছুট লাগায় সে।

"পেশেন্ট খুবব দুর্বল, মিস্টার চৌধুরী। একটা বড়ো শক থেকেই জ্ঞান হারিয়েছে।"

CamScanner

রুদ্র শুষ্ক গলায় ঢোক গিলে শুধাল, "বাঁচবে তো?"

"জি জি। অতটাও সিরিয়াস কিছু হয়নি। ঠিক সময় এনেছেন বলেই ভয় কেটে গেছে। তবে হ্যাঁ, বলতেই হচ্ছে অতিরিক্ত ভয় পেয়েছিলেন উনি। হার্ট ব্লক হওয়ার চান্স ছিল কিন্তু। দাঁতে দাঁত লেগেছিল, ইভেন হাতের মুঠো একেবারেই খোলা যাচ্ছিল না, বুঝলেন? এ ধরনের সিচুয়েশনগুলো মাঝেমধ্যেই খুব ক্রিটিকাল হয়ে যায়। যাক গে, আপাতত স্যালাইন দিয়েছি। সাথে ওষুধ লিখে দেবো। নিয়ম মেনে খাওয়ালে সেরে যাবে। এনিওয়ে, পেশেন্ট কে হয় আপনার?"

এ যাত্রায় বিব্রত হলো রুদ্র। মুখটাকে ঘুরিয়ে নিল সহসা। প্রচণ্ড অনীহ কণ্ঠে বলল, "কেউ না।"
বলার ধরনেই আর কথা বাড়ালেন না ভদ্রলোক। চলে গেলেন চুপচাপ।

রুদ্র নিরুত্তাপ দৃষ্টি ফেলল কেবিনে রাখা বেডের ওপর। কেমন নিষ্প্রভ দেহে শুয়ে আছে সেঁজুতি। শুকনো, ক্লান্ত চেহারা দেখে রুদ্রর অনুতাপ গাঢ় হয়। রাগের বসে একটু বেশিই অন্ধ হয়ে যাচ্ছিল সে! লাভের লাভ কী হলো? হয়রানি নিজেরও তো কিছু কম হয়নি।

১৬.
পরদিন সকাল।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে তৈরি হচ্ছে সেঁজুতি। সময় তখন সাড়ে নটা প্রায়। কিন্তু মেয়েটার পরিপাটি শরীরেও মনযোগ ভিন্ন কোথাও আটকে। কিছু অবিশ্বাস, মস্তিষ্কের প্রতি শিরায় শিরায় ছুটছে। এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না, কাল ওকে ওই বন্ধ কেবিন থেকে রুদ্র উদ্ধার করেছিল। শুধু কি তাই? ওই অত রাতে ওকে নিয়ে হাসপাতালে যাওয়া, চিকিৎসা করানো, হাসপাতালের সমস্ত দায়-দায়িত্ব সামলে তারপর না কি বাড়ি ফিরেছে লোকটা।

সেঁজুতির তো তখন হুঁশও ছিল না। সবকিছু আরিশার থেকে শোনা। এমন ধারণাতীত ঘটনা জেনে মেয়েটা বিস্ময়ে কতক্ষণ স্তব্ধ বনেছিল জানে না। ওই শয়তান লোকটা এত ভালো কবে হলো? তার থেকেও বড়ো প্রশ্ন, খোলা কেবিনে ও আটকে গেলই-বা কী করে? আর উনি কী করে জানলেন সেঁজুতি আটকে আছে?

সব প্রশ্ন প্রহেলিকার ন্যায় সেঁজুতির মাথার মধ্যে ঘোরে। অন্যমনস্কতায় ওড়নায় গাঁথতে যাওয়া পিনের মাথা ঢুকে যায় আঙুলে। কিছু চমকে ওঠে মেয়েটা। ব্যথায় হাত ছিটকে সরিয়ে আনে।

CamScanner

তক্ষুনি রুমে ঢুকল আরিশা। একটা ছোটো মেলামাইনের বাটি, আর এক কাপ চা সেঁজুতির সামনে রেখে গিয়ে বসল বিছানায়। সুশ্রী তরুণী গোমড়ামুখো আজ। সেঁজুতি আয়নার ভেতর থেকেই ওকে দেখে নিল একবার। কাল রাত থেকে মেয়েটা চটে আছে ওর ওপর। দোষ একটাই,

রুদ্র রওশন চৌধুরীই যে ওর বস, সেটা কেন জানায়নি সেঁজুতি!

ও চোখ নামিয়ে একবার খাবারগুলো দেখল। আরিশা নুডুলস রেঁধে এনেছে। ট্রের এক পাশে আবার ওষুধের পাতাও রাখা। সেঁজুতি মুচকি হাসল। ট্রে তুলে এগিয়ে এলো বিছানার দিকে। আরিশা মুখ গোঁজ করে বসে থাকে। ভুলেও ফিরে চায় না। সেঁজুতি বাটি হাতে নিয়ে বলল, "নে হাঁ কর। আমি খাইয়ে দেই।"

"আমার খিদে নেই। আপনি খান।”

সেঁজুতি ঠোঁট ফুলিয়ে বলল, "এমন করছিস কেন? এখানে আমার কী দোষ? আমি কি নিজে জানতাম যে, ওই বজ্জাতটার অফিসেই কাজ করব?"

আরিশা ফিরল এবার। রেগেমেগে বলল, "ঢং করিস না। যখন জানলি তখন বলিসনি কেন আমায়?"

"তুই চিন্তা করতি তাই।"

"বাহ দারুণ। কিছু বলার নেই।"

সেঁজুতি ক্লান্ত কণ্ঠে বলল, "আচ্ছা ভাই, সরি। আর কখনো এমন হবে না। কী করব বল, কানে ধরব? তাহলে তোর রাগ কমবে? এই দ্যাখ ধরছি!"

সেঁজুতি বলতে বলতে এক কান ধরল। আরিশার অভিমানের পালা নিচু হলো খানিক। তবে কণ্ঠে থমথমে ভাব বজায় রেখে বলল, "তা কোথায় যাওয়া হচ্ছে শুনি? ডাক্তার যে বলে দিয়েছেন তিনদিন টানা বেড রেস্ট নিতে। সেসব কী আপনি ভুলে গিয়েছেন?"

ও কণ্ঠ শৃঙ্গে তুলে বলল, "তিন দিন? তিন দিন কেন? এক ঘন্টাও যদি দেরি করি না, ওই রুদ্র রওশন চৌধুরী বাড়ির সামনে হেলিকপ্টার পাঠাবে আমাকে তুলে নিতে।"

CamScanner

সাথে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল সে। আরিশা মাথা নেড়ে বলল, "বুঝলাম। কিন্তু কীভাবে কী হলো বল তো। এত কিছুর পর করিম স্যার আবার ওনার কোম্পানিতেই কেন রেকমেন্ড করলেন তোকে? সেদিন অফিসে যা যা হয়েছিল, ওসব তো ওনার জানা কথা!"

সেঁজুতিও সমান মনঃস্তাপ নিয়ে বলল, "আমিও জানি না রে। ভাগ্যের ঢাকা এভাবে ঘুরেফিরে বারবার ওই রুদ্র রওশন চৌধুরীর কাছে নিয়ে আমাকে ফেলছে কেন কে জানে।"

"লোকটা কতটা খারাপ তা জানি না। তবে কাল অনেক ছোটাছুটি করতে দেখলাম তোর জন্যে। ওষুধ কেনার সময়টাও দেননি আমাকে। নিজে কিনে নিয়ে এসে হাতে ধরিয়ে দিয়ে গেলেন। তারপর হসপিটালের বিল-টিল সবকিছু। আর জানিস, বারবার ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করছিলেন ওনার জ্ঞান ফিরছে না কেন? কখন ফিরবে? বাঁচবে তো?"

সেঁজুতির সব মাথার ওপর দিয়ে যাচ্ছে। রুদ্রর সেই কটমট করা চিবুকের সাথে এই কথাগুলো একদমই মিলছে না। নিষ্পোষ্ঠ কামড়ে ভাবনায় ডুব দেবার আগেই সতর্ক চিত্তে উঠে দাঁড়াল। ব্যস্ত ভঙ্গিতে বলল, "আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে রে। তুই খে..."

কথার মাঝেই টুং করে ম্যাসেজ টোন বাজল আরিশার মুঠোফোনে।

বিঘ্ন আলাপের প্রমাণ রাখতে ফোনের স্ক্রিনে চাইল সে। গোটা গোটা অক্ষরগুলো দাঁড়িয়ে থেকেও স্পষ্ট দেখতে পেল সেঁজুতি। কেউ একজন ম্যাসেজ পাঠিয়েছে, "মিস আরিশা, আপনার বন্ধুকে বলে দেবেন, আগামী তিনদিন ওনার ছুটি। অফিসে যেন না আসেন।

~রুদ্র

অবাক চোখে মুখ তুলল আরিশা। সেঁজুতি ও একইরকম বিস্ময় নিয়ে চেয়ে। চোখের পাতাগুলো ফটাফট ঝাপটে গেল পাখিদের ডানার মতন। ঠোঁট নেড়ে হতাশের ন্যায় বলল, "এ আমি কী দেখলাম? ওই লোক সত্যিই এত ভালো?"

এরপরের দিন বড্ড তাড়াতাড়ি কেটে যাচ্ছে। যেন সময় তার গতি নিয়ে ভর করেছে চিলের পাখায়। এই চোখ বুজলেই রাত, আর মেলতেই কড়া সূর্যের হাত-পা মেলা রোদ্দুর।

আর এই কদিনে জীবনের মোড়ও রাতারাতি পালটে গেল আরিশার। সেদিনকার সেই শোয়ের গান তার আশার চাইতেও বেশি দর্শকপ্রিয়তা পেয়েছে। মিডিয়া জগতে নতুন এক সুন্দরী শিল্পী নিয়ে সোস্যাল মিডিয়া পুরোদস্তুর সরব।

এখন আর আরিশার একটা শোয়ের জন্য কারো ফোনের চিন্তায় ধন্যা ধরতে হয় না। বরং চ্যানেল থেকে একেকজন যেচে কল করে তাকে। সাপ্তাহিক শোয়ের রুটিন বদলে একদিন পরপর

CamScanner

রাখা হলো। আরিশার সুরেলা কন্ঠের হইচই চারদিকে। বাইরে গেলে সেলফি-অটোগ্রাফ নিতে ছুটে আসছে অনেকে। এত আনন্দের ভিড়েও মেয়েটার মাথায় ঘুরে বেড়ায় একটি নাম, "অভ্র"।

সেই মানুষটার সাথে সেদিনের পর আর কথা হয়নি। না আরিশার কাছে ওর ফোন নাম্বার আছে। তবে দেখেছিল আরেকদিন, ঠিক তার ভার্সিটির সামনে। কেন যেন দাঁড়িয়ে ছিল রাস্তার ওপাড়ে। আরিশার সাথে চোখাচোখি হতেই কেমন থতমত একটা ভাব করে পালিয়ে গেল দ্রুত।

ছেলেটার সাথে একটু যোগাযোগের জন্য আরিশার মনটা মরিয়া হয়ে উঠল। সাফল্যের সদ্য হাতছানিতে কেন যেন ঠিক করে গা ভাসাতে পারছিল না। সবেতে শুধু অভ্রকে মনে পড়ে। ওনার জন্যেই যে আজ ওর এত কিছু।

শেষমেশ আরিশা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল, সোজা বসুন্ধরার অফিসে চলে যাবে। ওখানে নিশ্চয়ই থাকবেন উনি!

মেয়েটা আর দেরি করেনি। পরদিনই সশরীরের অভ্রদের অফিসের গেইটের সামনে এসে দাঁড়াল। কিন্তু ভেতরে ঢোকার সাহস তো নেই। গতবার যা সব কাণ্ড হয়েছিল। রুদ্র না থাকলেও ওনার বাবা তো আছেন। যদি রেগেমেগে ওকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বার করে দেয়? ওরে বাবাহ, থাক।

আরিশা খুঁটির মতো দাঁড়িয়ে রইল বাইরে। মাঝেমধ্যে গলা উচিয়ে উকিঝুঁকি দিচ্ছিল। যদি অভ্র বের হয়।

ব্যাপারটা অনেকক্ষণ যাবৎ খেয়াল করলেন দারোয়ান। শেষে উঠে এলেন ভদ্রলোক। জিজ্ঞেস করলেন সরাসরি, "আপনার কি কিছু দরকার?"

প্রথম দফায় ঘাবড়ে গেল মেয়েটা। দুপাশে জোরে জোরে মাথা নেড়ে, পরপরই ওপর-নিচে ঝাঁকাল। মিনসে কন্ঠে বলল, "জি মানে, অভ্র স্যার আছেন অফিসে?"

"হ্যাঁ। আপনি কে?"

"ওনাকে একটু ডেকে দেবেন?"

"আপনি কে বলবেন তো।"

আরিশার কন্ঠে ইতস্তভাব। মুখাবয়বেও তাই। বলল, "আপনি ওনাকে গিয়ে আরিশা নাম বললেই হবে।"

CamScanner

ভদ্রলোক তীক্ষ্ণ চোখে ওর আপাদমস্তক দেখলেন এক বার। অভিজ্ঞ মস্তকে প্রথমেই হানা দিল 'গার্লফ্রেন্ড' শব্দটা। এসব আজকালকার ছেলেপেলেদের থাকতেই পারে। ঘাড় নেড়ে বললেন, "দিচ্ছি, অপেক্ষা করুন।"

চলে গেলেন উনি। আরিশা ছটফটে চিত্তে দাঁড়িয়ে থাকে। ওকে এখানে দেখে অভ্র কী মনে করবে কে জানে!

ঠিক দশ মিনিটের মাথায় বাইরে এলো অভ্র। পায়ে হেঁটে নয়, উড়ে এসেছে যেন। অমনি মেরুদণ্ড সটান করে দাঁড়াল আরিশা। অভ্রর মুখটা হাসিহাসি। তবে কণ্ঠে অবিশ্বাস নিয়ে বলল, "মিস আরিশা, আপনি এখানে?"

বলতে বলতে কাছে এসে দাঁড়ায় সে। আরিশা পূর্ণ দৃষ্টিতে একবার দেখে নেয় ওকে। উত্তরের বদলে পালটা প্রস্তাব ছুড়ল, "কফি চলবে?"

অভ্রর কিছুটা ভ্যাবাচ্যাকা খায়। বিষয়খানা তার কাছে অপ্রত্যাশিত। পরপরই হেসে বলল, "আচ্ছা, গাড়ি নিয়ে আসছি।"

আরিশা বলল, "আমিও যাই?"

"আসুন।"

দুজনে একই সাথে পার্কিং লটের রাস্তা ধরল। খুব কাছাকাছি, পা মিলিয়ে। যেতে যেতে হাত ছুঁইছুঁই হয় ওদের। অভ্রর প্রেমিক সুলভ মনটা বিস্তর লোভী হয়ে পড়ে। খুব করে চাইল, একবার হাত ধরবে আরিশার। কিন্তু থোকা থোকা ভয়, আর অধিকারের অভাবে পারল না।

ঠিক তক্ষুনি ওকে চমকে দিয়ে আরিশা নিজেই হাত ধরল। খসখসে আঙুলের ভাঁজগুলোয় গলিয়ে দিলো আঙুল। অভ্র হোঁচট খায়। থমকে দাঁড়ায় সহসা। আরিশার মধ্যে জড়তা নেই। তবে মেয়েলি কণ্ঠ নেমে এলো আরো, "একটা মেয়েকে প্রথম দেখে হাঁ করে চেয়ে থাকতে পারেন। অফিসের দুটো দিন লুকিয়ে-চুরিয়ে তাকে দেখতে পারেন। তার স্বপ্নের কথা জেনে, তা পূরণের জন্য উঠেপড়ে লাগতে পারেন। অথচ ভালোবাসার কথা? সেটা বলতে পারেন না?"

স্তম্ভিত অভ্র, কথা বলতে ভুলে বসল কিছুক্ষণ। চোখের পাতা অবধি নড়ল না। আরিশা হাসল। হাতের বাঁধন আরেকটু দৃঢ় করে বলল, "বলে দিন অভ্র, যা বলতে চান সব বলে দিন আজকে। সেসব শুনতেই তো এত দূর ছুটে এসেছি আমি।"

CamScanner

অভ্র ধাতস্থ হয়। চোখ নামিয়ে বুক ভরে শ্বাস টানে। তাকায় ফের। বলে দেয় সোজাসুজি, "আমি তোমাকে ভালোবাসি, আরিশা।"

অফিসের পাঁচিল ঘেঁষে যে জারুল গাছ দাঁড়িয়ে? তাতে দুটো চড়ুই ক্লান্তি কমাতে বসল কেবল। ঠিক মাটিতে দাঁড়ানো দুজন মানব-মানবীর এক হওয়ায় আনন্দে ডেকে উঠল ওরা। সেই ডাক মিশে গেল হাওয়ায়। সাথে প্রশ্ন এলো কোথেকে, "আর বাকি দুজন? তারা এক হবে না?"

১৭.

সময় চলছে। রেলগাড়ির মতো ঝুপঝুপ করে নয়, তার গতি দূরাকাশে উড়ে বেড়ানো চিলের মতন। স্বীয় মর্জির রাজাকে কখনো দমিয়ে রাখা যায়নি। সে পালটাবে। চোখের পলকে বদলে ফেলবে রূপ। ঠিক যেমন করে সেঁজুতির অফিসের এক মাস বড়ো আরামসে কেটে গেল। অথচ মনে হচ্ছে এই তো, সেদিন দিয়েছে ইন্টারভিউ। তবে এই সময় চলার পথে আর কিছু না হলেও, একটি বিরাট পরিবর্তন এসেছে গল্পে।

নাক উঁচু খ্যাত রুদ্র রওশন চৌধুরী, ইদানীং বড্ড নির্লিপ্ত থাকে। সেঁজুতিকে টুকিটাকি কাজের চাপ দিলেও মারাত্মক কোনো বাড়াবাড়ি করেনি। সেদিনের সেই ঘটনা তাকে একটা বিশেষরকম শিক্ষা দিয়ে গেছে। রাগের বশে প্রতিশোধ প্রবণতায় অন্ধ হয়ে মেয়েটিকে তো প্রায় মেরেই ফেলছিল। ঠিক সময় না এলে যদি সত্যিই মরে যেত? তখন বিবেকের কাছে কী জবাব দিত রুদ্র? সারাজীবনের জন্য একটা মানুষ খুনের দায় নিয়ে বাঁচতে হতো দুনিয়ায়। তাই মেজাজি মানুষটা সামলে রাখছে নিজেকে। আর এখানেই যত খটকা সেঁজুতির। আগে ওকে দম ফেলারও ফুরসত দেওয়া হতো না। সেখানে এখন প্রয়োজন ছাড়া তলব করে না রুদ্র। হঠাৎ কী হলো লোকটার? চৈতন্য ফিরছে? নাকি বদলে যাচ্ছে?

সেঁজুতির এসব ভাবনা মনেই থেকে যায়। দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার আগেই খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসে রুদ্রর সেই রূপ। ঠিক সেদিনের মতোই ছুটির আগে আগে তাকে ডেকে পাঠানো হলো। আর এক গাদা ফাইল সামনে দিয়ে হুকুম ছুড়ল অনুরূপ। সেঁজুতির মুখবিবরে ঘাবড়ে যাওয়ার ছাপ বসে অমনি। কাঁদো কাঁদো চেহারায় দেওয়ালঘড়ি দেখে নেয়। তক্ষুনি সেই গম্ভীর মানুষটা জানাল, "ভয়ের কিছু নেই, কাজ শেষ না হওয়া অবধি আমি আছি অফিসে। ইটস অ্যান ইমারজেন্সি, সেজন্যেই দিলাম।"

সেঁজুতি আশ্বস্ত হলো না। রুদ্রকে তার বিশ্বাস নেই। যে লোক পারলে ওকে মাটিতে ফেলে পা দিয়ে পিষে দেয়, সে কি বিশ্বাসযোগ্য? মনের কোনও এক কোনায় তীব্র আশঙ্কা হইচই বাঁধিয়ে উঠল। কেবিনে ফিরে কিছুক্ষণ অসহায় চোখে চেয়ে রইল ফাইলগুলোর দিকে।

CamScanner

যখনই আটটা বাজে, ধড়ফড়িয়ে গিয়েই কেবিনের দোর হাঁ করে খুলে রাখল সেঁজুতি। ওইদিন কীভাবে যে আটকে গেছিল। এবার কোনো রিস্ক নেওয়া যাবে না।

আজকের ফাইলের সংখ্যা কম। আর সবগুলোই দরকারি। এই ব্যাপারে কালকেই বড়োসড়ো প্রজেক্ট আছে কোম্পানির। ঘড়ির কাঁটা যখন দশটা পার হয়, তখন কলমের শেষ দাগ টানল সেঁজুতি। সব শেষ করে রুদ্রর কেবিনে উকি দিলো এক বার। এখনও লাইট জ্বলছে। বিস্ময়ে দুই ভ্রু উচল মেয়েটা। এর মানে, উনি সত্যিই যাননি? বাবাহ।

তারপর রয়েসয়ে টোকা দিল দরজায়, "আসব স্যার?"

ভেতর থেকে উত্তর আসে না। সেঁজুতি ভাবল দরজা হয়তো রিমোর্ট চেপে খুলবেন উনি। কিন্তু অনেকক্ষণেও এমন কিছু ঘটেনি। মেয়েটা খেই হারাল ধৈর্যের। ডাকল ফের। রুদ্র কোনো জবাবই দিচ্ছে না। ইচ্ছে করে করছে এমন, তাই না? অভদ্র লোক আর কীই-বা পারে?

সেঁজুতি বিড়বিড় করে মুখ বাঁকাল। অধৈর্য হয়ে একটুখানি দরজা ঠেলে উকি মারল ভেতরে। রুদ্র বসে চেয়ারে। কিছু একটা হয়েছে। টেবিলের ওপর ঝুঁকে রেখেছে মাথাটা।

এমন চিত্র বিরল। অন্তত এই এক মাসে সেঁজুতি কখনও দেখেনি। ও চোখ পিটপিট করল। গলা উচিয়ে ডাকল, "স্যার! স্যার?"

রুদ্র মুখ তুলে চাইল। স্বরের হাল অনুচ্চ, "আসুন।"

কন্ঠটা কেমন শোনাল না? চেহারাও কেমন কেমন লাগছে। সন্দিহান চেয়ে চেয়ে ভেতরে এলো সেঁজুতি। হাতের ফাইল সব শেল্ফে গুছিয়ে বলল, "কাজ শেষ। আমি কি এখন যাব?"

"যান।"

সেঁজুতির অদ্ভুত লাগছে সব। যেন কিছু একটা ঠিক নেই। নাহলে রুদ্রের সুন্দর মুখটার এমন বেহাল দশা কেন? যেতে যেতেও কয়েকবার পিছু ফিরল সে। কেবিনে এসে ব্যাগ গোছাল। লাইট অফ করল, জানলা আটকাল। সর শেষে যখন বের হতে যাবে, বাইরে ধপ করে আওয়াজ হলো কিছুর। সেঁজুতি ছলকে ওঠে ত্রাসে। একটুখানি মাথা তোলা আতঙ্ক পরপরই হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। আজ তো সে একা নেই। রুদ্রও অফিসে আছে। কিন্তু কীসের শব্দ ওটা?

কৌতূহলে ত্রস্ত পায়ে বাইরে এলো ও। আঁতকে উঠল অমনি। শক্তসমর্থ রুদ্র দেওয়াল ধরে বসে পড়েছে। হাঁপাচ্ছে শুধু।

CamScanner

সেঁজুতি ছুটে গেল, পাশে বসল ধড়ফড়িয়ে। উদ্বিগ্ন হয়ে বলল, "কী হয়েছে, স্যার? আপনার কি শরীর খারাপ করছে?"

রুদ্র ফ্যাসফ্যাস করে শ্বাস নেয়। উত্তর না দিয়ে উঠে দাঁড়াতে চাইল। একটু সোজা হতেই উলটে পড়ল আবার। অমনি নিজের সাথে আঁকড়ে ধরল সেঁজুতি।

"আপনার কি মাথা ঘুরছে, স্যার?"

রুদ্রর বাদামি কোটরে জল। কান্নায় নয়, অসুস্থতার তোপে। সেথায় ঝাপসাভাবে সেঁজুতিকে দেখা যায়। এত কিছুর পরেও ইগো দেখাতে ভুলল না। বাহুতে থাকা ওর হাতটা ঝটকা মেরে সরিয়ে দিয়ে বলল, "লিভ মি। আই ডোন্ট নিড ইওর হেল্প।"

সেঁজুতি নাক-চোখ কোঁচকাল। ঠিক হয়ে দাঁড়াতে পারছে না, অথচ ভাব ষোলোআনা। কিন্তু আজকে এই ভাব আমলে নেয়নি মেয়েটা। মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে উনি কতটা অসুস্থ! অসুস্থ মানুষের সাথে আবার কীসের রাগ? সরিয়ে দেওয়া হাতটা আবার রাখল সে। বলবান মানুষটাকে টেনেটুনে চেয়ারে বসিয়ে বলল, "এখানে একটু বসুন। আমি এক্ষুনি আসছি।"

রুদ্র বসে রইল। শ্বাস ফেলে, খুকখুক করে কাশতে কাশতে চেপে ধরল চেয়ারের হাতলটাকে। চোখের সামনে অন্ধকার নেমে আসছে। থিতিয়ে আসছে হার্টবিট। পায়ের জমিন দুলছে। এই হুটহাট স্যুগার আপ/ফল আজ নতুন নয়, আগেও হয়েছে। কেবল সে প্রস্তুত থাকে না এই যা!

সেঁজুতি দৌড়ে এলো পাঁচ মিনিটের মাথায়। একা নয়, সাথে দারোয়ান, ড্রাইভার দুজনেই এসেছেন। ওনারা ছুটে গিয়েই নিস্তেজ রুদ্রর বাহুর ভর কাঁধে তুলে নিলেন। একইরকম নিয়ে বসালেন গাড়িতে। সেঁজুতি পেছন পেছন ছোটে। রুদ্রর সাথে সাথে ভেতরে উঠে বসে। একটা অসুস্থ মানুষকে একা ছাড়ার মতো স্বার্থপর সে নয়। যতই অপছন্দের লোক হন! বিবেক সবার আগে।

অফিস থেকে ফ্ল্যাট কাছের পথ। জ্যাম পেরিয়েও পৌঁছাতে বেশি সময় লাগেনি। কিন্তু বিপত্তি বাঁধল রুদ্রকে নামানোর সময়। দারোয়ান গেইটেই রয়ে গিয়েছেন। আপাতত ড্রাইভার একা। দৈহিক গড়নে রোগা মানুষ তিনি। বলিষ্ঠ রুদ্রর ভার একা কাঁধে নেওয়া মুশকিল। তার কাঁচুমাচু ভাব মন পেরিয়ে চেহারায় ভেসে উঠল। সেঁজুতি বুঝে নেয়। উপায় হারিয়ে রুদ্রর এক বাহু পিঠ ছাপিয়ে কাঁধে রাখে নিজের। শক্ত বুকটার একাংশ লেপ্টে থাকে ওর নরম দেহের সঙ্গে। অস্বস্তি হয়,বাড়ে বিব্রতবোধ। রুদ্রর জ্ঞান আছে।নেতিয়ে গেলেও অনুভূতি যায়নি। সব বুঝলেও ঠোঁট নাড়ানোর শক্তিটুকুও নেই।

CamScanner

এটা উত্তরার ফ্ল্যাট। রুদ্রর সেবায় নিয়োজিত দুজন কাজের লোক ছাড়া আর কেউ থাকে না। দরজা খুলল তাদের একজন। পারভেজ। অল্প বয়সি ছেলে।

"স্যার অফিসে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। বাড়ির সবাইকে ডেকে দিন।"

পারভেজ রুদ্রকে এইভাবে দেখে চোখ বিকট করে ফেলেছিল। ধাতস্থ হলো এবার। মিনসে গলায় জানাল, "জি, মানে এই বাড়িতে তো স্যার একাই থাকেন, ম্যাডাম।"

সেঁজুতি আশ্চর্য বনে বলল, "আর বাকিরা?"

"ওনারা গুলশানের বাড়িতে।"

ড্রাইভার লোকটি ধমক দিলেন অমনি, "তাহলে দাঁড়িয়ে না থেতে স্যারকে ধরো। ওপরে নিয়ে যাই।"

"জি, জি।"

পারভেজ এলে সেঁজুতি ছেড়ে দিলো রুদ্রকে। ওনারা দুজন মিলে ওকে ঘরে নিয়ে যায়। শুইয়ে দেয় বিছানাতে। ড্রাইভার বেরিয়ে গেলেন এরপর। পারভেজ চলল ডাক্তার ডাকার কাজে। শুধু রুদ্রর বিশাল কক্ষে ওর সাথে থেকে গেল সেঁজুতি।

রুদ্র তখন নরম বিছানায় টানটান হয়ে শুয়ে। ও গোটা মানুষটাতে একপল চোখ বোলাল। নিরেট ফরসা মুখখানা রক্তলাল। নিটোল ওষ্ঠপুট শুকনো সাহারার মতন। সকাল থেকে তো সুস্থই ছিল। কী হলো হঠাৎ? এগিয়ে এসে পায়ের কাছে বসল। নিঃসংকোচে দামি ব্যুট জোড়া খুলে দিলো পা থেকে। মাথার নিচে বালিশ পাতল। এসি বাড়িয়ে তার শরীরটা ঢেকে রাখল কম্বলে। সবকিছু ঘোলা চোখে দেখেও স্পষ্ট বুঝেছে রুদ্র।

পারভেজ ডাক্তারকে ফোন করেছে। রুদ্রদের ঘরোয়া ডাক্তার উনি। এত রাত হলেও এক তলবেই ছুটে আসছেন ভদ্রলোক। এর মাঝে সেঁজুতি পারভেজকে দিয়ে শরবত বানিয়ে আনল। ভেবেছিল, ওকে দিয়েই খাওয়াবে। বিধিবাম! গ্লাস টেবিলে রেখেই কোনো কাজে চলে গেল ছেলেটা।

সেঁজুতি কিছু বলতে চেয়েও পারল না। বোকার মতো দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। সমুদ্র সমেত মনঃদ্বিধা নিয়ে গ্লাস হাতে তুলল তারপর। দোনামনা করে রুদ্রর কাছে গিয়ে ডাকল মৃদু স্বরে, "স্যার, শুনছেন?"

CamScanner

রুদ্র চোখ মেলে চায়। বড়ো ক্লান্ত সেই দৃষ্টি। বরাবরের হিংস্র দেখে আসা চাউনিতে আজ নিষ্প্রভতা ছেঁয়ে।
সেঁজুতির মায়া হয় ভীষণ।

বলল, "শরবতটা খেয়ে নিন, ভালো লাগবে।"

রুদ্রর গলা শুকিয়ে কাঠ। সত্যিই জলতেষ্টা পেয়েছে। বাধ্যের মতো উঠতে গেল, সহসা চক্কর কাটল মাথায়। টাল সামলাতে শক্ত করে বিছানার চাদর খামচে ধরল সে।

অমনি হুড়মুড়িয়ে পাশে বসল সেঁজুতি। নিজেই ধরে ধরে আধশোয়া করল ওকে। অস্বস্তিকে পাশে রেখে গ্লাস মুখের সামনে ধরতেই রুদ্র তাজ্জব বনে তাকায়। দ্রুতে বসে যায় দুর্বোধ্য কিছু ভাঁজ। পরপর সেঁজুতির দিক চেয়েই চুমুক বসায় গ্লাসে।

মেয়েটার হাত ভরতি জড়োতা। কুণ্ঠায় গাঁট হচ্ছে শরীর। ওপর ওপর শক্ত থাকার প্রয়াস করছে কেবল। গ্লাস ফাঁকা করে শ্বাস নিল রুদ্র।

সেঁজুতি টেবিলে গ্লাস রাখতে যায়, আচমকা গলগলিয়ে বমি করে দিলো। সব ছিটকে গিয়ে পড়ল মেয়েটার কাপড়ে, হাতে। ভরকে, থমকে একাকার হলো ও। বেকুব বনে রইল কিছুক্ষণ। একবার হাঁ করে দেখল নিজেকে। পুরো শরীর মেখে গিয়েছে। রুদ্রর দিক চাইতেও পারল না, দ্বিতীয় দফায় বমি করে গোটা বিছানা ভাসাল সে। চওড়া দেহ নেতিয়ে গিয়ে লেগে যেল বালিশে। চোখে তার সাফাই দেওয়ার চেষ্টা। ইচ্ছে করে করেনি, হয়ে গেছে বলতে চাওয়ার প্রয়াস। সেঁজুতি বুঝে নিল হয়তো।

মুচকি হেসে বলল, "সমস্যা নেই। আমি সব পরিষ্কার করে দিচ্ছি।"

রুদ্র আশ্চর্য বনে যায়। চিলের নজরে মেয়েটার একটু ঘৃণা ধরা পড়েনি।

এখানে সে থাকলে তো...

সেঁজুতি উঠে দাঁড়ায়। পরিষ্কার করলে লাভ হবে না। সমস্ত কাপড়ের সাথে নিজেকেও ধুতে হবে। তাহলে পরবেটা কী? আর বাড়ি ফিরবে কীভাবে?

CamScanner

সে "পারভেজ ভাই, পারভেজ ভাই" বলে ডাকল ক-বার। ছেলেটা জলদি হাজিরা দিলেও ওর অবস্থা দেখে কুঁচকে ফেলল নাকমুখ। বিছানায় শুয়ে থাকা রুদ্রর নজরে স্পষ্ট বিধল সেটুকু। কিন্তু সেঁজুতি। উনি তো এমন করেননি।

"ডেকেছেন ম্যাডাম?"

"এ বাড়িতে কি মেয়েদের কোনো পোশাক পাওয়া যাবে, ভাই?"

"মালতি আছে, ম্যাডাম। রান্নার কাজ করত। তবে সে তো বাসায় নেই এখন। দেখতে হবে কোনো কাপড় রেখে গেছে কি না। কিন্তু ওর পোশাক কি পরবেন আপনি?"

"আমার সমস্যা নেই। আমাকে কিছু একটা এনে দিলেই হবে।"

পারভেজ যেতে নেয়। সেঁজুতি বাধ সাধল আবার। রুদ্র যেভাবে বমি করেছে নিজের গায়ের কাপড়ও বাদ রাখেনি। সব পালটাতে হবে। এসব তো ও পারবে না। তাই বলল, "আপনাকে যেতে হবে না, ভাই। আপনি বরং ওনার কাপড়টা পালটে দিন। মালতির ঘর আমিই খুঁজে নিচ্ছি।"

পারভেজ মাথা কাত করল, "আচ্ছা।"

সেঁজুতি একটা সুতির থ্রিপিস পরেছে। মালতির স্বাস্থ্য ভালো হওয়ায় ওর ঢিলে হয়েছে খানিক। এর মধ্যেই ডাক্তার নিয়ে হাজির হলো পারভেজ। ভদ্রলোক রেহানের বন্ধু। রুদ্রর রোগের আগামাথা সবকিছু জানেন। গ্লুকোমিটারটা অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ করলেন তিনি। কন্ঠ গম্ভীর করে বললেন, "তুমি কি আজকাল স্যুগার কন্ট্রোল করছ না, রুদ্র?"

সেঁজুতি পাশেই দাঁড়িয়ে। বিস্মিত হয়ে বলল, "ওনার কি স্যুগার আছে!"

আখতার সাহেব ভ্রু কুঁচকে ফেললেন, "আপনি কে?"

সেঁজুতির উত্তর তৈরি, "জি, ওনার পিএ।"

ভদ্রলোক চশমার ওপর দিয়ে ওর আপাদমস্তক দেখে নিলেন একপল। মাথা নেড়ে বললেন, "ওকে। আপাতত যেহেতু ও বাড়িতে একা, তাই ওষুধটা আপনিই দেবেন। আর হ্যাঁ কোনোরকম মিষ্টি জাতীয় খাবার এলাউ করবেন না।"

CamScanner

ও ঘাড় কাত করল, "জি।"

"ও কি বমি করেছিল?"

"হ্যাঁ, দুবার।"

"আরো বমি হলেও হতে পারে। স্ট্রেস থেকে প্রেশারও বেড়েছে। তুমি যে কী করো, রুদ্র। এভাবে একা হাতে এত বড়ো দায়িত্ব নিয়ে বসেছ। বয়স, শরীর দুটোই দেখতে হবে তো না কি!"

রুদ্র কিছু বলল না। কথায় কথায় নাক ফোলানো লোকটা আজকে চুপচাপ শুয়ে আছে।

আখতার সাহেব নতুন করে ওষুধ লিখে দিলেন। যেতে যেতে সেঁজুতিকে বললেন, খেয়াল রাখতে।

রুদ্রর বিশ্রান্ত নজর তখন দেওয়ালঘড়ির ওপর। রাত ১টা বাজে। মেয়েটা এখনো এখানে কেন?

কোনোরকম ঠোঁট নেড়ে বলল, "আপনি বাড়ি যাবেন না?"

সেঁজুতি চুপ রইল একটু। যেন ভাবছিল কিছু। বলল পরপরই, "আপনার কাছে আরিশার ফোন নাম্বার আছে না, স্যার? একটু কথা বলব। ফোনটা দেওয়া যাবে?"

"আপনার ফোন নেই?"

সেঁজুতি মুখ কালো করে বলল, "না আসলে.."

রুদ্র আর কিছু শুনল না। ফোন প্যান্টের পকেটেই ছিল। পালটে দেওয়ার সময় টেবিলের ওপর রেখে গেছে পারভেজ। দুর্বল হাতে নিয়ে লক খুলে এগিয়ে দেয় সে। সেঁজুতি সোজা বারান্দায় চলে যায়। কথার শব্দ রুদ্র স্পষ্ট পাচ্ছে। সেই সাথে অমানিশা তেড়ে আসছে তার স্বচ্ছ চোখের পাতায়।

সেঁজুতি পিএ বলে পরিচয় দিলেও ঠিক বিশ্বাস করেননি আখতার। মাথার চুলগুলো তো আর এমনি এমনি পাঁকেনি। কোন পিএ অমন ঘরোয়া জামাকাপড় পরে অত রাতে তার বসের বাড়িতে থাকে?

CamScanner

ভদ্রলোক রেহানের বড়ো পুরোনো বন্ধু। রুদ্রর সাথে মেয়েলি এই ঘটনায় নিজেই হতবাক হয়ে গেছেন। ছেলেটাকে ছোটো থেকে চেনেন। এমন বেপরোয়া চরিত্রের তো সে নয়!

এই বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলাচলে নিজেকে বেশিক্ষণ টেকাতে পারেননি আখতার। রুদ্রর ফ্ল্যাট হতে বেরিয়েই সোজা কল দিলেন রেহানের নাম্বারে।

অত রাত! ভদ্রলোক সবে গা পেতেছেন বিছানায়। বিরক্ত হলেও বন্ধুর কল দেখে রিসিভ করলেন।

হ্যালো বলারও সময় দিলেন না আখতার। হড়বড় করে বললেন, "রেহান, আজকে রুদ্র অসুস্থ হয়ে পড়েছিল বুঝলে। ওর ফ্ল্যাট থেকেই বের হলাম কেবল। ভালো আছে এখন। তবে আমি যেটা তোমায় বলার জন্যে কল দিয়েছি সেটা হলো, সেখানে একটি মেয়েও আছে। মনে হয় তোমার ছেলের সাথেই থাকে।"

রেহান হোঁচট খান। রুদ্রর ফ্ল্যাটে মেয়ে? এত পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্যের মতো কথা। হতবিহ্বল হয়ে বললেন, “কী উলটা-পালটা বোলছ বলো তো আখতার। যে ছেলে বিয়ের নাম শুনলে চ্যাঁচিয়ে বাড়ি মাথায় তোলে, তার ফ্ল্যাটে মেয়ে?"

"আমি জানতাম তুমি বিশ্বাস করবে না। ইভেন আমি নিজেই তো অবাক হয়েছি। আর শোনো, মেয়েটি রুদ্রর ঘরেই ছিল। আমাকে পরিচয় দিলো ওর অ্যাসিস্ট্যান্ট বলে। আমি কী বোকা বলো। অত রাতে একজন পিএ তার বসের বাড়িতে আসে? নির্ঘাত গার্লফ্রেন্ড। না কি আমাদের না জানিয়ে ছেলের বিয়ে দিয়ে দিলে?"

আখতারের কথায় দুষ্টুমি। কিন্তু রেহান ভাবনায় পড়ে গেলেন। ভদ্রলোকের দৃঢ় কণ্ঠ নাড়িয়ে দিচ্ছে সন্দেহের অবকাশ। একটু চুপ থেকে বললেন, "মেয়েটির নাম কী, জানো কিছু"

"না। সে তো জিজ্ঞেস করিনি।"

"আচ্ছা, ঠিক আছে। আমি দেখছি।"

আখতার ফের রসিকতা করে বললেন, "ছেলে বিয়ে করলে কিন্তু মিষ্টি চাই, চৌধুরী।"

রেহান বিরক্ত হলেন এবার, "আহ, রাখো তো ফোন। আগে খবর নিতে দাও। বাপ হয়ে আমি নিজেই ছেলের বিয়ের মিষ্টি পাইনি আর তুমি আছ তোমার তালে। রাখো রাখো।"

CamScanner

লাইন কেটে ভদ্রলোক চিন্তায় পড়লেন বৈকি। কাজের এত চাপ! রুদ্র ওখানে বসে কী কারসাজি করছে খোঁজ নেওয়া হয়নি। ও কি নতুন করে অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাপোয়েন্ট করল? কিন্তু কখনো তো মেয়ে নেয়নি।

তাকে তো জানালও না কিছু! মেয়েটা কি সত্যিই পিএ? না আখতারই ঠিক বলল? রেহান ভেবে সময় খোয়ালেন না। দ্রুত ফোন করলেন উত্তরা অফিসের ম্যানেজারকে। দু-মিনিটে রিসিভ হতেই প্রশ্ন ছুড়লেন গতিতে, "রুদ্রর নতুন অ্যাসিস্ট্যান্টের নাম কী?"

আনুমানিক ভোর ছয়টা বাজে তখন। দূর হতে দোয়েলের মধুর কাকলি ছুটে আসছে ঘরে। রুদ্রর ঘুম ভাঙে। পাতলা কম্বলে তার গলা অবধি ঢাকা। কপালের ওপর বাইসেপসে ফোলা আড়াআড়ি হাত। চোখ মেলে পাশ ফিরতেই চমকে উঠল একদম।

ডিভানের ওপর গুটিশুটি মেরে ঘুমোচ্ছে সেঁজুতি। মাথায় বালিশ অবধি নেই। রুদ্র বুদ্ধিভ্রষ্টের ন্যায় চেয়ে থাকে। এলোমেলো মস্তকে কিছু ঢুকতে চায় না। এই মেয়ে এখানে কী করছে? পরপরই তড়াক করে উঠে বসল সে। হঠাৎ গত রাতের কথা মনে পড়তেই সতর্ক হলো দৃষ্টি। হাওয়ায় মেলাল কপালের ভাঁজ। বিহ্বল হয়ে ভাবল, "উনি কি বাড়ি যাননি? এখানেই থেকে গিয়েছিলেন?"

রুদ্র চট করে উঠে ডিভানের কাছে এলো। কী আরামে ঘুমোচ্ছে মেয়েটা। পেলব ডান হাতটা মাথার নিচে রেখে তুলোর বালিশ বানিয়েছে। কপালের ছোটো চুল দুলছে হাওয়ায়। রুদ্র এই প্রথমবার ভালো করে দেখল সেঁজুতিকে। তাও এত কাছ থেকে। বলাকার ন্যায় ভ্রুয়ের মাঝে দাঁড়িয়ে আছে একটা সরু নাক। দুটো পাতলা ঠোঁটের খাঁজ যেন শিল্পীর হাতে আঁকা পোট্রেট। গোলগাল মুখের সাথে থুতনিতে গাঢ় টোল বসেছে।

রুদ্রর দৃষ্টি পালটে আসছে বিমোহে। নিবেশন সরে আবিষ্ট রুপ নেয়। মুগ্ধতায় যেন ধাঁধিয়ে আসে চক্ষু।

নদীর মতো বইতে বইতেও ঝট করে নিজেকে সামলে নেয় সে। অমন চট করেই ফিরিয়ে আনে চোখ। গলা ঝেড়ে ডাকে, "মিস সেঁজুতি। মিস সেঁজুতি শুনছেন?"

সেঁজুতি নড়ে উঠল। মসৃন ললাট গুছিয়ে এলো রেখায়। চোখ মেলে রুদ্রকে দেখতেই উঠে বসল দ্রুত।

"আপনি ঠিক আছেন এখন?"

রুদ্র শুষ্ক ঢোক গিলল, "হুঁ। আপনি রাতে ফেরেননি যে? ড্রাইভারকে

বললেই তো বাড়িতে দিয়ে আসত।"

সেঁজুতি মাথা নোয়াল। যেন বিরাট অন্যায় করেছে। মিনমিন করে বলল, "না মানে, আসলে আপনি এত অসুস্থ, বাড়িতে নিজের বলতে কেউ নেই, তাই রয়ে গেছিলাম। যদি কিছু দরকার হয়!"

রুদ্র আশ্চর্য হলো। খুব আশ্চর্য। যতটা হলে অভিভূতিতে চোখের তীক্ষ্ণতা বদলে যায়। চেয়ে রইল স্তম্ভিত লোচন মেলে। মেয়েটা কি সত্যিই এত ভালো? সে-ই কি তবে ভুল করেছিল চিনতে?

সেঁজুতি উঠে দাঁড়াল। পাশ কাটিয়ে
ওয়াশরুমে চলে গেল নিশ্চুপ। রাতে বারান্দায় কাপড় নেড়ে দেওয়ায় শুকিয়ে গেছে। সেগুলোই পরে বের হলো এখন। কাঁধে ব্যাগ তুলে বলল, "আমি তাহলে এখন যাই, স্যার? আপনি নিজের খেয়াল রাখবেন।”

রুদ্র চুপ থাকতে চেয়েছিল। অথচ জিভ ফসকে বেরিয়ে এলো, "চলুন আমি দিয়ে আসছি।"

"না না, লাগবে না আমি.."

রুদ্রর তাকানোর ধরন দেখে চুপসে এলো মেয়েটা। বাধ্যের ন্যায় হাঁটা ধরল সামনে। গাড়িতে বসতে গিয়ে পড়ল আরেক বিপদে। রুদ্র ড্রাইভার না নিয়ে নিজেই ড্রাইভিংয়ে বসেছে। এখন সেঁজুতি কোথায় বসবে? পাশে বসলে যদি গায়ে লাগে ওনার। আবার পেছনে বসলে যদি ইগো দেখায়? উফ, সব
দিকে জ্বালাতন। রুদ্র ঘাড় ফেরাল তখন। কণ্ঠে নম্রতা নেই, "কী ব্যাপার, বসছেন না কেন?"

দোনামনা করে পাশের সিটেই উঠে বসল সেঁজুতি। রুদ্র হুইল ঘোরাতেই স্বস্তির শ্বাস ছাড়ল। যাক বাবা। কিছু মনে করেনি।

পুরোটা পথ কাটল নিশ্চুপতায়। একটা কথাও হয়নি দুজনের। গাড়ি থামল সেঁজুতির বাসা থেকে একটু এগিয়ে। পথে ঠিকানা ওই বলে দিয়েছিল। বোকা মেয়েটা তো আর জানে না, রুদ্র তার হদিস নেওয়ার সময় এসব বাড়ির ঠিকানা আগেই জেনে বসে আছে।

সেঁজুতি নেমে যাওয়ার সময় উশখুশ করল খানিক। বলতে চাইল, "এই অসুস্থ শরীরে অফিসে না গেলে হয় না?"

CamScanner

বলল না। যা ব্যবহার ওনার। ঠোঁট টিপে নেমে গেল। সামনে পা বাড়িয়েও থেমে গেল আবার। রুদ্র তখন শক্ত প্রস্তরের ন্যায় সিটে বসে আছে। চোখদুটো একভাবে রাস্তার বুকে গাঁথা। সে সময় খোলা জানলায় ঝুঁকে এলো সেঁজুতি। রয়ে সয়ে বলল, "একটা কথা বলতে পারি?"

রুদ্র ফিরল। অনুমতি দিলো না, মানাও করল না। চেয়ে রইল সুচালো চোখে। ও নিজে নিজেই বলল, "জানি এসব কথা বলার কোনো অধিকার আমার নেই। তাও বলছি। আসলে আপনার ঘরে বেশ কিছু মদের বোতল দেখলাম। আমাদের ধর্মে এসব মদ্যপান হারাম, স্যার। তার ওপর এগুলো স্বাস্থ্যের জন্যেও ভালো নয়। আমার মনে হয় আপনার এসব থেকে দূরে থাকাই উচিত।"

কথাটা বলে সেঁজুতি শান্তি পেলেও মন খিচে রইল এক্ষুনি রুদ্রর ফুঁসে ওঠা দেখতে। নিশ্চয়ই তেড়েমেরে বলবে, "হাউ ডেয়ার ইউ। এখন আপনি আমায় উচিত-অনুচিত শেখাবেন?"

তবে ওকে অবাক করে দিয়ে রুদ্র কিছু বলল না। হুইলে রাখা বাম হাতের ডায়ালের ঘড়িতে চেয়ে রইল শুধু। সেঁজুতি একটু স্বস্তি পায়। দীর্ঘশ্বাস ফেলে রাস্তা ধরে বাড়ির।

কালো রঙের গাড়িটা তার পেছনে পড়ে রইল। রুদ্র দৃষ্টি ফেলল ভিউ মিয়রের ওপর। স্পষ্ট সেঁজুতির প্রতিবিম্বতে ছেলেটা অনিমেষ চেয়ে থাকে। নিখুঁত নিবেশনে দেখে যায় এক রমণীর পিঠ ফেরানো বিদায়।

১৮.
সেঁজুতিকে নামিয়ে দিয়ে রুদ্র রওনা করেছিল অফিসে। মাঝপথেই হঠাৎ কল করলেন রেহান। গম্ভীর গলায় বললেন, "বসুন্ধরায় এসো, কথা আছে।"

রুদ্রর আসতে সময় লাগে। উত্তরা থেকে বসুন্ধরা তো কম পথ নয়। রেহান তখন কেবিনেই বসে। ভদ্রলোকের সুশ্রী আনন গভীর ভাবনায় ডুবছে। রুদ্র দরজায় টোকা দিলো। ধ্যান হতে নড়ে উঠলেন তিনি। কাচের বাইরে ছেলের বিম্ব দেখে বললেন, "এসো।"

রুদ্র লম্বা পায়ে ভেতরে ঢুকল। চেহারার দশা খুব গোছালো নেই। মাথার ছোটো চুলগুলো এক দিকে অবহেলায় পড়ে আছে। পরনে অবিন্যস্ত শার্ট। হাতে ঘড়িটাও নেই আজ। রেহান তাজ্জব হলেন বটে। ছেলের এমন এলোমেলো রূপ প্রথম দেখলেন জীবনে। রুদ্র তখন বাবার মুখোমুখি চেয়ারে বসেছে। জিজ্ঞেস করল ঠান্ডা গলায়, "বলো, কী বলবে?"

ভদ্রলোক নজর ফেরালেন। বিস্ময় পালটে আদলে ফেরত আনলেন গাম্ভীর্যের ছাপ। প্রশ্ন ছুড়লেন আচমকা, "তুমি কি সেঁজুতিকে ভালোবাসো?"

CamScanner

রুদ্র স্তব্ধ, বিস্মিত। থমকে রইল কিছু পল। অপ্রত্যাশিত প্রশ্নবাণ ঝাঁঝিয়ে তুলল কান। বিকল মস্তকে, অচল সকল স্নায়ু। সেঁজুতির পাশে 'ভালোবাসা' শব্দটায় কিয়ৎক্ষণ প্রস্তর বনে থাকল।

এমন কিছু সে আশা করেনি। কখনও না। আশা তো দূর, ভাবেওনি স্বপ্নে। যে রমণী তার রাগ-ক্ষোভের ডগায় দাঁড়িয়ে, সেই রমণীকে ভালোবাসা? এও সম্ভব? রুদ্রর রেগেমেগে চিৎকার করার কথা। নাক ফুলিয়ে বাবার ওপর চোটপাট দেখানো উচিত। কিন্তু অদ্ভুতভাবে কিচ্ছু হলো না আজ। বরং শান্ত নদীর মতো বসে রইল। একভাবে, একযোগে। অচপল নয়ন মেলে এই চেয়ে থাকায় রেহান তুষ্ট হতে পারেননি। প্রশ্নের বিপরীতে ছেলের হম্বিতম্বি আশা করেছিলেন তিনি। কিন্তু রুদ্র এত শান্ত। তবে কি উনিই ঠিক?

রুদ্রর চোখের পলক পড়েনি। শুধু ঠোঁট নেড়ে শুধাল, "হঠাৎ এই প্রশ্ন?"

"উত্তরটা হ্যাঁ/না-তে দিলে খুশি হব।"

রুদ্র চোখ ফিরিয়ে জানলার বাইরে ফেলল। খোলা আকাশের বুকে মিশে গেল তা। কেন যেন মনে হলো এই উত্তর ওর কাছে নেই। বরং চোখের পর্দায় ভেসে উঠল সেঁজুতির মেদুর মুখখানি। কত যত্ন নিয়ে ওর মাথায় জল ঢালছিল রাতে! বমি করার পর কী চোখ জুড়ানো হেসে বলেছিল, "আমি সব পরিষ্কার করে দিচ্ছি।"

রেহানের চাউনি তীক্ষ্ণ। ক্রমে তা প্রগাঢ় হয়। অধৈর্য কণ্ঠে বললেন, "কী হলো? উত্তর দিচ্ছ না কেন?"

রুদ্র সরাসরি বাবার চোখের দিকে চায়। জ্বিভে ঠোঁট ভিজিয়ে বলে, "জানি না।"

রেহান ভ্রু বাঁকালেন, "জানি না মানে? এটা কেমন কথা?"

"হঠাৎ সেঁজুতির কথা তুললে যে?"

"এছাড়া তো কোনো উপায় রাখোনি। সবকিছুই তো হঠাৎ হঠাৎই করছো। হঠাৎ তুমি বাড়ি ছেড়ে ফ্ল্যাটে গেলে, হঠাৎ এই অফিস রেখে উত্তরায় বসলে, হঠাৎ করেই সেই মেয়েকে চাকরি দিলে যে কিনা ভরা অফিসে একদিন তোমায় অপমান করে গেল। এসবের পেছনে তোমার আসলে কী উদ্দেশ্য, রুদ্র? আগের সব কথা কি ভুলে গিয়েছ?"

রুদ্রর খুব ছোটো জবাব, "ভুলিনি।"

CamScanner

"তাহলে? কেন সেঁজুতিকে নিজের অ্যাসিস্ট্যান্ট বানালে?"

"দরকার ছিল।"

"কী এমন দরকার? যে ওই মেয়েকেই নিতে হলো। তাও আবার এত বড়ো একটা পোস্টে? না কি তোমার ওর সাথে সত্যিই কোনো সম্পর্ক আছে?"

রুদ্র সূচালো চোখে চায়, "তুমি কি জবাবদিহি চাইছ, ড্যাড?"

"চাইতেই পারি।"

উঠে দাঁড়িয়ে গেল সে। মুখের ওপর বলল, "না। পারো না। তোমার ডুবে যাওয়া ব্যবসা আমি দাঁড় করিয়ে এই অবধি এনেছি, ড্যাড। এখানে তোমার চাইতেও আমার মেধা আর পরিশ্রম আছে। তুমি অফিসের প্রতিষ্ঠাতা হলে, আমি সেখানকার পরিচালক। এব্রি ফিউ সেকেন্ডস দিস ফলো মাই ইন্ট্রাকশন্স। অফিসের যেকোনো ব্যাপারে, যেকোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা আমি রাখি। তাই কাকে অ্যাসিস্ট্যান্ট করব, কাকে করব না এর জন্য কৈফিয়ত দেওয়ার আমি প্রয়োজন দেখছি না।"

*চৌধুরী বিস্ফোরিত কণ্ঠে বললেন, "একটা সামান্য ব্যাপার নিয়ে তুমি আমাকে খোঁটা দিচ্ছ?"

"সামান্য হলে তুমি এইভাবে আমায় ডাকতে না।"

পরপরই বলল, "আই নিড রেস্ট নাউ। আসছি।"

রেহান জড়ীভূত। রুদ্র হনহনে পায়ে কেবিনের দরজা অবধি যায়। পেছন থেকে প্রশ্ন ছুড়লেন তিনি, "তোমার উত্তর কি ধরে নেব, রুদ্র? হ্যাঁ নাকি না?"

রুদ্র নিরুৎসাহিত। একই জবাব দিলো, "জানি না।"

ছেলের প্রস্থানপথে কিছুক্ষণ থম ধরে চেয়ে থাকলেন ভদ্রলোক। রাসে কটমটিয়ে টেবিলের ওপর ঘুসি বসালেন পরপর।

রুদ্র তিতিবিরক্ত। গাড়ি স্টার্ট করল তপ্ত মেজাজে। "সেঁজুতিকে ভালোবাসো?" কেমন প্রশ্ন এসব? কী মানে এই প্রশ্নের? এমন প্রসঙ্গ উঠবেই-বা কেন?

CamScanner

হুইল ঘোরাতে গিয়েই হঠাৎ সতর্ক হলো সে। আচ্ছা রেহান অমন প্রশ্ন করলেও, উত্তরে সে 'জানি না' বলেছিল কেন? সরাসরি 'না' বললেই তো হতো। কেন বলল না যে আমি সেঁজুতিকে ভালোবাসি না?

রুদ্র এবারেও নিরুত্তর বনে থাকে। এই অবধি এসে চিন্তার সাথে থেমে দাঁড়াল পৃথিবী। শক্ত পিঠ সটান হয়ে পড়ল। কিন্তু রুদ্র মানতে নারাজ ঘনঘন মাথা নাড়ল, "না, এমন কিছু না।"

ঠিক সেই সময় খুব কাছ থেকে ভেসে এলো একটি সুমিষ্ট দূর। কলকণ্ঠের মতো বলছে, "আরে আস্তে চালান। অ্যাক্সিডেন্ট হবে তো।"

চকিতে পাশ ফিরল রুদ্র। চোখের ধাক্কা খেল সেঁজুতিকে গাড়ির ভেতর দেখে। এই তো পাশেই বসে মেয়েটা। ও চাইতেই পাখির নীড়ের মতো হাসল এক গুচ্ছ।

রুদ্র চমকে বলল, "আপনি! আপনি কী করে এখানে এলেন?"

সেঁজুতির মুখটা এগিয়ে আসে হঠাৎ। রুদ্র ভড়কে যায়। মাথা পিছিয়ে নেয় দূরুত্বে। মেয়েটা ফিসফিস করে বলল, "আমি তো আপনার মনে ঢুকে গেছি, চৌধুরী সাহেব। আলাদা করে আর আসতে হবে না আমায়।”

রুদ্রর সবকিছু থমকে যাচ্ছে। ঘুরছে আস্ত জগত। টের পেল বক্ষস্পন্দের থিতিয়ে আসা ভাব। সেঁজুতির হাসি এত সুন্দর? এত সুন্দর ওর চোখ? মৃগনয়নের পল্লবগুলো মধুসুখার পাখার মতন।

ঢোক গিলল সে। চোখ বুজে সামনে চেয়ে লম্বা শ্বাস ফেলল। যখন পাশ ফিরল আবার, বিস্ময়ে ব্যকুল হলো অমনি।

চট করে ব্রেক কষল গাড়িতে। এ কী, মেয়েটা কোথায়? এই তো পাশে ছিল। গোটা গাড়ির মধ্যে উদ্‌ভ্রান্তের ন্যায় খুঁজে বেড়াল রুদ্র। পেল না। পাবে কী করে? মন-মস্তিষ্কে দখল করা নারীকে সশরীরে থাকতে হয় না কি?

রুদ্র ক্লান্ত হয়ে সিটে মাথা হেলে দেয়। এসব কী হচ্ছে হঠাৎ? চোখের সামনে চেনা দুনিয়ার রুপ বদলাচ্ছে কেন?

তুরস্ত গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়ায় ছেলেটা। দরজায় ঠেস দিয়ে সিগারেট ধরায়। সাদা-কালো মিশেল ধোঁয়ার সাথে উবে দিতে চায় সেঁজুতির নাম।

CamScanner

তক্ষুনি পাশে এসে দাঁড়াল কেউ একজন। অনুনয় করল নম্র স্বরে, "দুইডা টাহা দেবেন ছার? ভাত খামু।"

রুদ্র ভ্রু কুঁচকে ঘাড় বাঁকাল। দ্বিতীয়বার চমকে গেল সহসা। বোকা বোকা ভাবে চোখ ঝাপটাল সেঁজুতিকে দেখে। ময়লা কাপড় পরে দাঁড়িয়ে আছে। হাতে স্টিলের বাটি। রুদ্রর বুদ্ধিশুদ্ধি খুইয়ে গেছে আজ। হাঁ করে বলল, "আপনি ভিক্ষে করছেন কেন?"

সেঁজুতি মুচকি হেসে বলল, "আমার তো একটা জিনিস চাই।"

"কী চাই?"

সেঁজুতি এগিয়ে আসে। সেই গাড়ির মতো কাছে ভিড়ে দাঁড়ায়। একইরকম স্বর নামিয়ে বলে, "আপনার ভালোবাসা চাই।"

রুদ্র কিংকর্তব্যবিমূঢ়। বুক কাঁপল সবেগে। টানটান মেরুদণ্ড বেয়ে চলল জলের রেখা। মূর্তি বনে আওড়াল, "ভালোবাসা?"

"ও ছার, দেন না। দেলে দেন, না দেলে যাই। হুদাই খারা করাই রাখছে আমারে।"

রুদ্র নড়ে উঠল একটু। ঘোর ভেঙে চাইতেই থতমত খেল। কোথায় সেঁজুতি। এ যে অন্য মেয়ে কোলে বাচ্চা নিয়ে দাঁড়িয়ে। উফ! ভ্রমে ডোবারও একটা সীমা থাকা উচিত। আচ্ছা জ্বালাচ্ছে তো মেয়েটা। এক রাত একটু সেবা করেই এমন বুক কাঁপাচ্ছে কেন?

রুদ্রর সহজ সবকিছু এলোমেলো লাগছে। এসব সে মেনে নিতে চায় না। ত্রস্ত পায়ে ছেলেটা গাড়িতে উঠে বসল। অবজ্ঞা পেয়ে মুখ কালো করল মেয়েটি। ভেংচি কেটে বলল, "নামেই বড়োলোক। কামে দেহো, পাঁচটা টাহা ভিইক্ষা দিতেও কইলজা পুইড়া যায়।"

রুদ্র চাকার এক টানে গাড়ি ধানমন্ডি থামিয়েছে। ব্যস্ত নগরীর চারপাশটা কোলাহলে ডুবে। ডানে-বামে কেবল গিজগিজে লোকজন। একেকজনের হাজারটা কথা, গাড়ি-ঘোড়ার প্যাঁপু শব্দেও রুদ্র পাথর বনে রইল। সকাল থেকে কী হচ্ছে এসব? যেদিকে তাকায় সেঁজুতি আসছে কেন? রুদ্র পোড়া সিগারেটের মাথাটা উচিয়ে চোখের সামনে ধরল। অবান্তর সব ভ্রমেরা পাখা মেলল আবার। কেন যেন মনে হলো জ্বলন্ত ওই সিগারেটেও সেঁজুতিকে দেখা যাচ্ছে।

CamScanner

রুদ্র চ-সূচক শব্দ করে। খিচড়ে আসে মেজাজ। শ্রান্তের ন্যায় মস্তক ঝুঁকে রাখে স্টিয়ারিংয়ের ওপর।

আচমকা যেন ভূতুড়ে কাণ্ড ঘটে। তেড়ে আসা বাতাসের সাথে কে যেন ফিসফিস করে বলে, "রুদ্র, এসবের মানে বুঝতে পারছ?"

ও মুখ তোলে। নীরবে উত্তর পাঠায়, "না। কী মানে?"

সেই অদেখা কিছু একটা জানিয়ে গেল চ্যাঁচিয়ে, "তুমি সেঁজুতির প্রেমে পড়েছ।"

রুদ্রর শক্ত বুকটা অমনি ধক করে উঠল। বিবশ হলো বাঁ পাশ। শুভ্র ত্বকে হীড়কচূর্ণের ছোঁয়ায় বলবান শরীরটা স্তব্ধ বনে রইল।
ঠোঁট নাড়াল জিজ্ঞাসায়, "প্রেমে পড়েছি?"

১৯.
অফিসে আজ বেতন দেওয়ার তারিখ। যার যারটা পৌঁছে গেছে তাদের অ্যাকাউন্টের নামে। কেবল বাদ পড়েছে সেঁজুতি। কেন? তাকে ছুটির আগেভাগেই তলব পাঠাল রুদ্র। অবশ্য ও বিরক্ত হয়নি। লোকটা আগের থেকে বেশ বদলে গিয়েছে কি না! খাটানোর ছুঁতোয় ডাকে না আজ কাল। কাজ থাকলে তবেই যেতে হয়।

সেঁজুতি এসে দাঁড়াতেই রুদ্র চুপচাপ ওর দিকে একটা খাম এগিয়ে দিলো। মেয়েটা প্রথমে বোঝেনি। প্রশ্নবিদ্ধ চাউনি নেভাতে রুদ্র নিজেই বলল, "আপনার স্যালারি!"

সহসা চোখের চাউনি থেমে গেল সেঁজুতির। কম্পিত হাত বাড়িয়ে খাম নিলো মুঠোয়। স্বচ্ছ কোটর ঝাপসা হলো গতিতে। তার জীবনের প্রথম উপার্জনের টাকা! সেঁজুতি খামের দিকে নিষ্পলক চেয়ে থাকে। রাঙা ঠোঁটে তৃপ্ত হাসির স্রোত।

আর এই পূর্ণ সুযোগটাই দুহাত পেতে লুফে নিয়েছে রুদ্র। দৃষ্টিজোড়ায় তার প্রণিধানের কমতি নেই। ওরা এক ভাবে চেয়ে দেখছে সামনে দাঁড়ানো মেয়েটিকে। ঘাড়ের এক পাশে ঝুলছে লম্বা একটা বেনুনি। লিপবামের স্পর্শে চকচক করছে ওষ্ঠপুট। পরনে সফেদ চুড়িদার। সাদামাটা সাজ, বরাবরের মতোই। অথচ রুদ্রর কাছে মেয়েটাকে রূপের রানি মনে হলো। এমন ধারালো সৌন্দর্যের থাবায় হাজারবার বুক পাতবে সে। মিটে যাবে মাটিতে। এই মেয়ে কি জানে, রুদ্র কী বাজেভাবে ফেঁসে গিয়েছে? সে কি জানে, পরশু রাত থেকে ওর ঘুম হচ্ছে না? জানলে কী করবে? হাসবে, না মজা নেবে?

CamScanner

সেঁজুতি তাকাতেই ঝড়ের বেগে চোখ সরাল রুদ্র। ফেলল ল্যাপটপের ওপর। ও হেসে বলল, “থ্যাংক ইউ, স্যার।"

উত্তরে না চেয়ে রুদ্র মাথা নাড়ল কেবল। সেঁজুতি রয়েসয়ে শুধায়, "আপনি দুপুরের ওষুধ খেয়েছিলেন, স্যার?"

শীতলতায় বুঁদ হওয়া চোখ তুলে চাইল রুদ্র। নির্ভেজাল হাওয়ায় তখন তোলপাড় ভেতরে। জানাল সংক্ষেপে, "না।”

সেঁজুতি কিছু বলে নি। নিশ্চুপ বেরিয়ে গেল। মিনিট খানিক বাদেই দরজায় এলেন বশির। হাতের ট্রেতে স্যান্ডউইচ আর ফলের রস। রুদ্র কপালে ভাঁজ ফেলে বলল, "এসব কেন এনেছ?"

বশির সোজা হলেন। ভয়ে ভয়ে বললেন, "সেঁজুতি ম্যাডাম পাঠালেন, স্যার। বললেন এগুলো খেয়ে আপনাকে ওষুধ খেয়ে নিতে। এক বেলা মিস করেছেন, এক বেলা মিস যাতে না হয় তাই।"

রুদ্রর বুকটা জুড়িয়ে গেল। ভরে এলো শান্তিতে। মুখবিবরে গম্ভীরতা ধরে রেখে বলল, "ঠিক আছে। যাও তুমি।"

এপাশ ফিরে হাঁপ ছাড়লেন বশির। আতঙ্কে তার প্রাণটা গলায় আটতে ছিল। ম্যাডামের হুকুম মেনে এসেও ভীষণ ভয়ে ছিলেন, এক্ষুনি স্যার রেগেমেগে সব উলটে দেবে ভেবে। কিন্তু এমন কিছু হয়নি দেখে তাজ্জব হলেন খানিক!

বস কি আজকাল শান্ত হচ্ছে? কাউকে অকারণে ধমকায় না, ঘাটায় না। কী হলো কে জানে।

স্যান্ডউইচে কামড় বসিয়ে চোখ বুজল রুদ্র। এই মেয়েটার সব দিকে খেয়াল আছে। কী কেয়ারিং! এমন কেয়ারিং, যত্নশীল বউই তো ওর চাই।

রুদ্র বাঁ হাতে ল্যাপটপের বাটন টিপল। বেরিয়ে এলো সেঁজুতির কেবিনের ফুটেজ। ব্যাগ গোছাচ্ছে মেয়েটা। চলে যাবে এখন। ব্যস্ততাতেও কী দারুণ লাগছে না দেখতে? ঠিক যেন একটা জ্বলন্ত প্রদীপশিখা। রুদ্রর ঘুটঘুটে তিমির ঘেরা সন্ধ্যেতে এক আলোয় ভরা প্রদীপ!

শুক্রবার! সাপ্তাহিক ছুটির দিনের কথা। আরিশার গানের রেকর্ডিং থাকায় শপিংমলে একাই এসেছে সেঁজুতি। তার জীবনের প্রথম রোজগারের টাকা দিয়ে সে সবার জন্য কেনাকাটা করবে। মা, বাবা, ইতি আরিশা-সবার জন্য দু-ঘন্টা বসে কিছু না কিছু কিনেছে সেঁজুতি। দুহাত ভরতি শপিংব্যাগ নিয়ে বাইরে এলো তারপর।

CamScanner

'এই মামা' বলে ডাকতেই একটা রিকশা ছুটে এসে পায়ের কাছে থামল। যখনই উঠে বসতে যাবে, কোথেকে এসে হাতটা খপ করে চেপে ধরল রাফিন। ভূত দেখার মতন চমকে ওঠে সেঁজুতি। রাফিনের চোখে বহ্নি। তপ্ততার আঁচ ঠিকড়ে দিলো বাক্যে, "এসো।"

আর কোনো কথা নয়। হাতটা ধরেই টান বসায় সে। সেঁজুতির চটক কাটল। মুহূর্তে হাত মুচড়ে বলল, "কী করছ? কোথায় নিয়ে যাচ্ছ আমাকে।'

রাফিন জবাব দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করে না। টেনেটুনে গাড়ির সামনে নিয়ে আসে। হুকুম ছোড়ে, "ওঠো।"

"সেঁজুতি খেই হারিয়ে বলল, "হাত ছাড়ো, রাফিন। খুব খারাপ হবে কিন্তু।

রাফিন পালটা হুংকার ছুড়ল, "খারাপ কাকে বলে সেটা তো তুমি দেখবে, সেঁজুতি। এখন কোনো সিনক্রিয়েট করো না। যথেষ্ট হয়েছে। কষ্ট করে মাথাটাকে ঠান্ডা রাখছি, নাহলে কিন্তু একটা বাজে কিছু করে ফেলব বলে দিলাম।

সেঁজুতি চটে বলল, "কী করবে? মারবে?"

রাফিন দাঁত চেপে বলল, "দরকার পড়লে তাই করব। অনেক জ্বালিয়েছ। অনেক সম্মানও খুইয়েছি তোমার জন্য। আজ আর রেহাই পাবে না, সেঁজুতি। চলো, এক্ষুনি বিয়ে করব তোমায়।"

সেঁজুতি আঁতকে বলল, "না, আমি তোমায় বিয়ে করব না।"
"তোমার করার দরকার নেই। আমি করলেই চলবে। এসো তো।"

সেঁজুতি হাত মোচড়ায়। চেষ্টা করে ছুটতে। লাভের লাভ হয় না। আশেপাশের মানুষগুলো তখন তামাশা দেখায় ব্যস্ত। গাড়ির ভেতর সাগর বসেছিল। সেঁজুতির অপর হাতটা টেনে ধরল সে। ভয়ে, অসহায়ত্বে কেঁদে ফেলল মেয়েটা।

ঠিক তখনই রাফিনের কাঁধের ওপর কারো শক্ত থাবা পড়ে। থামল ওরা। ঘুরে চাইল রাফিন।

পরিচিত মুখটা দেখেই সেঁজুতির ফ্যাকাশে মুখটা ঝলকে ওঠে সাহারায়। যেন প্রাণ ফিরেছে দেহে। মানুষটার বাদামি দৃষ্টি একপল দেখল ওকে। পরপর রাফিনের দিক চাইল। হুকুম ছুড়ল নিরেট স্বরে, "ছাড় ওকে।"

CamScanner

অচেনা লোকের এমন রুক্ষ ব্যবহারে রাফিন ভড়কে যায়। সাগরের সাথে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে এক বার। ছেলেটা নেমে দাঁড়াল গাড়ি থেকে।

প্রশ্ন করল কড়া গলায়, "এই কে আপনি? আমাদের ব্যাপারে নাক গলাচ্ছেন কেন?"

রুদ্র ঠান্ডা চোখে রাফিনকেই দেখছে। সাগরের প্রশ্ন যেন শরীরও ছুঁলো না। পূনর্বার বলল, "সেঁজুতিকে ছাড়।"

রাফিনের মেজাজ বিগড়ায়। ঢোক গিলতে থাকা সেঁজুতির হাতটা আরো চেপে ধরল জেদে। কণ্ঠে তেজ, "ছাড়ব না, কী করবি?”

কথায় দাঁড়িও পড়েনি আচমকা ওর ঠোঁটের ওপর দড় ঘুসি বসাল রুদ্র। প্রহারের তোপে রাফিন ছিটকে গেল দূরে। সেঁজুতি আতঙ্কে নিজের মুখ চেপে ধরল।হকচকায় সাগর। ভিতুর ন্যায় চট করে পালিয়ে যায় দৌড়ে। রাফিন ধাতস্থ হয়ে ফিরতেও পারল না, রুদ্র বুক বরাবর প্রকাণ্ড লাথি মারল। পাতার মাতা উড়ে গিয়ে পিচের বুকে লুটিয়ে পড়ল সে। ঠোঁট, নাক কেটে ছুটে আসে রক্ত। সেঁজুতি স্তম্ভিতের তোপে তুষার হয়েছিল। হুঁশ ফিরতেই দৌড়ে যায়। টেনে ধরে রুদ্রকে।

"স্যার, ছাড়ুন। ছাড়ুন, কী করছেন? ও মরে যাবে।"

বলিষ্ঠ যুবক সরল না। তার কথা শুনলো অবধি না। সেঁজুতি দিশাহারা হয়ে পড়ে। রুদ্রর নিষ্ঠুর ব্যুটের লাথিতে নেতিয়ে আসছে রাফিন। বুকের ওপর পরপর ঘায়ে মুখ থেকে ঠিকড়ে আসছে রক্ত। সেঁজুতির মাথা চক্কর কাটল। 'স্যার ছাড়ুন' বলে জোরে কেঁদে ফেলল। রুদ্র শুনেছে? হয়তো শোনেনি। ক্রোধে থরথরে সুঠাম দেহটা রাফিনকে আঘাত করতে বহাল। আশেপাশের লোকজন দাঁড়িয়ে আছে। বিস্মিত বনে দেখছে সব। এগিয়ে এসে রাফিনকে ছাড়িয়ে নেওয়ার মতো সাহস দেখায় না কেউ।

সাগর ফিরে এলো পনের মিনিটের মাথায়। সাথে দুজন লোক।

হুড়মুড়িয়ে ছুটে এলো সবাই। পেছন থেকে আষ্টেপৃষ্ঠে জাপটে ধরল রুদ্রকে। ছেলেটা তখন উদ্‌ভ্রান্ত, মত্তের ন্যায় মারছিল। কোনোরকমে টেনেটুনে সরাল ওকে। রাফিন খুকখুক করে কাশছে। লেপটে গেছে রাস্তায়। পরিস্থিতি প্রতিকূলে থাকায় কোনোমতে তাকে গাড়িতে তুলেই হাওয়া হলো ওরা। রুদ্র হিসহিস করছে সমানে। ধোঁয়া ওড়ানো গাড়ির দিকে তপ্ত নয়নে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। দাঁত পিষে বিড়বিড় করল, "সেঁজুতিকে ছুঁয়েছিস, এত বড়ো সাহস!"

CamScanner

হুট করে তার বাহু টেনে নিজের দিকে ফেরাল সেঁজুতি। চেতে একাকার হয়ে বলল, "সমস্যা কী আপনার? এভাবে মানুষ মানুষকে মারে?"

"আপনার গায়ে হাত দিয়েছে ও। ওকে তো পুঁতে ফেলা উচিত ছিল।"

সেঁজুতি নাক ফুলিয়ে বলল, "সেটা আমি বুঝব। আপনি কেন ঝামেলায় জড়ালেন?"

রুদ্রর বক্ষপট উষ্ণ শ্বাসের তোপে ওঠানামা করছে। ফোঁসফোঁস করল সাপের ন্যায়, "জড়িয়েছি, আরো জড়াব। কেউ আপনার গায়ে একটা নখস্পর্শ করলেও আমি তাকে ছাড়ব না।"

সেঁজুতি আশ্চর্য বনে বলল, "কেন? তাতে আপনার কী? আপনি তো চানই আমি কষ্ট পাই। আপনি তো চান আমি যন্ত্রনা পাই।"

রুদ্রর নিরেট চোয়াল বদলে গেল অচিরে। পালটে এলো চাউনি। কন্ঠ নামিয়ে বলল, "চাই না, চাইতাম। কিন্তু সেই আমি আর এই আমিতে যে আজ বিস্তর ফারাক, সেঁজুতি।"

ও বুঝতে না পেরে বলল, "মানে?"

রুদ্র হুট করে কাছে চলে আসে। যেমন ঘনিষ্ঠতায় শ্বাস-প্রশ্বাস যুদ্ধে লিপ্ত হয়! মেয়েটা তাজ্জব হলো। চেয়ে রইল প্রকট চোখে। চারপাশের উৎসুক জনসমাগম ভুলে গেছে রুদ্র।

আর্ত চোখ ঠিক সেঁজুতির চোখে রেখে বলল, "আমি আপনাকে ভালোবেসে ফেলেছি!"

পিলে সুদ্ধ চমকে ওঠে মেয়েটার। দিঘল কালো পল্লবে ঘূর্ণিঝড় বয়। ঠকঠক করে ওষ্ঠপুট। স্তব্ধ হয়ে বলল, "কী বললেন!"

রুদ্রর নিষ্পাপ স্বীকারোক্তি, "আমি আপনাকে ভালোবাসি। আমার আপনাকে দরকার, সেঁজুতি। এই নিঃসঙ্গ জীবনে আপনার মতো সুন্দর মনের একটা মানুষ আমার চাই। যে কি না বিপদে তার শত্রুকেও আপন করতে জানে।"

সেঁজুতির বিস্ময় শেষ। দুধারের চিবুক শক্ত দেখায় হঠাৎ। তৎক্ষণাৎ দুহাত দিয়ে রুদ্রকে ধাক্কা মারল সজোরে। অপ্রস্তুতিতে পিছিয়ে গেল সে। সেঁজুতি চোখের ঘৃণা উগড়ে দিলো কথার বাণে, "সব পুরুষ এক। চরিত্রের দিক থেকে আপনাকে ভালো ভেবেছিলাম, কিন্তু বেলাশেষে আপনিও তাই।"

CamScanner

আর এক মুহূর্ত দাঁড়াল না সে। চলে গেল হনহনে পায়ে। পেছনে ঠায় দাঁড়ানো পুরুষটির মলিন মুখটাতে ফিরেও চাইল না একবার। বর্বর মানবীটির প্রস্থান পথে নির্নিমেষ চেয়ে রইল রুদ্র। সেঁজুতি এত সহজে তার হবে না জানত। দুজনের অতীত তো সুমধুর নয়। অথচ তাও সরাসরি অবজ্ঞার তির প্রেমিকের ঠিক বুকে গিয়ে বিঁধে। ধেয়ে আসে সুপ্ত এক ঘূর্ণিঝড়। যে ঝড়ে তুফান নেই। জোরালো হাওয়ার খবর নেই।

শুধু কাঁপুনি ওঠে হৃদয়ে। থরথর করে গোটা পৃথিবী দুলে উঠলেও বাইরের কেউ কিচ্ছুটি বুঝতে পারে না।

২০.

সেঁজুতি যথেষ্ট এক্সট্রোভার্ট স্বভাবের মেয়ে। যেখানে থাকে মাতিয়ে নিতে দু- সেঁজুতি লাগে না। বুকের কেশ খুব সহজে মুখের হাসিতে চাপা দিতে পারে। সেই মেয়ে আজ বাসায় ফেরা থেকে চুপচাপ বসে আছে। থমথমে বদনে এক ফোঁটা হাসি নেই। হুঁ, হাঁ ছাড়া উত্তর করছে না। আরিশা অনেকক্ষণ ধরে খেয়াল করে, এবার পাশে বসল গিয়ে। জিজ্ঞেস করল, "কিছু হয়েছে তোর?"

সেঁজুতি মাথা নাড়ল দুপাশে।

"তাহলে এমন মুখ গোমড়া করে আছিস কেন? আচ্ছা, ওই রুদ্র রওশন কি আবার কোনও নতুন অশান্তি করেছেন?"

সেঁজুতি হাঁ করতে গেলেই সাবধান করল চড়া গলায়, "একদম মিথ্যে বলবি না। যে লোকের অফিসে কাজ নিয়েছিস, ওনাকে আমি হাড়েহাড়ে চিনি। উনি এখন তোকে হাতে পেয়ে সেদিনের শোধ ইচ্ছেমতো মিটিয়ে নিচ্ছে, তাই না?"

উত্তর জানতে আরিশা আগ্রহী হলো। উৎসুক মেয়ের নেত্রমণি। সেঁজুতি চিবুক ঠেকাল গলায়। আস্তে করে বলল, "উনি আজ আমাকে প্রোপোজ করেছেন।"

বিষম খেল আরিশা। কেশে-টেশে একাকার করে ফেলল সব। সেঁজুতি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। ছুটে গিয়ে গ্লাসে পানি নিয়ে আসে। হাতে নিয়ে ঢকঢক করে খেল আরিশা। কোনোরকম ধাতস্থ হওয়ারও সময় দিলো না নিজেকে। ভীষণ বিস্ময়ে চোখ বড়ো বড়ো করে বলল, "কী, কী বলছিস? এসব সত্যি?"

ফোঁস করে শ্বাস ঝাড়ল সেঁজুতি। কথাটা শুনলে আরিশার এমন অবস্থা হবে জানত। তার নিজেরই তো বিশ্বাস হয়নি প্রথমে।

CamScanner

আরিশা ধড়ফড় করে কাছে এগিয়ে আসে। ওর হাত ঝাঁকিয়ে বলে, "কী রে বল না! উনি সত্যিই তোকে প্রপোজ করেছেন?"

"তবে কি বানিয়ে বলছি?"

অমনি মেয়েটা হা-হুতাশ করে উঠল, "মানে কী ভাই? আমি তো ভাবতেই পারছি না। উনি কেন তোকে, কীভাবে, মানে হাউ? যে লোক সামান্য চেয়ারে পিরিয়ডসের ব্লাড দেখে চেয়ার ভেঙে ফেলল, কত কী বলে অপমান করল তোকে। সেই মানুষ...! আমার মাথায় তো কিছুই ঢুকছে না।"

সেঁজুতি চুপটি করে রইল। চোখের পর্দায় ভেসে উঠল সেদিনের সমস্ত কথা। ভরা দপ্তরে রুদ্রর জন্যে লজ্জায় মিশে যাওয়া মাটিতে। পঞ্চাশের অধিক পুরুষের সামনে যা নয় তাই শোনা। কানের কাছে বেজে চলল সেই কথাগুলি, "এই রাস্তার মেয়েকে অফিসে এনে তুমি অফিসটাকে নোংরা বানিয়ে ফেলেছ, ড্যাড।"

সেঁজুতি চোখ বুজে ঢোক গিলল। ফের আরেকবার মানহীনতার কাঁটা নির্মমভাবে বিঁধে রইল গায়ে।

আরিশা মনযোগ দিয়ে ওর মুখখানা দেখে। দুষ্টুমি করে বলে, "তা কী ভাবলি? রাজি হবি, না কি হবি না? ছেলে কিন্তু সুন্দর, ভাই! চাইলে একটু ট্রাই করতে পারিস।"

রেগে যাওয়ার বদলে কাঠ হাসল সেঁজুতি। কণ্ঠে মলিনতা, "ন্যাড়া বেলতলায় একবারই যায়, আরিশা। যে ভুল করেছি, সেটার পুনরাবৃত্তি চাই না আর। তাছাড়া অমন অহংকারী লোককে নিজের জীবনে ডাকা মানে নিজের পায়ে নিজের কুড়াল বসানো।"

আরিশা নিজেও মাথা দোলাল। ঠিক তাই। রুদ্র রওশন চৌধুরীর মতো খচ্চর লোক সে এই জীবনে দুটো দেখেনি। কথা বলার সময় একটু হাসে অবধি না। এই ব্যাটাকে যে হাসতে দেখবে সে পৃথিবীর সবচেয়ে ভাগ্যবান। অথচ অভ্র! ওনার ভাই হলেও কী হাস্যোজ্জ্বল ছেলেটা। কত ভালোবাসে ওকে। আগলে রাখে। আরিশা বুক ফুলিয়ে শ্বাস নেয়। অভ্রর কথা মনে পড়তেই দুধারের গাল ফেঁপে ওঠে কুণ্ঠায়। বক্ষের দুধ-সাদা স্রোত বয় সুখের। ফোন হাতে নিয়ে উঠে গেল সে, প্রিয় পুরুষের কণ্ঠ শোনার আশায়।

সেঁজুতি তখনও একই রকম বসে। মাথার ভেতর রুদ্রর কথা ঘুরছে।

CamScanner

কাল থেকে আবার অফিস। ওই লোকটার সাথে আবার কাজ করা। আজকের পর কী করে মুখোমুখি হবে ওনার? অস্বস্তি হবে না?

হলোও তাই। অফিসে আসার পর থেকে সেঁজুতি রুদ্রর সঙ্গে কথাই বলতে পারছে না। চোখ তুলে তাকাতে অবধি কষ্ট। শরীর চুর করা জড়োতা নিয়ে ধোঁয়া ছোটা কফিমগটা ওর সামনে এনে রাখল কোনওরকম। তুরন্ত হাতখানা চেপে ধরল রুদ্র। সেঁজুতি ভড়কে চাইতেই মিটিমিটি হাসল। মেয়েটা রাগের বদলে বিহ্বল হয়।

এই প্রথম লোকটার লালচে ওষ্ঠপটে হাসি দেখল বলে। ওনাকে হাসলে এত সুন্দর লাগে? তক্ষুনি ভ্রু উচাল রুদ্র, "একটা কথা বলব?"

সেঁজুতি হ্যাঁ-না বলল না। দুচোখ ছাপানো বিমোহে।

"কী দেখছেন?"

মেয়েটা নড়ে ওঠে। থতমত খেয়ে চোখ সরায়। গলা খাঁকারি দিয়ে শুধায়, "কী কথা?"

রুদ্র কন্ঠ খাদে নামিয়ে বলল, "ভালোবাসি!"

সেঁজুতি জড়বুদ্ধি হয়ে গেল। খেয়াল পড়ল হাতের দিকে। হাত ফেরত আনতে চাইলে আরো আকড়ে রাখল রুদ্র। ও রেগে বলে, "কেমন ধরনের অভদ্রতা এসব?”

"কেন? ভালো লাগেনি শুনতে?" রুদ্রর সরল প্রশ্ন। সেঁজুতি মুখের ওপর বলল, "না। যার মন সুন্দর নয়, তার মুখে কোনো কিছু মানায় না। হাত ছাড়ুন।"

রুদ্র ছাড়ল না। উলটে কব্জি উলটে পালটে দেখে বলল, "এই হাত একদিন রোজ সকালে আমায় ঘুম থেকে তুলবে। বলবে, শুনছেন। উঠুন.... সকাল হয়েছে। তারপর এইভাবে কফি এনে রাখবে আমার সামনে। সেদিন কিন্তু কফিটা আমি একা খাব না। আমরা দুজন এক..."

এটুকু বলতেই সেঁজুতি ঝাড়া মেরে হাত নিয়ে এলো। চোখমুখ লাল করে বলল, "আপনার চরিত্র ভালো ভেবে একেবারেই ভুল করেছি। আপনি অহংকারী তো বটেই সাথে অসভ্য একটা লোক!"

রুদ্র চমৎকার হেসে বলল, "আপনার প্রেমে!"

CamScanner

সেঁজুতি ভ্যাবাচ্যাকা খায়। ঠোঁট দুটো ফাঁকা করে ফেলে। তাজ্জব হয়ে ভাবে, এই কি সেই লোক যার গাড়ির কাচ ভাঙায় একদিন তার পায়ের কাছে টাকা ছুড়ে দিলো?

কেবিনে ফিরে কেদারায় ধপ করে বসে পড়ল সেঁজুতি। রাগ, চিঙা, অস্বস্তিতে তার মাথা ফেটে যাচ্ছে। এখন তো মনে হচ্ছে সেই আগের রুদ্রটাই ভালো ছিল। বেশি বেশি কাজ দিত, জুলুম করত, সহ্য হতো ওটা। কিন্তু এখন কী শুরু করেছে এসব? সেঁজুতি না পারছে ঠিক করে কিছু বলতে, না পারছে চাকরি ছেড়ে চলে যেতে। উফ!

দরজায় টোকা পড়ল তখন। অনুমতি চেয়ে ঢুকলেন বশির। হাতের প্যাকেটটা টেবিলে রেখে বললেন, "বস পাঠিয়েছেন, ম্যাডাম।"

তারপর চলে গেলেন তিনি।

সেঁজুতি দাঁত চেপে প্যাকেটের দিক চাইল। আদিখ্যেতা করে আবার রংযাপিং করিয়েছে। কী পাঠিয়েছে এর মধ্যে? বোম? যাতে ব্লাস্ট হয়ে ও লটকে যায়?

সেঁজুতি ছটফটে হাতে বাক্স খুলল। বিস্ময়ে হোঁচট খেল অমনি। ফোন!এত মেজাজ খারাপ হলো এবার। ইচ্ছে না থাকা সত্ত্বেও আবার এসে দাঁড়াল রুদ্রর কেবিনে।

সে পুরুষের চোখ তখন সিসি ক্যামেরাতেই ছিল। সেঁজুতিকে আসতে দেখে, চট করে ফাইল মেলে বসল। ভান করল কাজের। সেঁজুতি ধুপধাপ পায়ে এসে সামনে দাঁড়ায়। ফোনের বাক্সটা বাড়িয়ে ধরে সামনে।

কণ্ঠে তেজ, "কী এটা?"

রুদ্র চোখ তুলে চাইল। ভ্রু কুঁচকে বলল, "আপনি অনুমতি ছাড়া ঢুকেছেন কেন?"

একটু আগেই প্রেমের বুলি আওড়ানো মানুষের আচমকা গম্ভীরতায় ভড়কে গেল মেয়েটা।

রুদ্র দ্বিতীয় প্রশ্ন ছুড়ে দেয়, "কী সমস্যা? বসের কেবিনে ঢুকতে হলে যে তার পারমিশান নিতে হয় এতদিনেও শেখেননি?"

সেঁজুতি নিভে গেল এবার। আস্তে করে বলল, "সরি। আসলে.."

রুদ্র কথা কেড়ে নেয়, "কথা পরে। আগে যান, অনুমতি নিয়ে আসুন।"

CamScanner

"কিন্তু আমি তো ঢুকে পড়েছি।"

সে কপাল গোছাল, "তো? আবার যাবেন।"

সেঁজুতি ফোঁস করে দম ফেলল। উলটো ঘুরে ভেংচি কাটল ওকে। বাইরে এসে বলল, "আসব স্যার?"

রুদ্রর ফটাফট জবাব, "পরে আসুন। আ'ম বিজি নাউ!"

মেয়েটা নির্বোধ বনে যায়। একইরকম তুঙ্গে ওঠে মেজাজ। মনে মনে গালাগালির আগুনে রুদ্রর জ্যাতিগোষ্ঠি উদ্ধার করে পুড়িয়ে।

রুদ্র সারা অফিসে আর ডাকেনি ওকে। এই প্রথমবার তার কেবিনে যেতে উশখুশ করল সেঁজুতি। একটা ডাকের জন্যে প্রতিবেলা ছটফটিয়ে ঘুরল। সেই কাঙ্ক্ষিত ক্ষণ গত আটঘণ্টায় চৌকাঠে আসেনি। তবে দেখা হলো রুদ্র বেরিয়ে যাওয়ার সময়। আজকাল সে সবার আগে অফিস ছাড়ে না। ছাড়ে সেঁজুতি যখন যায়, ঠিক ওর সাথেই ঘড়ির কাঁটা মিলিয়ে।

রুদ্রকে গাড়িতে বলতে চায়। ঘন শ্বাসের তোপে বাক্য ফোটে না। রুদ্র জানে ও কী বলবে।

আগেভাগেই বলে দিলো, "ফোনটা আপনার জন্যেই। আর কিছু?"

সেঁজুতি শক্ত কণ্ঠে বলল, "কেন দিয়েছেন, আমি তো চাইনি।"

"উপহার কেউ চেয়ে নেয়?"

সেঁজুতি প্রয়াস খাটিয়ে শান্ত করল নিজেকে। কাল প্রেমে পড়ল, আজই তার গিফটস দেওয়া শুরু?

মাথা ঠান্ডা রেখে বলল, "সরি স্যার। আপনার উপহার আমি নিতে পারব না।"

নিজ উদ্যোগে গাড়ির দরজা খুলে ফোনের বাক্স সিটে রেখে দিলো সেঁজুতি। চলে যাওয়ার জন্যে পা বাড়াতেই রুদ্র ডাকে, "দাঁড়ান।"

CamScanner

থামল সে। ফিরে চাইল। রুদ্র মোলায়েম কণ্ঠে বোঝাল, "দেখুন সেঁজুতি, ফোনটা আপনার প্রয়োজন। অফিসের অনেক কাজে আমার আপনার সঙ্গে যোগাযোগের প্রয়োজন পড়বে। কীভাবে করব? আপনার তো ফোন নেই। তাহলে?"

সেঁজুতির কণ্ঠে নমনীয়তা নেই। বলল চটপট, "এখন হয়তো নেই। কিনে নেব। তাও আপনার থেকে নেব না।"

"আচ্ছা। কিন্তু যতদিন না কিনবেন, ততদিন?"

"ঠিক এই একমাস যেভাবে সামলেছি সেভাবেই সামলাব।"

কাঠখোট্টা জবাব দিয়ে এগিয়ে গেল সে। রুদ্র বিফল হয়ে ভাবল, এই মেয়ের এত আত্মসম্মান এলো কোত্থেকে?

উপহার ফিরিয়ে দিলেও, আস্ত মানুষটাকে কি ফিরিয়ে দেওয়া যায়? সে তো জড়ের কোনো বস্তু নয়। জলজ্যান্ত শরীরটা যে কোনো সময় পিছু নিতে পারে। এই যেমন, গেইট হতে মুখ ঘুরিয়ে এলেও গাড়িসহ সেঁজুতির পেছনে এসেছে রুদ্র। ও হাঁটছিল তখন। একটু এগিয়েই রিকশা নেবে বলে। খুব কাছে গাড়ির হর্ন বাজল রুদ্র। সেঁজুতি পাশ ফিরল চকিতে। রুদ্র ব্রেক কষে বলল, "উঠে আসুন।"

ও ভ্রু গোটায়, "কেন?"

"আজকে এই রাস্তায় ধর্মঘট আছে। গাড়ি পাবেন না। এর থেকে আমি পৌঁছে দিচ্ছি।"

সেঁজুতির দুরূহ জবাব, "দরকার নেই। আমি আমার বাসা চিনি।"

ফের হাঁটা ধরল সে। রুদ্র গাড়ি চালু করল। অথচ গতি মিলিয়ে রাখল সেঁজুতির পায়ের সাথে। নিজেই বলল, "বাসা চেনেন সেটা আমিও জানি। কিন্তু আমার সাথে যেতে সমস্যা কোথায় হচ্ছে?আমি কি আপনার অচেনা? আপনি চেনেন না আমায়?"

সেঁজুতি বক্র হাসে। উত্তর দেয় বিলম্বহীন, "চিনব না কেন? আপনার মতো বদমেজাজি, লাট সাহেব দুটো হয়?"

আগের রুদ্র হলে এই কথার অপরাধে সেঁজুতিকে ভস্ম করে দিতো। কিন্তু এই রুদ্রতে যে বিস্তর ফারাক। প্রেমিক সে। সেঁজুতির প্রেমে বুঁদ হওয়া, প্রেমের তৃষ্ণায় ছটফটিয়ে বেড়ানো এক

নিরুপায় কাঙাল। কথার পিঠে মুচকি হাসল শুধু। বললও সাবলীল, “থ্যাংক্স ফর ইওর কমপ্লিমেন্টস।"

সেঁজুতি চোখমুখ কুঁচকাল। রুদ্রর এই আমূল বোল পরিবর্তনটাই তার জন্যে বিব্রতকর। বীতঃস্পৃহায় গলা ভিজল মেয়েটার। বেগ বাড়িয়ে হাঁটা ধরতেই রুদ্র বলল, "ভালোয় ভালোয় গাড়িতে বসুন, সেঁজুতি।"

ও তাকাল, "যদি না বসি?"

"জোর করে বসাব।"

সেঁজুতি বিস্মিত হয়ে বলল, "কী?"

"দেখবেন?"

উড়ে আসার মতো গাড়ি থেকে নেমে এলো রুদ্র। এক পা এগোতেই, সেঁজুতি ছিটকে গেল দূরে। মিটিমিটি হাসল সে, "ভয় পেলেন?"

সেঁজুতি আঙুল তুলে বলে, "আপনি কিন্তু খুব বাড়াবাড়ি করছেন।"

রুদ্র কাঁধ উচায়, "অ্যাক্সেপ্ট করুন আমাকে। তাহলে আর করব না।"

সেঁজুতি চেতে বলল, "আপনার লজ্জা করে না, একটা মেয়ের পেছনে এভাবে হ্যাংলার মতো ঘুরছেন? সারাক্ষণ রুদ্র রওশন চৌধুরী, রুদ্র রওশন চৌধুরী বলে বলে মুখে ফেনা তুলে ফেলেন, অথচ এখন মিনিমাম আত্মসম্মানও নেই দেখছি!"

রুদ্রর হাসি মুছে গেল সহসা। চাইল, খুব করে চাইল আগের মতো চোটপাট দেখাতে। হলো না। উলটে সেঁজুতির কটমটে মুখাবয়বে খেই হারাল মনের। মেয়েটা ওকে ফেলে এগিয়ে যায়। সোডিয়ামের হলদে প্রভায় খুঁটির মতো দাঁড়িয়ে থাকে রুদ্র।

সেঁজুতি মহাবিরক্ত ভঙ্গিতে হাঁটছিল। মেজাজ বিগড়ে একশ। রাস্তায় সত্যিই রিকশা কম। যা আছে হয় যেতে চাইছে না, নাহলে যাত্রী পূর্ণ। ।

সেঁজুতি হাঁটতে হাঁটতে একটা টং দোকান পার হয়।

দোকানের ঝাঁপ ঝুলছে। সামনে পাতা বেঞ্চে বসে আড্ডা মারছে ক-জন। মেয়ে দেখেই ওরা তীরস্থ হয়ে বসল। চাওয়া-চাওয়ি করে উঠে দাঁড়াল ত্বরিত।

আচমকা তিনটে সমর্থ ছেলে ছুটে সামনে আসতেই থমকে গেল সেঁজুতি। দুদিকে হাত মেলে পথ আগলায় একজন, টেনে টেনে বলে,

"কোথায় যাচ্ছ, সুন্দরী?"

সেঁজুতি মিইয়ে এসেছে। বুক কাঁপছে ধুপধাপ। বলল শক্ত গলায়, "কেন, কী দরকার?"

অন্যজন বলল, "বাবা, কী ঝাঁঝ গলায়। তা পুরো শরীরেও এত ঝাঁয় আছে তো? একটু টেস্ট করে দেখব?"

সেঁজুতি কঠিন কিছু বলতে যাবে, পূবেই শক্তপোক্ত এক ঘুসিতে থুবড়ে পড়ল ছেলেটা। হতভম্বতায় ছলকে উঠল ও। গোল চোখে ফিরে চাইল পেছনে। বাকি দুজন এই দৃশ্যে ভেগে গেল ভয়ে। আহত যুবকও তৎপর উঠে ওদের পেছন পেছন ছুটল। রুদ্র এগোতে গেলেই সেঁজুতি পেছন থেকে খপ করে হাত টেনে ধরে।

"ছেড়ে দিন, স্যার।"

দাঁড়িয়ে যায় সে। ফিরে তাকায় ক্ষুব্ধ চোখে। ধমকে ওঠে আচমকা, "বলেছিলাম না গাড়িতে বসতে? বলেছিলাম? ভালো লাগে এসব? ছেলেরা বিরক্ত করলে ভালো লাগে?"

সেঁজুতির শরীর কেঁপে উঠল। মাথা নুইয়ে বলল, "সরি!"

রুদ্র ঝট করে ওর বাহু টেনে কাছে নিয়ে আসে। মেয়েটা হকচকায়।

চোখদুটো আছড়ে পড়ে যুবকের আর্ত লোচনদ্বয়ে। তেমনই কাতর কণ্ঠে বলল, "আপনি কেন বোঝেন না সেঁজুতি, কেউ আপনার দিকে তাকালেও আমার বুক পুড়ে যায়। রাগ হয়। সেই এক রাতেই আপনি আমার হৃদয়ে এমন দখলদারি চালিয়েছেন, আমি আপনাকে আর আপনার পাশে অন্য কাউকে ভাবলেও শিউরে উঠি।"

সেঁজুতি কিছুক্ষণ চুপচাপ চেয়ে রইল। পরপর আলগোছে রুদ্রর হাতদুটো সরিয়ে দিয়ে বলল, "আপনার অনুভূতি হয়তো সত্যি, স্যার। কিন্তু আমার কিছু করার নেই। আমি আপনাকে কখনোই ভালোবাসব না।"

CamScanner

রুদ্র প্রহৃত হয়। কণ্ঠ নিভে আসে, "কেন?"

সেঁজুতি মুখের ওপর বলল, "সবাই ভালোবাসার যোগ্য হয় না।"

তারপর 'আসুন' বলে ফিরে গেল গাড়ির দিকে। রুদ্র পাথর বনে থাকে। মুখের ওপর স্পষ্ট অবজ্ঞায় বুকের পাঁজর টনটন করে উঠল। যে মানুষটা কখনো কারো মুখে না শোনেনি, আজ এক রমণী খোলা আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে প্রত্যাখান করল তাকে। আহা, এর থেকে যন্ত্রণার আর কী হয়?

রুদ্রর মনের মতোই নিস্তব্ধতায় ডুব দিলো গোটা পথ। একটা কথাও বলেনি সে। না বলেছে সেঁজুতি। ব্রেক যখন গন্তব্যে এসে থামে, নিশ্চুপ নেমে গেল মেয়েটা। আচমকা পিছু ডাকল রুদ্র, "সেঁজুতি।"

ও ঘুরে তাকায়। রুদ্র প্রস্তরের ন্যায় বসেই বলল, "আমি আপনার ভালোবাসার যোগ্য হই বা না হই, ভালোবাসা তো আমি আদায় করবই। আপনাকে পাওয়ার অভিলাষ দিন দিন যে হারে বাড়ছে, এভারেস্টের মতন উঁচু শৃঙ্গও সেখানে ভীষণ ছোটো। আপনার ভালোবাসার সুখ সুখ যন্ত্রণায় যেভাবে ছটফটাচ্ছি? কোনও দুরারোগ্য ব্যধিও পরাজিত সেখানে। আমি নিশ্চিত, খুব শীঘ্রই আপনিও আক্রান্ত হবেন এই ব্যধিতে। ভুগবেন আমারই মতো প্রণয়াকাঙ্ক্ষায়!"

প্রতিটি বাক্যে সুদৃঢ় বিশ্বাস ঝরে পড়ল। কিচ্ছু বলার সুযোগ না দিয়েই সাঁই সাঁই বেগে গাড়ি নিয়ে ছুটে গেল রুদ্র। সেঁজুতি শুধু বোকার মত চেয়ে থাকল সে পথে। তারপর চোখ ফিরিয়ে হাসল। বিড়বিড় করল একা একা, "কোনওদিন হবে না।"

হুট করে বাড়ির দোরগোড়ায় একটা বড়ো পার্সেল পেয়ে অবাক হয়েছেন আমির। ডেলিভারিম্যান তাঁর সই নিয়ে চলে গেছে। হাতে ধরিয়ে দিয়েছে বাক্সটা। আমির দোর আটকে ফিরে এলেন ঘরে। উচু কণ্ঠে ডাকলেন, "মুনারা! এসো এদিকে।"

এক ডাকেই ছুটে এলেন তিনি। ইতিও এলো পেছনে। বাক্স দেখেই বলল, "এটা কী, আব্বু?"

"জানি না। কে দিয়েছে কিছু লেখা নেই। কেঁচিটা নিয়ে এসো তো।"

ইতি দৌড়ে গেল। ফিরে এল মুহূর্তে। আমির বসলেন সোফায়। টেবিলের ওপর বাক্স রেখে স্কচটেপ কাটলেন। বাক্সের মুখ খুলতেই ভেতরে অনেকগুলো শপিং ব্যাগের দেখা মিলল।

CamScanner

একটা একটা করে তুলে রাখলেন উনি। সব শেষে বিশালাকার টেডিবিয়ারে হাত পড়তেই চোখ কপাল ছুঁলো ইতির। স্থান-কাল ভুলে চিৎকার করে বলল, "আপু দিয়েছে, আপু।"

আমিরের মুখভঙ্গি পালটে গেল অমনি। মুনারা বিচলিত হয়ে পড়লেন। ইতি ভয় স্কুলে টেডিটাকে তুলেই বুকে জড়িয়ে ধরল। ওর ভীষণ শখ ছিল লাল তুলুতুলে একটা পুতুল থাকবে খাটে। কোলবালিশের জায়গায় এটাকে জড়িয়ে ঘুমাবে। এই শখের কথা যে কতবার জপেছিল আপুর সামনে। আপু ঠিক মনে করে পাঠিয়েছে?

আমির ত্রস্ত বাক্স হাতালেন। ভাঁজ করা ছোটো কাগজ আঙুলের ভাঁজে বাঁধল। অধৈর্য ভঙ্গিতে খুলে চোখের সামনে ধরলেন তিনি। গোছানো সুন্দর হাতে লেখা,
মা,
কেমন আছো তোমরা? ইতি কেমন আছে? আমাকে মনে পড়ে তোমাদের? আমি জানি, আর কেউ মনে না করলেও, তুমি ঠিক আমার জন্যে কাঁদছ। আমারও তোমাদের কথা ভীষণ মনে পড়ে। তবে চিন্তা কোরো না. আমি এখানে ভালো আছি। জানো, আমায় একটা খুব ভালো চাকরি হয়েছে। প্রথম বেতন পেয়েই এগুলো কিনেছি তোমাদের জন্যে। ইতির খুব শখ ছিল একটা টেডিডিয়ামেন। ওকে দেখিও, খুব খুশি হবে। ভালো থেকো। খেয়াল রেখ নিজেদের। আমার জন্যে চিন্তা কোরো না। আমি ঠিক আছি।

চিঠিটা পরপর দুবায় গড়লেন আমির। কোথাও তাঁর কথা লেখা নেই। বাবার মন আহত হলো বইকি। মেয়েটা জানতেও চাইল না, সে কেমন আছে? একবার সেঁজুতির পাঠানো পাঞ্জাবি সেট দুটোতে চোখ বোলালেন আমির। বুকের ভেতয় হুহু করে উঠল। অভিমান হলো সাথে। চিঠিটা রেখে লম্বা পায়ে চলে গেলেন মরে।

মুনারা এতক্ষণ তীক্ষ্ণ চোখে দেখছিলেন স্বামীকে। উনি যেতেই, তাড়াহুড়ো করে চিঠি হাতে ভুললেন। পুরোটা পড়ে আনন্দে কেঁদে ফেললেন পরপর। নিবিড় হাত বোলালেন কাগজে। যেন সেঁজুতির গায়ে-মাথাম পৌঁছে যাচ্ছে আদর। হঠাৎ ইতি কোমর জড়িয়ে ধরল। ঠোঁট ভেঙে কেঁদে কেঁদে বলল, "আমি এইসব পুতুল-টুতুল চাইনা, মা। আমি আপুকে চাই। ওকে বলো না চাল আসতে।"

মুনারা আঁচলে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন। ঘরে বসে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন আমির। টের পেলেন বুকে ব্যথা উঠেছে। এই ব্যথা সেই আদরের মেয়েটির জন্যে। যেই আদর, ভালোবাসা সারাজীবন অদেখাই রেখেছিলেন তিনি।

২১.
"আমার কদিনের ছুটি চাই, স্যার।"

CamScanner

রুদ্র ভ্রু কোঁচকাল, "হঠাৎ?"

"পরশু থেকে আমার পরীক্ষা শুরু হবে।"

"কোন ইয়ারে পড়ছেন?"

"থার্ড ইয়ার।"

"কোথায় পড়েন?"

সেঁজুতি জিভে ঠোঁট ভিজিয়ে বলল, "ইউনিভার্সিটি অব ফ্যাশন অ্যান্ড টেকনোলজি, নারায়াণগঞ্জ।"

রুদ্রর কণ্ঠে দুশ্চিন্তা, "এতদূর! ঢাকা থেকে অতটা পথ যাওয়া আসা করবেন কী করে?"

সেঁজুতির মেজাজ খারাপ হলো! এত কথার দরকার কী ভাই! ছুটি চেয়েছি দে না। এমনিতেই লোকটার চোখের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। কেমন কেমন করে চেয়ে থাকে। বুক কাঁপে ওর। শরীর কাঁটা দেয়। অনিচ্ছায় কৈফিয়ত দিলো তাও, "ওখানকার একটা হোটেলে উঠব ভেবেছি। ভার্সিটির পাশেই আছে অনেকগুলো, সমস্যা হবে না।"

রুদ্র মাথা নাড়ল, "ওকে।"

সেঁজুতি হাতের কাগজ বাড়ায়, "অ্যাপ্লিকেশনটা?"

"লাগবে না। আপনি যান।"

সেঁজুতি ঘাড় নাড়ে। বিদায় নেয় ত্রস্ত পায়ে। শশব্যস্ত টেলিফোনের রিসিভার কানে তুলল রুদ্র। নির্দেশ দিল কাউকে, "ইউনিভার্সিটি অব ফ্যাশন অ্যান্ড টেকনোলজি, নারায়াণগঞ্জ- এর আশেপাশে যতগুলো আবাসিক হোটেল আছে আমাকে তাদের ডিটেইলস জানাবে, কুইক।"

ওপাশ থেকে উত্তর এলো, "ওকে স্যার।"

রুদ্র লাইন কেটে ম্যানেজার মাহবুবকে ডাকল। মিনিট কয়েকে ছুটে এলেন ভদ্রলোক।

CamScanner

"জি স্যার?”

রুদ্র বলল, "আমি ক-দিনের জন্যে নারায়নগঞ্জে যাচ্ছি। অফিসের সব দায়িত্ব আপনার। কোনও কিছুতে যেন তিল পরিমাণ এদিক-ওদিক না হয়।

মাহবুব মাথা কাত করলেন। কণ্ঠে বিনয়, "ওকে স্যার।"

রুদ্র মনে পড়েছে এমন ভঙ্গিতে বলল, "ওহ হ্যাঁ, আমি যে যাচ্ছি এটা যেন কেউ না জানে।"

"জি স্যার।"

মাহবুব চলে গেলেন।

আগামী কয়েকদিনের সমস্ত মিটিং, কনফারেন্স একে একে বাতিল করে দিল রুদ্র। সেঁজুতি নারায়নগঞ্জ যাচ্ছে মানে ওকেও পিছু নিতে হবে। মেয়েটা একা। তাই পুরোদস্তুর খেয়াল রাখা চাই। অমূল্য জিনিস নিয়ে হেলাফেলা করতে নেই। হারানোর আশঙ্কা থাকে। আর সেঁজুতি হারানো মানে রুদ্রর সন্ধ্যা প্রদীপ নিভে ঝুপ করে তলিয়ে যাওয়া তিমিরে।

দুদিন পর।

কমসে কম রাত দশটা বাজে তখন। হোটেল রুমে বসে পড়ছিল সেঁজুতি। খুব সস্তা আবাসিক হোটেল এটা। চারপাশে রং খসা দেওয়াল, রুম ভাড়াও কম। বেতন যা পেয়েছে অর্ধেকের বেশিই তো খরচ করা শেষ। সেমিস্টার ফি জমা দেওয়া, বাড়ির জন্য টুকিটাকি কেনাকাটার সাথে নিজের জন্যে ছোট্ট একটা বাটন ফোন নিয়েছে। আবার এ মাসের বাসা ভাড়াও খুব জোরাজোরি করে দিয়েছে সেঁজুতি। আরিশা কিছুতেই নিতে চায়নি।

আচ্ছা, জিনিসগুলো ঠিকঠাক পৌঁছুলো বাড়িতে? চিঠিটা পড়েছিল তো মা? আর বাবা, ওর পাঠানো পাঞ্জাবি পরবেন তো?

সেঁজুতি বইয়ের পাতায় চোখ রেখেই আনমনা হয়। পাশ ফিরে মুঠোফোনটা দেখে নেয় একপল। এই মুহূর্তে খুব ইচ্ছে করল বাবা নামক সেই রাগী মানুষটিকে কল দেওয়ার। দিলো না। অভিমান পিছিয়ে আনে। দীর্ঘশ্বাস ফেলল সেঁজুতি। জন্ম থেকে তার মাকে একজন মেজাজি মানুষের সাথে সংসার করতে দেখেছে। যার ধমক শুনে দিন শুরু হতো অতীতের।

CamScanner

আচমকা টোকা পড়ল দরজায়। সেঁজুতির ধ্যানের সুতো ছিঁড়ে যায়। কপাল কুঁচকে চাইল সেদিক। এত রাতে, এই অচেনা জায়গায় কে এলো? ও একা একটা মেয়ে এখানে। দরজা খোলা কি ঠিক হবে?

করাঘাতের শব্দ বেড়ে আসছে ক্রমে। অধৈর্য লোকটা। সেঁজুতি বুকে সাহস নিয়ে দরজা খুললো। একটু ঝুঁকে করে উকি দিতেই রুদ্র হাত নেড়ে বলল, "হ্যালো।"

ভূত দেখার মতো চমকে উঠল সেঁজুতি। রীতিমতো 'আ' বলে চিৎকার ভুড়ল জোরে। ছেলেটা ভ্যাবাচ্যাকা খায়। ধড়ফড়িয়ে ওর মুখ চেপে ধরে ঢুকে গেল রুমে। চাপা কণ্ঠে বলল, "চ্যাঁচাচ্ছেন কেন? কেউ শুনলে কী ভাববে বলে সেঁজুতিকে চোখ মারবেল। রুদ্রর হাতটা ঝটকা মেরে সরিয়ে দিলো ঠোঁট থেকে। কণ্ঠে বিস্ময় নিয়ে বলল, "আপনি এখানে কী করছেন?"

রুদ্র চমৎকার করে বলল, "কেন? আপনি যেখানে, আমি সেখানে। জানেন না?"

ও হতভম্ব, হতবাক। সবকিছু মাথার ওপর দিয়ে যাচ্ছে। রুদ্র তখন চারপাশে দেখল। নাক সিটকে বলল, "কিন্তু আপনি এত হোটেল থাকতে এরকম জায়গায় কেন উঠলেন, বলুন তো। আমার তো রুম দেখেই কেমন ইরিটেশন হচ্ছে।"

সেঁজুতির মেজাজ চটে যায়। এই লোক পিছু নিয়ে এখানেও চলে এসছে? এটা কি মামার বাড়ির আবদার? এখন কেউ দুজনকে একই রুমে দেখলে কী ভাববে? নাক ফুলিয়ে বলল, "আপনি এখানে কেন এসেছেন?"

রুদ্রর সরল উত্তর, "বললাম তো। আর তাছাড়া, আপনাকে এভাবে একা ছেড়ে দিই কী করে বলুন? আমি থাকলে অন্তত ভরসা পাবেন।"

"আমি কি আপনার ভরসা চেয়েছি?"

রুদ্র পাশ কাটিয়ে এসে চেয়ারে বসল। এক পায়ের ওপর আরেক পা তুলে বলল, "সবকিছু চাইতে হয় না, সেঁজুতি। এই যে আমার মন, আপনি কি চেয়েছিলেন? চাননি। কিন্তু দিয়ে তো দিয়েছি।"

সেঁজুতি দাঁতকপাটি চেপে ধরে। ও ফের বলল, "এখানে আসার প্রথম কারণ আমার ভালোবাসা। দ্বিতীয় কারণ আমার দায়িত্ব। আপনি যাতে নির্বিঘ্নে পরীক্ষা দিতে পারেন, সেটা দেখার দায়িত্ব তো আমার। আপনার না হওয়া হবু বর যাতে কোনওভাবেই আবার আপনার হাত ধরে টানাটানি করতে না পারে, সেটা দেখার দায়িত্বও কিন্তু আমার।"

CamScanner

সেঁজুতি হতভম্ব হয়ে বলল, "এসব আপনি কী করে জানলেন?"

রুদ্র উঠে দাঁড়ায়। পকেটে হাত গুঁজে বলে, "আ'ম রুদ্র রওশন চৌধুরী। কোনো কিছু জানতে চাইব আর হবে না? আপনি আমার হৃদয়ের রানি, আপনার ব্যাপারে সবকিছু জেনে রাখা আমার কর্তব্য!"

সেঁজুতি ভেংচি কেটে অন্যদিকে মুখ ঘোরাল। রুদ্র হেসে বলল 'এমনিতেও ছেলেটা ভালো নয়। আপনি একদম ঠিক কাজ করেছেন বিয়েটা ভেঙে দিয়ে। নাহলে আমার মতো একটা রুদ্র মিস করে ফেলতেন।ন।

ও খ্যাঁক করে উঠল, "আপনি কতদূর ভালো? ওর তো চরিত্রে সমস্যা। আপনার পুরোটাতে। সবথেকে বেশি সমস্যা মাথায়। আধপাগল আপনি, চিকিৎসা প্রয়োজন।"

কৎসা প্রমোয়াকোচশূন্য স্বীকারোক্তি, "আপনার জন্যে পাগল। আপনিই আমার চিকিৎসা।"

সেজুতি বিরক্ত হয়ে বলল, "উফ। আপনি এখন যান তো। আমর অনেক পড়া বাকি।"

রুদ্র মেনে নেয়। কাঁধ উচিয়ে বলে, "ওকে।"

ভদ্রের ন্যায় বেরিয়েও গেল। সেঁজুতি এগোল ছিটকিনি তুলতে। আচমকা মাথা ঢুকিয়ে উকি দিলো রুদ্র। প্রশ্ন করল শিশুর ন্যায়, "একটা কথা বলব?"

সেঁজুতি ভড়কে যায়। বিরক্ত হয় ফের।

"কী?"

"ভালোবাসি।"

বলেই ফুঁ দিলো ওর কপালে। হেলায় পড়ে থাকা কালো চুল দুলে উঠল হাওয়ায়। সেঁজুতি চেতে কিছু বলতে গেলে, কথা কেড়ে নিলো রুদ্র, "বলতে হবে না। আমি জানি, আমি অসভ্য।"

এনিওয়ে আপনার পাশের রুমটাই আমার। কিছু দরকার হলে যাস্ট একটা কল, বান্দা বুক পেতে দেবে।"

সেঁজুতি কটমটিয়ে, মুখের ওপর ধড়াম করে দরজা লাগিয়ে দিলো।

CamScanner

বিড়বিড় করল বীতঃস্পৃহায়, "এক ঝামেলা শেষ করতে না করতেই আরেক ঝামেলায় পড়েছি। উফ!

রুদ্র গাড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সেঁজুতির পরীক্ষার হলের সামনে। যেই দৃশ্যে মেয়েটা অতিষ্ঠ শ্বাস ফেলল। চোখমুখ শক্ত করে উলটোপথে হাঁটা দিলো পরপর। রুদ্র বার্তা পাঠাল চ্যাঁচিয়ে, "বখাটে ছেলে কিন্তু দিন দুপুরেও থাকে, মিস সেঁজুতি। তবে সব জায়গায় রুদ্র রওশন চৌধুরী থাকে না।"

অমনি দাঁড়িয়ে গেল মেয়েটা। মনে পড়ল সেই রাতের ছেলেগুলোর কথা। সেদিন উনি না থাকলে কী না কী হতে পারত। তার অবজ্ঞার ভাব চুপসে এলো অচিরে। কালো মুখে ফিরে এসে বাধ্যের ন্যায় গাড়িতে উঠে বসল। রুদ্র দুষ্টু হাসিটা চাপা দিলো নিটোল ঠোঁটের ভাজে। গলা ঝেড়ে শুধাল, "পরীক্ষা কেমন হয়েছে?"

সেঁজুতির থমথমে জবাব, "ভালো।"

"সত্যিই ভালো? মুখ দেখে তো মনে হচ্ছে না।"

দ্রুতে ভাঁজ নিয়ে চাইল সেঁজুতি। অসহ কণ্ঠে বলল, "আপনি এমন কেন করছেন একটু বলবেন?"

"অনেকবারই তো বলেছি। ভালোবাসি আপনাকে।"

সেঁজুতি রেগে গেল এবার। স্পষ্ট গলায় বলল, "আমি খুব ভালো করে জানি এসব আপনার নাটক। সোজা আঙুলে ঘি না উঠলে মানুষকে আঙুল বাঁকাতে শুনেছি। কিন্তু কষ্ট দেওয়ার উদ্দেশ্যে ভালোবাসার অভিনয় করতে আপনাকেই প্রথম দেখলাম। যেই দেখলেন আপনি যেভাবেই জ্বালাচ্ছিলেন আমাকে দমানো যাচ্ছে না। তখন এইভাবে নিচে নামার সিদ্ধান্ত নিলেন, তাই না?

গাড়ি চলছিল। রুদ্র তৎক্ষণাৎ ব্রেক কষল চাকায়। আহত কণ্ঠে বলল, "আপনি আমায় এমন ভাবেন?"

"আপনার মতো লোককে আর কী ভাবব বলুন? পুরুষ মানুষ মানে...

রুদ্র ধমকে উঠল মাঝপথে "শাট আপ!"

সেঁজুতির বুক লাফিয়ে ওঠে। নিভে আসে শক্তভাব। একটু কি বেশি বলে ফেলেছে?

CamScanner

রুদ্র রাগ কমাতে জোড়াল শ্বাস ফেলল। পরপরই ব্যাকুল কণ্ঠে বলল, "আপনি কেন বুঝতে পারছেন না, আমি সত্যিই আপনাকে ভালোবাসি।"

সেঁজুতি জানলার দিকে মুখ ঘুরিয়ে নেয়। অনীহা কণ্ঠে বলে, "আমার মাথাব্যথা করছে। পারলে একটু তাড়াতাড়ি পৌঁছে দিন।"

রুদ্রর রাগ হলো। যতটা রাগে মানুষ পৃথিবীর বুকে আগুন জ্বালাতে পারে। অথচ ব্যর্থ হলো প্রকাশে। প্রেমিক সত্তাটা শখের নারীর এই নিষ্ঠুর অবহেলা ভালোবাসার আঁচে গিলে ফেলল আজও।

দরজা খুলে রাফিনকে দেখে খুব আশ্চর্য হলেন মুনারা। ছেলেটার সারা মুখে ব্যান্ডেজ। চোখ, ঠোঁট ছাড়া কিচ্ছুটি খুঁজে পাওয়া মুশকিল। উনি জিজ্ঞেস করেই বসলেন, "তোমার এই অবস্থা কেন?"

রাফিন উত্তর দেয় না। উলটে পালটা প্রশ্ন ছুড়ল, "আঙ্কেল আছেন?"

"হ্যাঁ। ভেতরে এসো।"

আমির সবেমাত্র স্কুল থেকে ফিরেছেন। হাত-মুখও ধুতে পারেননি। পুরুষালি কণ্ঠ শুনে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন দ্রুত। রাফিনকে দেখতেই অবাক হয়ে বললেন, "তুমি! ঢাকা থেকে কবে ফিরলে?"

"আপনার মেয়ের চরিত্রে সমস্যা আছে, আঙ্কেল।"

ভণিতাহীন বাক্যবাণ ছুড়ে দিলো রাফিন। মেয়ের ব্যাপারে এমন কথায় আমিরের চমকালেন। তেমনই তেতে গেল মেজাজ। ধমকে উঠলেন অমনি, "রাফিন। কী আবোল-তাবোল বলছ?"

"যা সত্যি তাই বলছি। আপনার মেয়ের ঢাকায় গিয়ে পাখনা গজিয়েছে। বড়োলোক বয়ফ্রেন্ড বানিয়েছে সে। আর সেই বয়ফ্রেন্ড দিয়ে আমার এই অবস্থা করেছে। দেখুন, প্রমাণ হিসেবে আমার চেহারাটা দেখুন।"

"তোমার কি মাথা ঠিক আছে? আমার মেয়ে এরকম নয়।" প্রতিবাদ করলেন মুনারা।

রাফিন তুচ্ছ হেসে বলল, "আপনার মেয়ে যে কী, আমার বুঝতে বাকি নেই। আমার ওপর দোষ চাপিয়ে বিয়ে ভেঙেছে। আসলে বলতে পারছিল না, ওর এখন নতুন কাউকে দরকার। আর তার

জন্যেই ঢাকায় গিয়ে ঘাঁটি গাড়তে হবে। শুধু কী তাই, ওই লোক তার অফিসে ওকে চাকরিও দিয়েছে। আচ্ছা, আন্টি, আপনিই বলুন না, গ্রাজুয়েশন ছাড়া ওরকম মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে কেউ চাকরি পায়? গ্রাজুয়েশন করেও তো পায় না অনেকে। সেখানে সেঁজুতি কী করে পেল? নির্ঘাত রূপ দেখিয়ে!"

আমির ক্ষেপে বললেন, "সংযত হয়ে কথা বলো। তুমি আমার সামনে দাঁড়িয়ে আমার মেয়ের সম্বন্ধে বাজে কথা বলছ?"

তার কাটকাট জবাব, "হ্যাঁ বলছি। আপনার মেয়ে দুশ্চরিত্রা, অথচ সে আমাকে..."

আক্রোশে ফেটে পড়লেন আমির। মাঝপথেই ঠাটিয়ে এক চড় বসালেন গালে। কাঁচা ক্ষতে ফের আঘাতে রাফিন বিবশ বনে রইল। সবকিছুতে ভড়কে গেলেন মুনারা। রাফিন চোখমুখে অবিশ্বাস নিয়ে বলল, "আপনি আমার গায়ে হাত তুললেন!"

আমির রেগে আগুন। আঙুল তুলে বললেন, "একদম চুপ। তোমার চরিত্র খারাপ শুনেও আমি বিশ্বাস করিনি। আমার মেয়ের বিরুদ্ধে গিয়ে তোমাদের বিয়ে দিতে চেয়েছিলাম। এখন নিজের চরিত্র ঢাকতে আমার মেয়ের নামে বদনাম রটাচ্ছ। এবার বুঝতে পারছি, কত বড়ো ভুল করেছি সেদিন। আমার মেয়ে আর যাই হোক, চরিত্রহীন নয়। আরেকবার এসব উচ্চারণ করলেও তোমার জিভ টেনে ছিঁড়ে ফেলব আমি। বেরিয়ে যাও এক্ষুনি বেরিয়ে যাও।"

কথা শেষ করতেই রাফিন থাবা বসিয়ে ওনার কলার চেপে ধরল। ভদ্রলোক বিমূঢ়, স্তব্ধ। রাফিন ক্রোধে কাঁপছে। ডোরা সাপের ন্যায় ফোঁসফোঁস করে বলল, "আপনার এত বড়ো স্পর্ধা, আপনি আমাকে থাপ্পড় মেরেছেন? আমি চাইলে এক্ষুনি আপনাকে মাটিতে পিষে ফেলতে পারি।"

মুনারা ছুটে এলেন। রাফিনের শক্ত মুঠো হতে প্রয়াস করলেন স্বামীকে ছাড়াতে। ধমকালেন কয়েকবার, "ছাড়, বেয়াদব ছেলে। ছাড় বলছি।"

আমির ঝাড়া মেরে হাত ছাড়িয়ে দেয়। চোখমুখ লাল করে বলে, "এক্ষুনি বের হও, নাহলে কিন্তু পুলিশ ডাকব।"

তপ্ত চোখে দুজনকে দেখে দেখে বেরিয়ে গেল রাফিন। অপ্রত্যাশিত ঘটনা আমিরের মস্তিষ্ক রুদ্ধ করে রাখল। ধপ করে বসে পড়লেন মেঝেতে। মুনারা আর্তনাদ করে বললেন, "কী হলো আপনার? শরীর খারাপ করছে?"

CamScanner

ফিরে চাইলেন ভদ্রলোক। চোখ বেয়ে এক ফোঁটা জল গালে এসে পড়ল। মুনারা স্তম্ভিত হয়ে বললেন, "আপনি কাঁদছেন?"

নিমিষে হাহাকার করে উঠলেন তিনি, "বড়ো ভুল করে ফেললাম, মুনারা! মেয়েটার একটা কথাও না শুনে কত কষ্ট দিলাম ওকে। গায়ে হাত তুলেছি। কীভাবে ঠোঁট কেটে রক্ত পড়ছিল দেখেছ? কোথায় আমার মেয়ে?"

হাউমাউ কান্নায় ভেঙে পড়লেন আমির। মুনারার চোখও জল। গায়ে- মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, "শান্ত হন। সব ঠিক হয়ে যাবে। খুব তাড়াতাড়ি সেঁজুতি ফিরে আসবে আমাদের কাছে।"

২২.

সেঁজুতির পরীক্ষা শেষ। কালই ফিরে যাবে ঢাকায়। ব্যাগপত্র সবকিছু গুছিয়ে ঘুমোতে যেতে বেশ রাত হলো। বিছানায় শুতেও পারেনি ঠকঠক শব্দ হলো দোরে। আজ মেয়েটার ভয় লাগেনি, ঘাবড়ে যায়নি বিস্ময়ে। ওপাশে কে জানে। তবে বিরক্ত লাগছে খানিক। এই লোকের এক্ষুনি আসতে হলো?

তাও দরজা খুলল গিয়ে। ভ্রু নাঁচিয়ে শুধাল, "কী চাই?"

উত্তরের বদলে মুখের সামনে দুটো টিকিট ধরল রুদ্র।

"টিকিট ডান।"

প্রফুল্ল কণ্ঠ তার। সেঁজুতি এক পল চোখ বুলিয়ে বলল, "কীসের টিকিট?"

"আমাদের ফেরার।"

আকাশ থেকে পড়ল ও, "আমাদের মানে? আমি কি আপনার সঙ্গে যাব নাকি?"

বলতে বলতে চৌকাঠ ছেড়ে সরে এলো মেয়েটা। রুদ্র ভেতরে ঢোকে।

"হ্যাঁ। কেন, যাবেন না?"

"না। আমি বাসে যাব।"

CamScanner

"বাসের টিকিটই কেটেছি।"

সেঁজুতি অবাক হয়ে বলল, "বাসে যাবেন! রুদ্র রওশন চৌধুরী, সে যাবে বাসে?"

রুদ্র কাঁধ উচাল, "অফকোর্স! সে তার বউকে একা একা কোথাও ছাড়ছে না!"

সেঁজুতি ফুঁসে উঠল। হাঁ করতেই রুদ্র দুহাত তুলে বলল, "কিছু বলতে হবে না, আমি মজা করছিলাম।"

আঙুল নামাল মেয়েটা। মাথা ঠান্ডা করে বলল "এমন মজা আর কক্ষনো করবেন না।"

রুদ্র পালটা জবাব দেয় না। ফিচেল হেসে ভাবে, বউ বলায় রেগে গেলেন তো? সময়ের অপেক্ষা সেঁজুতি। বউ তো আপনাকে বানাবই।”

সেঁজুতি ফোঁস করে শ্বাস ফেলে বলল,

"দেখুন স্যার, এসব ছেলেমানুষী আপনাকে মানায় না। বাসে চড়ার অভ্যেস আপনার নেই আমি জানি। শুধু শুধু টিকিট কেটে টাকা নষ্ট করলেন। আপনি তো গন্ধই সহ্য করতে পারবেন না।"

"কেন পারব না? আপনার জন্যে আমি সব পারব।"

সেঁজুতি থমকে রইল কিছু পল। পরপরই শক্ত কণ্ঠে বলল, "এসব বলে লাভ নেই। আপনি প্লিজ এগুলো রেখে নিজের কাজে মন দিন।"

রুদ্র হাসল ফের। কী অদ্ভুত! নাক উঁচু সেই লোকটা আজকাল কথায় কথায় হাসছে। প্রেমে পড়লে বুঝি এমনই হয়? কিন্তু সেঁজুতি বুঝে পায় না, এক রাতে মানুষ প্রেমে পড়ে কীভাবে? বোকা মেয়েকে কে বোঝাবে, প্রেমে পড়তে এক রাত কেন? অনুভূতির তাণ্ডবে এক সেকেন্ড লাগে কেবল।

রুদ্র জমাট স্বরে বলল, "আমি ভীষণ কাজ পাগল ছেলে। কাজ, আমার ভীষণ প্রিয়। আর সেই সব প্রিয় জিনিসের তালিকায় আপনিই তো সবার শীর্ষে, সেঁজুতি। সবার প্রথমে।"

সেঁজুতি বিদ্রুপ করে হাসল, "তাই? দুদিনেই আপনার প্রিয়র প্রথমে চলে এলাম? যারা জন্ম দিলেন, বড়ো করলেন তাঁরা? আপনার বাবা-মাকে বুঝি ভালোবাসেন না?"

CamScanner

তার ঠান্ডা জবাব, "বাসব না কেন? আমার প্রথম ভালোবাসাই তো আমার মা।"

সেঁজুতি ভ্রু কোঁচকায়, "আর বাবা?"

রুদ্রর প্রেমিকসুলভ কন্ঠটা হঠাৎই উদাস হলো। কেমন করে বলল, "জানি না।"

"জানেন না? এ আবার কেমন কথা? আঙ্কেল তো কত ভালো মানুষ।"

"ওই ভালো মানুষটাই আমার মায়ের সাথে অন্যায় করেছে। শেষ করে দিয়েছে সেই নির্দোষ রমণীর জীবন।"

সেঁজুতি বিহ্বল হয়ে বলল, "কী করেছে আঙ্কেল?"

রুদ্র চট করে ধাতস্থ হলো। সংবিৎ পেয়ে চুপ করে গেল। সেঁজুতি সাগ্রহে জানতে চায়, "আপনার মা কি বেঁচে আছেন?"

রুদ্র মুহূর্তেই কেমন চটে গেল। ফিরে এলো সেই রূপ।

"এসব আমার ব্যক্তিগত বিষয়। আপনি নাক গলাবেন না।"

সেঁজুতির উৎকন্ঠা মিইয়ে আসে। মুখ কালো করে বলে "সরি!"

রুদ্র চোখ বুজে জোরালো শ্বাস ফেলল। কন্ঠ নিভিয়ে বলল, "না আ'ম সরি: আমিই একটু বেশি করে ফেললাম। এনিওয়ে..." বলে টিকিট দুটো পকেটে ভরল সে। জানাল, "কাল সকাল নয়টায় বাস। আমার সাথেই আপনাকে ঢাকায় যেতে হবে। কোনোরকম আপত্তি করলে..."

সেঁজুতি ভ্রু গোঁছাল, "করলে?"

রুদ্র কাছে এসে দাঁড়াল। দাঁত চেপে বলল, "তুলে নিয়ে যাব।"

মেয়েটা হাঁ হয়ে রইল। নিরুদবেগ রুদ্র চোখের সামনে থেকে বেরিয়ে যায়। সেঁজুতি হতভম্বতায় বিড়বিড় করল, "তুলে নিয়ে যাবে? কী সাংঘাতিক লোক!"

পরদিন।

CamScanner

রুদ্রর তুলে নিতে হয়নি। সেঁজুতি ঠিকই বাসে উঠে বসেছে। আর সেটাও রুদ্রর আগে এসে। রুদ্র এতক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছিল। সত্যি বলতে এই বাসে যাওয়ার এক ফোঁটা ইচ্ছে ওর নেই। এত চাপা, এত লোক গাদাগাদি, তারওপর কী গন্ধ! নাকে এলেই পেট উগলে আসছে। রুদ্র নিজের ওপরেই মহাবিরক্ত হয়। প্রেমে পড়ে ও কি আসলে বেশি হ্যাংলা হয়ে যাচ্ছে? দ্য গ্রেট বিজনেসম্যান রুদ্র রওশন চৌধুরী প্রেমের তৃষ্ণায় ছটফট করে ঘুরছে এক তরুণীর পেছনে। এসব কেউ শুনলে বা জানলে বিশ্বাস করবে কখনও? ওর নিজেরই তো বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না। কিন্তু কী করবে। মেয়েটার আশেপাশে থাকতেও এত সুখ লাগে। রেগে চাইলে, কথা শোনালেও উষ্ণ বুকে তুষার ধ্বসে পড়ে।

বাস ছাড়ার সময় হয়েছে। ড্রাইভার চায়ের কাপ খালি করে এসে সিটে বসলেন। হর্নের দু-চারটে শব্দ তুলে মনযোগ নিলেন যাত্রীদের। রুদ্র সিগারেট ফেলে দেয়। পানির বোতল, নাকে রুমাল চেপে বাসে উঠে আসে।

লম্বা লোকটা সোজা হয়ে দাঁড়াতেও পারছে না। মাথাটা ঠুকে যাচ্ছে বাসের ওপর বানানো দুপাশের তাকে।

সে ত্যক্ত বিরক্ত হয়ে বলল, "এরা বাসটা আরেকটু উঁচু করে বানাতে পারে না?"

ও বসা মাত্রই সেঁজুতি ঘেঁষে গেল জানলায়। এই যে পাশাপাশি যাচ্ছে ভীষণ বাধ্য হয়ে। গতবার আসার সময় যে লোকটার পাশে বসেছিল, উনি অসভ্যতা করার চেষ্টা করছিলেন খুব। তাই এবার আর সাহস হলো না সেঁজুতির।

রুদ্রর শরীর হতে সিগারেটের গন্ধ ছুটে আসছে। মেয়েটা ওড়না তুলে নাক ঢাকল। বলল, "বাসের মালিক তো আর জানতেন না, ভাবের জমিদার উঠবে। জানলে নিশ্চয়ই বানাতেন।"

রুদ্র চোখ সরু করল, "কে ভাবের জমিদার?"

"যার বিঘা বিঘা ভাবের জমি আছে, সে।"

রুদ্রর সন্দেহ হলো কথাটা ওকেই ইঙ্গিত করা। বুঝেও ভান করল, "কার কথা বলছেন?"

পরপর খেয়াল করল সেঁজুতি নাক চেপে বসেছে। হৃষ্ট চিত্তে বলল, "আপনারও বাসে গন্ধ লাগে? বললেই পারতেন, অভ্রকে গাড়ি পাঠাতে বলতাম।"

সেঁজুতি রুষ্ট চোখে চাইল, "বাসে চড়ার অভ্যেস আছে আমার। নাক ঢেকেছি আপনার জন্যে।"

CamScanner

"আমি কী করলাম? পারফিউমটা তো ইটালি থেকে আনানো। স্মেল ভালো নয়?"

সেঁজুতি অতিষ্ঠ হয়ে বলল, "একটু আগে যে সিগারেট ফুঁকে এলেন, গা থেকে তো দারুণ ঘ্রাণ আসছে। ঘ্রাণে আমার দমবন্ধ হওয়ার অবস্থা!"

রুদ্র সতর্ক কণ্ঠে বলল, "আপনার সিগারেট খাওয়া পছন্দ নয়?"

"না।"

ফরসা ছেলেটার মুখখানা সংকীর্ণ হলো অমনি। চ-সূচক শব্দ তুলল জিভে। এটা কী বলে এই মেয়ে? এর জন্যে এখন সিগারেট ছাড়তে হবে না কি?

সেসময় মুঠোফোন বাজল ওর।

ওইটুকু জায়গায় বসে পকেট থেকে ফোন বের করতেই রুদ্রর জান ছুটে গেল। স্ক্রিনে 'ড্যাড' লেখা দেখেই পালটে ফেলল চেহারা। নিমিষে ভারি হলো স্বর, "হ্যালো!"

রেহানের কণ্ঠে উদ্বেগ, "কোথায় তুমি?"

"কেন?"

"আমি আজ উত্তরার অফিসে এসেছি। তুমি তো নেই এখানে। ফ্ল্যাটেও নেই শুনলাম। কোথায় গিয়েছ জানতে পারি?"

"কাজে এসেছি।"

"কাজটা কি সেঁজুতিকে পাহারা দেওয়া?"

রুদ্র হেসে ফেলল, "সবই জানো দেখছি।"

"জানতে তো হবেই। আমার কাজ পাগল ছেলে হঠাৎ অফিস ফেলে নারায়নগঞ্জে ছুটল তার প্রেমিকার বডিগার্ড হতে। আর আমি বাবা হয়ে তার খোঁজ রাখব না?"

"রাখবে না কেন? তা আজকাল গোয়েন্দা লাগিয়েছ না কি পেছনে?"

CamScanner

রেহান বললেন, "যদি লাগাইও, ভুল তো কিছু করিনি। ভালো কথা বলছি রুদ্র, এসব থেকে বেরিয়ে এসো। ইউ ডিজার্ভ বেটার।"

রুদ্রর দৃঢ় চিত্তের দৃঢ় জবাব, "বাট আই ওয়ান্ট হার, ড্যাড। আই নিড হার। বিকজ আই লাভ হার। রাখছি। এসে কথা হবে।"

লাইন কেটে দুই ঠোঁট ফুলিয়ে শ্বাস ফেলল সে। পাশ ফিরতেই দেখল, সেঁজুতি ঘুমিয়ে পড়েছে। চলন্ত বাসের ঝাঁকিতে দিগবিদিক দুলছে ওর মাথাটা। রুদ্র একবার হাত বাড়িয়েও গুটিয়ে নিল। না, এভাবে একটা ঘুমন্ত মেয়েকে ছোঁয়া ঠিক নয়। তবে সৃষ্টিকর্তাও হয়তো এটাই চাইছিলেন। রাস্তার উচু-নিচু ঢালে বাসের চাকা পড়তেই সেঁজুতির মাথাটা ধপ করে ওর কাঁধে এসে পড়ল। রুদ্রর হৃৎপিণ্ড অবধি লাফিয়ে উঠল এতে। শুকনো ঢোকে ভিজিয়ে নিল গলা। পূর্ণ দৃষ্টি জোড়া ঠিকড়ে রাখল প্রণয়িনীর মুখবিবরের ওপর। সেই কাজে বাধা দিচ্ছে বাতাসে সেঁজুতির উড়ে আসা চুল। বারবার এসে মুখের সামনে পড়ছে ওরা। রুদ্র চুলগুলো আলগোছে সরিয়ে কানের পিঠে গুঁজে দেয়। তৃষার্তের ন্যায় চেয়ে থাকে কিছুক্ষণ। সেঁজুতির মেদুর মুখশ্রী নিঃশ্বাসের এত কাছে। নরম শরীরটা বুকের এত ঘনিষ্ঠ। রুদ্র সব ভুলে বসল এবার। ভুলে বসল বাসে থাকা চার দশক মানুষ। ভুলে বসল সেঁজুতি তাকে ভালোবাসে না। ওকে ছোঁয়ার বৈধতা ওর নেই। তবুও মনের অশান্ত ইচ্ছেটাকে প্রশ্রয় দিলো ছেলেটা। ঠোঁট বসিয়ে দীর্ঘ এক চুমু আঁকল সেঁজুতির কপালে। মেয়েলি আঙুলের ভাঁজে আঙুল ডোবাল নিজের।

প্রথমবার কোনও নারীকে ছুঁয়েছে সে। এই স্পর্শের প্রতিটি পরতে কেবল ভালোবাসা। রুদ্রর বক্ষস্পন্দন তরতরিয়ে বাড়ে। রুহু শুকিয়ে কাঠ।

সেঁজুতির নিদ্রিত মুখখানা চেয়ে দেখল অপলক। ভাবল, "আপনার প্রতি আমার অনুভূতি এত গাঢ় কেন, সেঁজুতি? কেন এত ভয়ানক?"

উত্তরের বদলে কানে বাজল মেয়েটার সেই শক্ত বুলি, 'আপনাকে আমি কখনো ভালোবাসব না।'

রুদ্র আহত শ্বাস ফেলল, সিটে মাথা হেলিয়ে আওড়াল, "আপনার প্রণয়াকাঙ্ক্ষার তীব্র দহনে পুড়ছি আমি। বাঁচার যে উপায় নেই, সেঁজুতি। যতদিন না আপনিও জ্বলবেন এই অনলে, ততদিন আমি একাই পুড়ব, ছাই হব। তারপর সেই ছাইয়ের স্তুপ দিয়ে গড়ব আরেকটা রুদ্রকে। যে বাঁচবে। শান্তিতে বাঁচবে। কারো প্রেমে জ্বলেপুড়ে এইভাবে অঙ্গার হবে না।”

"আচ্ছা, তুমি আর রুদ্র স্যার তো ভাই। অথচ তোমাদের মধ্যে কোনো মিল নেই কেন? আই মিন, উনি এত গম্ভীর, হিংসুটে, অহংকারী। অথচ তুমি, আঙ্কেল এরা একদমই আলাদা।"

CamScanner

অভ্র মৃদু হেসে বলল, "ভাই একটু রাগী, তবে হিংসুটে নয়। আসলে ওপর থেকে সবাইকে যেমন লাগে না, ভেতরে কিন্তু সে একদমই আলাদা।"

"থাক থাক। ভাইয়ের হয়ে এত সাফাই গেও না। ওনাকে আমি দুটো দিন সামনাসামনি দেখেছি। সব মনে আছে। আঙ্কেলের নিজের ছেলে অথচ দুজনে আকাশ-পাতাল তফাত।"

অভ্র ভাবুক হয়ে বলল, "এটা ঠিক। ভাই একটু অন্যরকমই। কেন যে এমন, এর উত্তর আমিও জানি না। তবে সেই ছোটোবেলা থেকেই দেখছি ভাইকে। কারো সাথে মেশে না, এমনকি আমার সাথেও না। মা, মামা এদের সাথেও তো কাজের বাইরে কোনো কথা বলে না।"

আরিশা অবাক হয়ে বলল, "মামা! রুদ্র স্যারের বাবা তোমার মামা হন?"

অভ্র বার্গারে কামড় বসায়। কণ্ঠ সাবলীল, "হ্যাঁ। তুমি কী ভেবেছিলে? আমি তোমার রুদ্র স্যারের আপন ভাই? আমরা কাজিন। তবে ভাইকে আমি আপন ভাইয়ের থেকে কম কিছু মনে করি না।"

"কাজিন? তাহলে তোমার বাড়ি কোথায়? আর তোমার বাবা কী করেন?"

অভ্রর খাওয়া থেমে গেল। অম্বুবাহি ছুটে এলো মুখে। আরিশা কণ্ঠ নামিয়ে বলল, "আ'ম স্যরি! আমি ভেবেছি উনি বেঁচে আছেন।"

অভ্র কাষ্ঠ হাসে, "মারা যাননি। বেঁচেই আছেন। তবে কোথায় আছেন আমি জানি না।"

মেয়েটা বিহ্বলিত, "মানে!"

অভ্র দীর্ঘশ্বাস ফেলল, "কোনো একদিন বলব।”

আরিশা আর প্রশ্ন করল না। অভ্রর কালো মুখ দেখে নিজেরও মন খারাপ হলো। কেন যে জিজ্ঞেস করতে গেল ওসব। ধুর।

টেবিলে রাখা অভ্রর হাতটা সে বড়ো কোমল হাতে ছুঁলো। কথা দিলে। নিভন্ত স্বরে, "আমি আর কিছু জানতে চাইব না, অভ্র। যেদিন তোমার মনে হবে সেদিন বোলো।"

CamScanner

অভ্র হাসল। কিন্তু ভেতরের ক্ষতটা জেগে উঠল না? যে মানুষটার চেহারাই মনে নেই তার হদিস জানবে কী করে? চোখ ফোটেই তো দেখেছে হাতে গোনা ওই তিনজনকে। তারাই ওর পৃথিবী। আর এখন আরিশাও যোগ হয়েছে সেই ছোট্ট দুনিয়ায়।

বিকেল নাগাদ কিছু ফাইলপত্র নিয়ে সেঁজুতির কাছে হাজির হয়েছেন মাহবুব। ও দেখে দিলে তারপর এসব রুদ্রর কাছে যাবে। ও সই করার পর পাশ হবে সবকিছু।

সেঁজুতি মনযোগ দিয়ে দেখছিল। রুদ্র সারাক্ষণ পেছনে ভালোবাসি ভালোবাসি বলে বেড়ালেও কাজের বেলায় সে ভীষণ স্ট্রিক্ট! একটা ভুল হলে একশ কথা শোনাবে। মাহবুব তখন সামনেই বসে। কাজে মগ্ন সেঁজুতিকে দেখলেন কিছু সময়। কথা বলার জন্যে ভদ্রলোকের জিভটা নিশপিশ করছে বড্ড। সেই উশখুশে চিত্তটাকে স্বায় দিলেন মাহবুব। প্রফুল্ল কন্ঠে বললেন, "ম্যাডাম, আমরা কিন্তু ভীষণ খুশি হয়েছি। আপনাকে আর স্যারকে পাশাপাশি দারুণ মানাবে।"

সেঁজুতির ব্যস্ত হাতটা থেমে গেল অমনি। চাইল মুখ তুলে, "মানে?"

মাহবুব তুষ্টতায় হইহই করে উঠলেন, "মানে ম্যাম আপনার আর স্যারের বিয়ের কথা বলছি।"

সেঁজুতি বিস্ফোরিত চোখে চাইল।

চাউনি দেখে ঘাবড়ে গেলেন ভদ্রলোক। আমতা আমতা করে বললেন, "না মানে স্যারই বলেছিলেন অফিসে।"

"কী বলেছেন?" সেঁজুতির কন্ঠ ভারি। মাহবুব বুঝে গেলেন পরিস্থিতি খারাপের দিকে যাচ্ছে। রুদ্র যেভাবে সেঁজুতির পিছু ঘুরে বেড়ায়, কারোর চোখ এড়ায়নি সেসব। কানাঘুষায় উনিও শুনেছিলেন। বস তার পিএ-র পেছনে ঘুরছে এই নিয়ে নিত্য আলোচনা চলে অফিসে। সকলে ব্যাঙ্গ করে, মজা নেয়। সেঁজুতিকে শান্ত ভেবে জিজ্ঞেস করেছিলেন। কিন্তু মেয়ে তো রেগে যাচ্ছে। মাহবুব ত্রস্ত ফাইল হাতে উঠিয়ে বললেন, "আমি এখন আসি, ম্যাডাম।"

ভদ্রলোক ঠিক গেলেন না, পালালেন এক রকম। সেঁজুতি কতক্ষণ পাথর বনে রইল। মাথার ভেতর দপদপ করে উঠল 'স্যার বলেছেন' কথাটা। এর মানে উনি অফিসে এসব রটিয়ে বেড়াচ্ছেন? এতটা নিচে নেমে গিয়েছে লোকটা? সেঁজুতি দাঁত পিষে বসে রয়। হাত ঘড়ি দেখে নেয় একপল। রুদ্র তখনও অফিসে আসেনি। পেয়েছে কী এই লোকটা? ইদানীং স্বস্তিতে ওকে শ্বাস ফেলতেও দিচ্ছে না। অফিসের আট ঘন্টা তো জ্বালিয়ে মারেই, রাস্তাঘাট যেখানে-সেখানে একটুও শান্তি দেয় না। সেবার তো পিছু নিয়ে নারায়নগঞ্জ চলে গেল। সেঁজুতি ক্লান্ত এসবে। এই

ভালোবাসার ফাঁদে দ্বিতীয়বার পা রাখার কোনও ইচ্ছে নেই। এক রাফিনেই তার ঢেড় শিক্ষা হয়েছে।

সারা দিন রুদ্রর অপেক্ষায় বসেছিল সেঁজুতি। ভালোবেসে নয়, রাগ আর জেদ মেটাতে। মানুষটা অফিসে ঢুকল সন্ধ্যেবেলা। বসুন্ধরার ব্রাঞ্চে কিছু ঝামেলা হয়েছিল। সব মিটিয়ে ফিরল কেবল।

সেঁজুতির কেবিনের দেওয়ালেও রুদ্রর মতোই টিভি ক্যামেরা রয়েছে। সেখানে একমাত্র রুদ্রর কেবিন ছাড়া বাকি সবদিকের ফুটেজ দেখা যায়। চেনা কালো গাড়িটা গেইট মাড়িয়ে ঢুকছে দেখতেই পিঠ সটান করে বসল সে।

রুদ্র কেবিনে এসে বসতেও পারেনি, হনহনে পায়ে চলে এলো সেঁজুতি। প্রশ্ন ছুড়ল চড়া গলায়, "এসবের মানে কী?"

রুদ্র চোখ তোলে। গাম্ভীর্যে ডুবুডুবু মুখটা পালটে আসে তত্র। এই তো, সারাদিনে এখন দেখল মেয়েটাকে। স্বস্তিহীন সবকিছু যেন উবে গেল তড়িৎ। এত শান্তি যাকে দেখলে, তাকে ছুঁতে পারলে, একটু বুকে জড়াতে পারলে কী হবে? নির্ঘাত আনন্দে মরে যাবে ও!

রুদ্রর নিষ্পলক চাউনিতে অন্যসময় অস্বস্তিতে গাঁট হতো সেঁজুতি। তবে আজকে ভয়ানক রাগে আগুন জ্বলছে মাথায়। চটে বলল, "আমি কিছু জিজ্ঞেস করেছি আপনাকে। উত্তর দিচ্ছেন না কেন?"

রুদ্র তার মুগ্ধতাকে সামলায়। পরপরই কপাল কুঁচকে বলে, "আপনি আবার অনুমতি না নিয়ে ঢুকেছেন?"

সেঁজুতি টেবিল থাপড়ে ঝুঁকে গেল। ক্রোধে একাকার হয়ে বলল, "রাখুন আপনার অনুমতি। আমার প্রশ্নের উত্তর দিন আগে।"

রুদ্র আশ্চর্য হলো খুব। মেয়েটা এমন করছে কেন? বুঝতে না পেরে বলল, "কী হয়েছে? কীসের উত্তর?"

"আপনি অফিসের সবাইকে কী বলেছেন? আমাদের খুব তাড়াতাড়ি বিয়ে হচ্ছে?" সেঁজুতির কণ্ঠে ক্ষোভ।

রুদ্র ত্রুটিযুক্ত ভ্রু মুছে গেল অমনি।

CamScanner

উঠে দাঁড়াল টানটান দেহে। কাঁধ উচিয়ে বলল, "এতে বলার কী আছে? আমাদের বিয়ে হলে ওরা কি দেখবে না?"

সেঁজুতি হতভম্ব হয়ে বলল, "মানে। এখানে বিয়ে শব্দটা আসছে কেন?"

"কেন, আমাদের কি বিয়ে হবে না? আজ হোক বা কাল, বিয়ে তো আপনাকে করবই।"

সেঁজুতির শরীর কেঁপে ওঠে। অনুভূতিতে নয়, রাগের জোয়ারে।

রুষ্টতায় চ্যাঁচিয়ে বলল, "আপনি আপনার সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছেন, রুদ্র রওশন চৌধুরী। অনেক সহ্য করেছি, আর না। এবার বন্ধ করুন এসব।"

রুদ্র হাসল।

"ভালোবাসা কী মেলে রাখা বই? বন্ধ করব কীভাবে?"

"ফাজলামো করছেন? আপনার মনে হয় এখন আপনার এসব ছ্যাচড়ামো সহ্য করার মতো অবস্থায় আছি আমি? দেখুন, ভালোয় ভালোয় বলছি এসব থেকে রেহাই দিন আমাকে। বাড়াবাড়ি করলে আমি কিন্তু আপনার নামে পুলিশ কমপ্লেইন করতে বাধ্য হব।"

রুদ্র এবারেও হাসল। হুমকিতে সে নিস্পৃহ। ডান ভ্রু নাঁচিয়ে শুধাল, "তাই, তা কী বলবেন আমার নামে?"

সেঁজুতির কাটকাট জবাব, "যা সত্যি তাই বলব। অফিসে চাকরি দেওয়ার নাম করে আপনি আমার সাথে দিনের পর দিন যে অসভ্যতা করছেন সেসব বলব।"

সহসা, রুদ্রর ঠান্ডা চোখ দুটোতে দপ করে আগুন জ্বলে উঠল। অথচ বরফ তার স্বর, "বেশি হয়ে যাচ্ছে।"

সেঁজুতি দমল না। উলটে তেতে ওঠে, "কীসের বেশি? আপনি আমাকে রীতিমতো টর্চার করছেন। আমার মানসিক শান্তি কেড়ে নিচ্ছেন। হ্যাংলার মতো ঘুরছেন চারপাশে। কী ভেবেছেন, আপনি কী চান সেসব আমি জানি না? বুঝি না? আমি এতটাই বোকা? আপনাদের মতো বড়োলোকের বখে যাওয়া ছেলেরা একটা মেয়ের পেছনে ঠিক ততদিনে ঘুরে বেড়ায় যতদিন না মেয়েটাকে বিছানায় নিতে পারে। আপনিও সেটাই চাইছেন। তাই তো?"

CamScanner

রুদ্রর কান ঝাঁঝিয়ে উঠল। মাথার ওপর বিস্ময়ের আকাশ ভেঙে পড়ে।

হুংকার ছুড়ল স্কুল স্বরে, "সেঁজুতি।"

"চ্যাঁচাবেন না। আমি আপনাকে ভয় পাই না। দিনের পর দিন আপনার জ্বালাতন সহ্য করে করে আমি বিধ্বস্ত হয়ে যাচ্ছি। আগে তো বেশি করে কাজ দিয়ে জ্বালিয়েছেন। আর এখন। এখন কুকুরের মতো পেছন ঘুরে জ্বালাচ্ছেন।

ক্রোধে বহ্নিশিখার ন্যায় জ্বলে উঠল রুদ্র। কপালের নীল শিরা দৃশ্যমান হতেই, শক্ত হাতে দুই বাহু চেপে ধরল সেঁজুতির। মেয়েটার পিঠ গিয়ে একল শুভ্র দেওয়ালে। হকচকিয়ে চাইল ওর দিক। রুদ্রর বাদামি চাউনি হিংস্রের ন্যায়। নিষ্ঠুর সেই তপ্ততায় যেন ঝলসে যাচ্ছে সেঁজুতি। পরপরই ফুঁসে উঠল সে। গায়ের সবটুকু জোর খাটাল রুদ্রর থেকে ছুটতে। পারল না। বলবান যুবকের নিকট শীর্ণ মেয়েটা তুচ্ছ খুব। রেগেমেগে বলল, "আপনি কী ভেবেছেন? গায়ের জোর দেখালেই আপনাকে ভালোবাসব? লিখে রাখতে পারেন, এই জন্মে আপনাকে ভালোবাসব না আমি!"

রুদ্র রুষ্টতায় দাঁত পিষে ধরে। অথচ পুরুষালি নিটোল ঠোঁটে তির্যক হাসি ফুটল। কথার বাণে ঠিকড়ে দিলো আত্মবিশ্বাস, "বাসবেন, এই জন্মেই হাসবেন। বরং এত বেশি ভালোবাসবেন যে, আপনার প্রতিটি নিঃশ্বাসে আমি থাকব। আপনার অন্তঃকরণের প্রত্যেকটা স্পন্দন হবে আমার নামে। আপনার রক্তসঞ্চালন অবধি পৌঁছে যাবে রুদ্রর নাম!"

সেঁজুতির হাসিতে শ্লেষ। বিরোধাভাস করে স্পষ্ট গলায়, "কক্ষনো না। আপনার ওসব স্বপ্ন, স্বপ্নই থেকে যাবে।"

অমনি আরও কাছে এগিয়ে এলো রুদ্র। প্রশস্ত দেহের কবলে, ঘনিষ্ঠতা বেড়ে দূরুত্ব মিটে যায়। এতক্ষণের চড়া গলা নেমে আসে খাদে, "স্বপ্নেও যদি আপনাকে পাওয়া যায়, তবে সেই স্বপ্ন আমি হাজারবার দেখতে চাই, সেঁজুতি।"

শীতল স্বরেও মেয়েটা কটমটিয়ে ওঠে। রুদ্রর অনাকাঙ্ক্ষিত এই স্পর্শতে জ্বলে যাচ্ছে শরীর।

"আমি খুব করে চাইব সেই স্বপ্নই যেন আপনার শেষ স্বপ্ন হয়, মিস্টার চৌধুরী। অন্তত এই যন্ত্রণার থেকে নিস্তার মিলবে আমার।"

বর্বরের ন্যায় মনের কথা উগলে দেয় সেঁজুতি। রুদ্র স্তব্ধ, বিস্মিত। হাতের বাঁধন শিথিল হলো সহসা। সেঁজুতি এক ধাক্কায় কাছ থেকে সরিয়ে দিলো ওকে। সেদিনের মতো আজকেও রুদ্র পিছিয়ে যায়। চেয়ে থাকে স্তম্ভিত লোচনে।

CamScanner

সেঁজুতি শক্ত কণ্ঠে বলল, "কথায় কথায় মেয়েদের গায়ে হাত দেওয়াটা পুরুষ মানুষের জঘন্য স্বভাব। আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, আপনিও সেই জঘন্য
পুরুষের একজন। এখন তো আমার রীতিমত সন্দেহ হচ্ছে, আপনার চরিত্র ঠিক আছে তো।"

বাকরুদ্ধ রুদ্র জবাব দিতে পারে না। প্রিয় নারীর বাক্যবাণ ঠিক বুকে গিয়ে বিধেছে। ছিন্নভিন্ন করে দিচ্ছে তার ভেতরটা। সেই কাঠ চেহারা, প্রজত দৃষ্টি সেঁজুতির কোমল হৃদয়কে ছুঁতে ব্যর্থ হয় আজ। সবকিছু উপেক্ষা করে বেরিয়ে যায় সে। পেছনে থেকে যায় বিমূর্ত এক যুবক।

২৩.

ফজরের আজানের সাথে সাথে ভেসে এলো ভোরের সূচনা সঙ্গীত। সিংগভাগ মানুষ তখন ঘুমে কাদা। অথচ দুচোখ মেলে সিলিংয়ের দিকে চেয়ে আছে সেঁজুতি। নির্ঘুম রাতটায় এক ফোঁটা চোখের পাতা এক করেনি সে। কেমন যেন হাঁসফাঁস লাগছে সবেতে।

সেঁজুতি বিছানা ছেড়ে এসে জানলা ঘেঁষে দাঁড়াল। আরিশা তন্দ্রায় জবুথবু তখন। একটু একটু করে মাথা তোলা কিরণ, নৈসর্গে আস্তেধীরে নিজের পূর্ণরূপ দেখাচ্ছে। পূর্বতে সূর্যদেব জ্বলজ্বল করলেও সেঁজুতির মনের সূর্যদেব উঠল না। সেথায় শুধু মুষলধারায় বৃষ্টি পড়ার আমেজ। নিষ্প্রভ নয়ন মেলে সে চেয়ে থাকে বাইরে। দূরের কদম গাছে কুন্দ ফুলের মতো একটা ভ্রমর বসেছে। কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুরছে কখনও।

সেঁজুতি বিরস চিত্তে চোখ ফিরিয়ে আনে। কালকের ঘটনা মনে পড়ে যায়। যেখানে কেবল রুদ্রর আহত মুখটার পায়চারি। মুহূর্তে পরিতাপের অনলে ছারখার হয় বুক। ইস, মানুষটা কত কষ্ট পেয়েছেন! রাগের মাথায় অত সব না বললেও হতো। রুদ্র হয়তো সত্যিই ওকে ভালোবাসে। সত্যিই ওকে চায়। কারো অনুভূতিকে এইভাবে অপমান করার অধিকার ওর নেই। সময় যত বাড়ছে, অনুশোচনা পাহাড় ছুঁচ্ছে সেঁজুতির। না না আর দেরি নয়, আজকে অফিসে গিয়েই ক্ষমা চেয়ে নেবে।

মাথা নুইয়ে ফোঁস করে শ্বাস ফেলল সেঁজুতি। হুট করে রুদ্রর হাস্যোজ্জ্বল মুখবিবর ধরা দিলো চোখে। লোকটা কী পাগলামিই না করেছে ওর জন্যে। নিজের গাড়ি, ফ্লাইট ছাড়া এপাশ-ওপাশ না করা মানুষটা শুধু ওর জন্য বাসে চড়েছিল। সেঁজুতির স্পষ্ট মনে আছে সেসব।

যখন রুদ্র দরজা থেকে উকি মেরে বলল, "একটা কথা বলব?"

"কী?"

CamScanner

"ভালোবাসি।"

সেদিন বিরক্ত হলেও, আজকে বুকটা ধক করে কেঁপে ওঠে মেয়েটার। কেন যেন হুটহাট গলবিল শুকিয়ে যায়। এমন হয়েছিল আরেকবার, যখন
রাফিনের প্রেমে পড়েছিল সে। সেঁজুতি চমকে উঠল ভেবেই। ছটফটে নজর তুরস্ত আসমানে ফেলল। হুরহুর করে ছুটে যাওয়া মেঘেদের শুধাল, "আমার কি জীবনটাকে আরেকবার সুযোগ দেওয়া উচিত?"

গত দিনের মতো আজকেও রুদ্রকে অফিসে দেখা গেল না। সকাল কাটল, দুপুর হলো, ঘনিয়ে এলো গোধুলি। অথচ রুদ্র আসেনি। পুরোটা সময় ঠিক কালকের মতোই সেঁজুতি ছটফট করল অপেক্ষায়। তবে আজ রাগে নয়, অন্য কারণে। কী কারণ মেয়েটা জানে না। নিজেকে বোঝাচ্ছে এই প্রতীক্ষার উদ্দেশ্য কেবল ক্ষমা চাওয়া। কিন্তু মন? ওরা কি এসব মানবে?

সেঁজুতি সংকোচ মাড়িয়ে রুদ্রর নম্বরে ডায়াল করে। একবার, দুবার, তিনবার প্রতিবার কল বেজে বেজে কেটে গেছে। রুদ্র ধরেনি। সেঁজুতির মন খারাপ শৃঙ্গ পেরিয়ে যায়। উনি কি অনেক বেশি রাগ করেছেন? না কি কষ্ট গেলেন? নাহলে ফোন ধরছেন না কেন? সেঁজুতি আনচানে মন নিয়ে কাজ করল। কয়েকবার এসে উকি মারল রুদ্রর কেবিনে। ফাঁকা, শূন্য চেয়ারটা দেখে মুচড়ে উঠল বুক। আজ যেন সেই একটি ডাকের জন্যে মনখানা মরিয়া হয়েছে। এ কী অসহ্য জ্বালাতন।

বশির যখন চা দিতে এলেন, মেয়েটা জিজ্ঞেস করেই বসল, "স্যার কি আসবেন না আজ? জানেন কিছু?"

"না তো, ম্যাডাম। মাহবুব স্যার জানতে পারেন।"

"ওহ, ঠিক আছে। আপনি যান।"

বশির বিদায় নিলেও সেঁজুতি ম্যানেজারের কাছে যায়নি। গতকালই লোকটা যা বলল, এখন রুদ্রর কথা তুললেও বিপদ! পুরো প্রসঙ্গটাতেই না রং ছড়িয়ে বসে।

সেঁজুতি আর উপায় দেখল না। সিদ্ধান্ত নিয়ে বসল, রুদ্রর ফ্ল্যাটে চলে যাবে। কী ভেবেছে কী লোকটা? এইভাবে অনুতাপে পুড়িয়ে মারবে ওকে? কখনও হবে না। সেঁজুতি ভুল করলে ক্ষমা চাইতে জানে। আর যে ক্ষমা করবে না ভেবে পালিয়ে বেড়ায়, তাকেও খুঁজে নিতে জানে।

CamScanner

করলও তাই। ঠিক আধ ঘন্টার মাথায় হাজির হলো রুদ্রর ফ্ল্যাটের সামনে। বেল টিপতেই পারভেজ দরজা খুলে দেয়। সালাম ঠোকে তৎপর।

"স্যার কি বাড়িতে আছেন, পারভেজ ভাই?"

"জি ম্যাডাম। খুব জ্বর ওনার।"

সেঁজুতি আঁতকে উঠল, "জ্বর! কখন থেকে?"

বলতে বলতে দ্রুত পায়ে ভেতরে ঢোকে মেয়েটা। পারভেজ জানায়, "কাল রাত থেকেই।"

"ডাক্তার ডেকেছেন?"

সে মুখ কালো করে বলল, "না। আমি কতবার বললাম, স্যার বারণ করলেন। বললেন আমি যদি আগ বাড়িয়ে কল দেই, কাজ থেকে বের করে দেবে। তাও কিছুতেই ডাক্তার দেখাবে না। আবার রুমের ধারেকাছেও যেতে নিষেধ করেছেন আমাকে। কী যে করি!"

ছেলেটার চেহারায় অসহায়ত্ব।

ফের বলল, "কাল রাতে অত বৃষ্টি হলো না? স্যার এক টানা ছাদে বসে ছিলেন। তারপর থেকেই ধুমসে জ্বর ছুটেছে গায়ে।"

সেঁজুতি থম মেরে গেল। এত জেদ আপনার স্যার? আমার ওপরের রাগ এভাবে নিজের শরীর দিয়ে মেটাচ্ছেন?

"আপনি ডাক্তার ডাকুন। আমি দেখছি।"

"কিন্তু স্যার যদি..."

"আমি বলব আমি ডেকেছি। যান।"

পারভেজ মাথা নাড়ল। চলে গেল ত্রস্ত।

সেঁজুতি উদ্বিগ্ন পায়ে রুদ্রর ঘরে রওনা করে। দরজা চাপানো তখন। চৌকাঠে আসামাত্রই শুনতে পেল গোঙানির শব্দ। মায়ায়, আক্ষেপে বক্ষপট চুরমার হয় মেয়েটার। ভেতরে এলো ব্যাপৃতে।

CamScanner

রুদ্র বিছানার সাথে লেপটে আছে। এত জ্বর। অথচ এসির তাপমাত্রা একেবারেই নিম্নে ঠেকানো। হিমের তোপে সুস্থ সেঁজুতিরই কাঁপুনি ওঠার জোগাড়। এসি বন্ধ করে সবার আগে জানলা খুলল ও। এক ফালি কোমল আলোর ছটা তুরন্ত লুটিয়ে পড়ল ফ্লোরে। কোথেকে ছুটে এলো গন্ধরাজের ঘ্রাণ।

সেঁজুতি বিছানার কাছে আসে। পায়ের নৈকট্যে থেকে কম্বল তুলে রুদ্রর গোটা শরীর ঢেকে দেয়। জ্বর দেখার জন্যে হাতটা বাড়িয়েও ফিরিয়ে আনে আবার। ঠোঁট টিপে ডুবে যায় জড়োতার নদীতে। রুদ্র এমনিতেই খুব ফরসা। জ্বর হওয়ায় মুখখানা ফ্যাকাশে লাগছে আরো। উষ্ণ জল জমাট বেঁধেছে বন্ধ চোখের কোনায়।

সেঁজুতি একটু থেমে, হাতটা রাখল ওর কপালে। চমকে উঠল নিজেই।

ইস, জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে!

রুদ্র ঘুমোয়নি। কোমল হাতের ছোঁয়ায় চোখ মেলে চাইল। সেঁজুতিতে দেখেই ভাঁজ বসল কপালে। অসুস্থতায়ও শক্ত শোনাল স্বর, "শাস্তি দেবেন না আমায়? এভাবে হ্যালুসিনেট করার মানে কী?"

সেঁজুতি প্রথমে বোঝেনি। পরপর মুচকি হেসে বলল, "কল্পনা ভাবছেন? আমি কিন্তু সত্যিই এসেছি।"

রুদ্রর ভ্রু শিথিল হলো অমনি। কিছুক্ষণ ঠায় চেয়ে রইল। গত দিনের কথা মনে পড়তেই অভিমানে ভরে এলো বুক। তড়িৎ মুখটাকে ঘুরিয়ে নেয় সে।

সেঁজুতি মন খারাপ করে বলল, "কথা বলবেন না? ইয়ে মানে, কালকের জন্যে আমি সরি। আমার আপনাকে ওভাবে বলা একদম উচিত হয়নি। দেখুন, কান ধরছি আমি।"

সেঁজুতি সত্যিই কান ধরল। রুদ্র সূচালো নেত্রে ফিরে চায়। কণ্ঠ সন্দিহান, "সত্যিই ক্ষমা চাইলেন?"

ও ঘাড় নাড়ল, "হ্যাঁ, সরি।"

"এভাবে তো ভালোবাসি বললেও পারেন।"

CamScanner

মেয়েটা তব্দা খেলেও কথার পিঠে উত্তর পেল না। উঠে দাঁড়িয়ে কক্ষ ছাড়ল শব্দহীন। রুদ্র শুয়ে থাকে। জ্বরের তোপে মাথা ঘুরছে। সবসময়ের বলিষ্ঠতায় উপচে থাকা শরীরটায় শক্তি নেই আজ। অক্ষিকূটে ফুটন্ত লাভা ঢেলেছে কেউ। এত গরম! মেলে রাখতেও পারছে না। ও শ্রান্তের ন্যায় ফের চোখ বুজে নেয়।

সেঁজুতি ঘরে ঢুকল তখনই। সাথে করে এক বাটি জল আর রুমাল এনেছে। সবকিছু টেবিলে রেখে টুল টেনে বিছানা ঘেঁষে বসল। আওয়াজ পেয়ে রুদ্র চোখ খুলল আবার। সেঁজুতি চুপচাপ রুমাল ভিজিয়ে কপালে জলপট্টি দেয়। ব্যাপারটায় থমকে থাকে রুদ্র। চোখেমুখে লেগে আসে অবিশ্বাসের ছাপ।

সেঁজুতি কাজে বহাল থেকেই বলল, "একটা মানুষের এত জেদ থাকতে পারে আপনাকে না দেখলে জানাই হতো না আমার। ডাক্তারটা দেখিয়ে নিলে এতক্ষণে সুস্থও হয়ে যেতেন। এভাবে বৃষ্টিতে ভেজার কী দরকার ছিল বলুন তো! শরীরের কী অবস্থা করেছেন, খেয়াল আছে?"

মেয়েটার কণ্ঠে নিপাত অভিমান। রুদ্রর ভরাট স্বর রুগ্ন শোনায়, "ডাক্তার দেখালে আপনি এইভাবে সেবা করতে আসতেন?”

সেঁজুতি ভ্রু গোছাল, "আপনি মনে হয় আগে থেকে জানতেন আমি আসব?"

রুদ্র কিছু বলল না। আচমকা কপালে থাকা ওর হাতটা মুঠোয় চেপে একল। সেঁজুতির বুক কাঁপে। ঢোক গিলে সটান করে পিঠের হাড় চেপে হাতটা এনে বুকে রাখল নিজের। পুরুষালি দগদগে কন্ঠস্বর আকুল হয়ে বলল, "এখানে খুব যন্ত্রনা হয় সেঁজুতি, জানেন। টের পাচ্ছেন কিছু?এই যন্ত্রনার কারণ আপনি, শুনতে পাচ্ছেন সেসব? যে আমি কখনো কারো না শুনিনি, সেই আমি দিনের পর দিন আপনার থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়ে যাচ্ছি। আছা, আপনিই বলুন না কী করলে আপনি আমায় ভালোবাসবেন? কী বললে আপনি ভুলে যাবেন পুরোনো সবকিছু? কী শোনালে আপনার মনে হবে আমি আপনার ভালোবাসার যোগ্য? আমার যে আর সহ্য হচ্ছে না। এই মর্ম পীড়া থেকে আমাকে মুক্তি দিন। এই অসহ্য ভোগান্তি থেকে রেহাই চাই আমার। আপনার প্রণয়ের আকাঙ্ক্ষা আমি চাই না বাড়াতে, সত্যিই চাই না। অথচ আমার মন, আমার হৃদয় আমার প্রতিকূলে। আমার অনুভূতিরা আমার অবাধ্য। ওরা বারণ শোনে না। প্রত্যেকটি সেকেন্ড ওরা ঘোষণা করে, আমি আপনাকে ভালোবাসি। আপনাকে আমার চাই। আপনার প্রেমের তৃষ্ণায় আমি ডুবে যেতে চাই কোনও কূলহারা অর্ণবে।"

রুদ্র আরো অনেক কিছু বিড়বিড় করল। স্পষ্ট এতটুকুই বুঝেছে সেঁজুতি। শীর্ণ গতর তার স্তম্ভ বনে গেছে। শিরার কানায় কানায় ছলকে উঠছে রক্ত। রন্ধ্রে কেবল অনুভূতির স্রোত। ঠিক

CamScanner

তেমনই বুকের ভেতরটা থরথরিয়ে কাঁপে। মৃগনয়নার চোখের কোটর কান্নার তোপে ফুঁসে উঠতে চায়।

রুদ্রর চোখ বন্ধ, ঠোঁট নড়ছে। প্রলাপ করছে শুধু। সবটাতে কেবল সেঁজুতির ভালোবাসা পাওয়ার আহাজারি। মেয়েটার ঠোঁট ভেঙে এলো আবেগে। যে নারী কখনো কাউকে ভালোবেসে ঠকেছিল, সেই নারী আজ কারো হাহাকারে বন্দি! একেই কি ভাগ্য বলে?

চোখ বেঁয়ে গড়িয়ে আসা জল আলগোছে মুছে নেয় সেঁজুতি। নিবিড় হয়ে রুদ্রর কপালে জলপট্টি দিতে থাকে। গরম তেল দিয়ে ওর হাত-পায়ের তালুতে মালিশ করেও দিলো।

এর মধ্যে আখতার সাহেব এসে দেখে গেলেন। রুদ্রর জ্বর একশ ছড়িয়েছে। সাথে রাত থেকে সে কিছু খায়নি। মালতি নাস্তা বানিয়ে দিয়ে গেল রুমে। সেঁজুতি রুদ্রর মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। নম্র কন্ঠে ডাকে, "শুনছেন? উঠুন। খাবেন না?”

রুদ্র নিভু চোখ মেলল। দুপাশে মাথা নেড়ে বোঝাল, খাবে না।

সেঁজুতির কন্ঠ মোলায়েম, "অল্প একটু খান। ওষুধ খেয়ে আবার ঘুমোবেন না হয়।"

দুর্বল রুদ্রকে ধরে ধরে বিছানায় আধশোয়া করে বসাল তারপর। পিঠের নিচে বালিশ দিয়ে হেলান দেওয়াল। মুখের সামনে খাবার ধরতেই রুদ্র বিহ্বল বনে চায়। জ্বরের পীড়া যেন কপূরের মতন উবে গেল সহসা। সেঁজুতি মৃদু হেসে বলে, "হাঁ না করলে খাওয়াব কী করে?"

রুদ্রর চোখে বিস্ময়। এসব কী সত্যিই ঘটছে? না প্রথমদিনের মতো আরেক কল্পনা? অমন সুস্থির চেয়ে চেয়েই হাঁ করল সে। সেঁজুতি খাবার মুখে পুড়ে দেয়। পুরোটা সময় রুদ্রর একইরকম চাউনি। খাওয়া শেষে সেঁজুতি ওড়না দিয়ে ওর ঠোঁট মুছিয়ে দিলো। বাকরুদ্ধ ছেলেটার মস্তিষ্ক বিকল হলো অমনি। দৈহিক নড়চড় অবধি বেমালুম ভুলে বসল যেন।

সেঁজুতি বুঝতে পারে। কিন্তু ধরা দেয় না। সব শেষে ওকে ওষুধ খাইয়ে শুইয়ে দেয় আবার। চুলে হাত গলিয়ে বলে, "এবার ঘুমান।"

রুদ্র শিশুর ন্যায় বলল, "কোথাও যাবেন না তো?"

সেঁজুতির ঠোঁটে হাসি, "না।"

ঘুরে পা বাড়াতে গেলেই রুদ্র হাত টেনে ধরল। ফিরে চাইল সে।

CamScanner

একবার হাতটা দেখে বলল, "কী হলো?"

"আমি ভীষণ একা, সেঁজুতি। আমার মা ছাড়া কেউ নেই। আপনিও আমায় একা করে যাবেন না যেন!"

রুদ্রর কণ্ঠে অনুনয়। এত দরদ ঢেলে থেকে যাওয়ার কথা কেউ বলতে পারে? সেঁজুতি কাছে এসে বসল।

মুচকি হেসে বলল, "আমি কোথাও যাব না। এখানেই থাকব। আপনি ঘুমান।"

"আমি যেন ঘুম ভেঙে আপনাকে দেখতে পাই।"

সেঁজুতি ঘাড় কাত করল, "ঠিক আছে।"

নিশ্চিন্ত মনে চোখ বুজল রুদ্র। খসখসে মুঠোতে তখনও সেঁজুতির হাত বন্দি। নিদ্রায় ডুবে না যাওয়া অবধি ওভাবেই ধরে রাখে। রুদ্র ঘুমিয়ে গেছে। চওড়া বুকে জোড়ালো শ্বাস। পুরোটা সময় সম্মোহের ন্যায় চেয়ে রইল সেঁজুতি। মানুষটার এত কাছে বসে সে, অথচ অস্বস্তি হওয়ার নাম নেই। এই যে রুদ্র হাত ধরে রেখেছে, কই একটুও তো খারাপ লাগছে না।

সেঁজুতির বিমোহে নিবিষ্ট হয়ে পড়ছে। অতীতের সব ঘটনা হানা দিচ্ছে চোখে। রুদ্রর একেকটি পাগলামিতে কখনো ঠোঁটে হাসি ফুটল। কখনো তার ভালোবাসা পাওয়ার অনুরোধে, ব্যথা উঠল বুকে। এমন অহংকারী, রাশভারি এক পুরুষ তার প্রেমে পড়বে কখনো ভেবেছিল? বিধাতার এ কেমন লেখা?

সেঁজুতি যখন ভাবনায় বুঁদ, আচমকা দোরপথ হতে ভেসে এলো একটি পুরুষালি থমথমে স্বর, “বাহ! চমৎকার। এর মানে আখতার যা বলেছে, সবই সত্যি দেখছি।"

নিস্তব্ধ কক্ষের হঠাৎ শব্দে, চমকে উঠল মেয়েটা। ঘুরে তাকায় তড়িৎ। রেহানকে দেখেই উঠে দাঁড়াতে চাইল। রুদ্রর মুঠোয় রাখা হাতটা বাধ সাধল ভাতে। ঘুমন্ত মানুষটা শক্তপোক্ত বাঁধনে হাত ধরেছে ওর। এই দৃশ্যে রেহানের মাথায় রক্ত চড়ে বসে। তবে লজ্জা পায় সেঁজুতি। পৃথিবীর সব অস্বস্তি জোট পাঁকিয়ে এসে কাঁধে বসল যেন। কোনোরকম রুদ্রর থেকে হাতটা সরিয়ে আনল সে। মিহি কণ্ঠে বলল, "আঙ্কেল, আপনি?"

"আমার ছেলের বাড়িতে আমিই তো থাকব। না কি কোনো বাইরের মেয়ের থাকার কথা?"

CamScanner

খোঁচাটুকু সেঁজুতি স্পষ্ট বুঝে ফেলল। অথচ একইরকম নম্র তার গলা, 'আমি ওভাবে বলিনি।"

রেহান সোজাসাপটা শুধালেন, "তুমি এই বাড়িতে কী করছ?"

সেঁজুতি তন্দ্রিত রুদ্রর পানে দেখল একবার। বাবার এত উঁচু স্বরেও তার ঘুম ভাঙেনি। ওষুধ কাজ করছে তবে।

ও বলল, "আঙ্কেল আমরা নিচে গিয়ে কথা বলি? উনি মাত্রই ঘুমোলেন”

রেহানের রাগে মাথা ফেটে যাচ্ছে। তার ছেলের ঘুমানো, জেগে থাকা নিয়ে এই মেয়ের চিন্তা দেখো। কিছু বলতে চেয়েও বললেন না। লম্বা পায়ে বেরিয়ে গেলেন।

সেঁজুতি বেরিয়ে আসতে পা বাড়ায়। থামে, ফিরে চায় আবার। রুদ্রর মুখখানা বড্ড নিষ্পাপের ন্যায় লাগছে। যেন কিছু জানে না। কিচ্ছু বোঝে বা। আর জেগে থাকলেই?এর থেকে সাংঘাতিক কেউ নেই। ভাবতেই আপনা-আপনি ওর পুরন্ত ঠোঁট হাসির বাণে সরে গেল দুদিক। বুক ভরে শ্বাস টেনে চলে গেল নিচে।

রেহান সিঁড়ির হাতল ঘেঁষে দাঁড়িয়েছেন। শরীর কাঁপছে ক্রোধে। রুদ্রর মতো একটা বিচক্ষণ ছেলে শেষে কি না এইরকম একটা মেয়েতে মন হারাল? ছিঃ ছিঃ

পায়ের শব্দ পেয়ে চোখ তুললেন তিনি। সেঁজুতি নামছে। ওকে দেখে ভদ্রলোকের মেজাজের আগুনে ঘি পড়ল যেন। মেয়েটাকে এসে দাঁড়াতেও দিলেন না, প্রশ্ন করলেন হাস্যহীন, "তোমার বাবা কী করেন?"

সেঁজুতির মাথা নোয়ানো।

"জি, স্কুল টিচার।"

সহসা চ্যাঁচিয়ে উঠলেন তিনি, "হোয়াট। একজন সামান্য স্কুল টিচারের মেয়ে আমার ছেলের বউ হওয়ার স্বপ্ন দেখছে?"

সেঁজুতি নম্র কন্ঠে প্রতিবাদ করে, "আপনার কোথাও ভুল হচ্ছে, আঙ্কেল। আমি ওনার বউ হওয়ার স্বপ্ন দেখিনি।"

CamScanner

রেহান ধমকে বললেন, "চুপ করো তুমি। তোমার মতো মেয়েদের আমার খুব ভালো করে চেনা আছে। যেই অফিসে দুটো ভালো করে কথা বলেছিলাম, কী ভেবেছিলে? আমার ছেলেকে কব্জা করবে আর আমি বসে বসে দেখব? সেদিন আমার সামনে, অফিসের সবার সামনে তুমি রুদ্রকে যা নয় তাই বলে অপমান করেছিলে। সেসব কিন্তু আমি ভুলিনি, সেঁজুতি। তুমি জন্ম তুলে কথা বলেছ আমার ছেলের। আমি তো এটাই বুঝতে পারছি না, রুদ্র কী করে ভুলে গেল ওসব? এরপরে ও কী করে তোমাকে ভালোবাসল? হাজারটা সম্ভ্রান্ত পরিবারের সম্বন্ধকে পায়ে ঠেলে সে এইরকম একটা সামান্য মেয়ের মাঝে কী খুঁজে পেয়েছে? কী আছে তোমার মধ্যে, হ্যাঁ?"

সেঁজুতির কণ্ঠ তরল, "সেটা তো আপনার ছেলেই ভালো জানবে, আঙ্কেল। আমি জন্ম থেকেই সামান্য, সাধারণ মেয়ে। নিজের মধ্যে অসামান্য কিছু খোঁজার চেষ্টা কখনও করিনি। আপনি বরং কথাটা ওনার থেকেই শুনে নেবেন।"

"প্রশ্নটা আমি তোমায় করেছি। তুমিই বলো তো, তোমার কী মনে হয়? আমার ছেলের পাশে দাঁড়ানোর মতো নূন্যতম যোগ্যতা তোমার আছে?"

"আমি আমার যোগ্যতার প্রমাণ আপনাকে দিতে চাই না। আর তাছাড়া আমি চাইও না আপনার ছেলের পাশে দাঁড়াতে। আমি নিজেও ওনাকে অনেকবার বুঝি..."

রেহান কথা কেড়ে নিলেন, "থামো তুমি। তোমরা কী চাও, কী না চাও, আর কী চাইতে পারো সেসব আমার খুব ভালো করে জানা আছে। তোমার মতো মেয়েদের উদ্দেশ্যই থাকে বড়ো লোক ছেলে ধরে তার গলায় ঝুলে হ্যোল লাইফটাকে সেটেল করে নেওয়া। যেই দেখলে আমার ছেলের অঢেল টাকা পয়সা, তখনই ছুঁকছুঁক শুরু করেছ। তা এসব শিক্ষা কি তোমার মা বাবাই দিয়েছেন তোমাকে?"

সেঁজুতি খেই হারাল মেজাজের। এতক্ষনের শান্ত স্বর শক্ত হলো নিমিষে।

"আপনার চোখে তো অপরাধ আমি করেছি। তাহলে এখানে আমার মা-বাবা কে টানবেন না। আমার মা-বাবা আমাকে যা শিখিয়েছেন সেই শিক্ষা কিন্তু অনেকেই তাদের ছেলে-মেয়েকে দিতে পারেননি। আপনি আমার বাবার মতো, তাই যে সম্মান আমি আপনাকে দিচ্ছি দয়া করে সেটার সুযোগ নিয়ে এমন কিছু বলবেন না, যাতে আমি আপনাকে অসম্মান করতে বাধ্য হই।"

বিস্ফোরিত নেত্রে চাইলেন রেহান। তপ্ত কণ্ঠে বললেন, "তুমি কি আমাকে শাসাচ্ছ? এই মেয়ে, তুমি জানো আমি কে? চাইলে কী করতে পারি আমি। এখানে বসে আমার একটা ফোন কল যে তোমার বাবার ওই এক তলা বাড়িটা চোখের পলকে উড়িয়ে দিতে পারে, জানো সেটা?"

CamScanner

শৈত্য হুমকিতে সেঁজুতির শীর্ণ বুক ছ্যাঁৎ করে উঠল।

রেহান ফের বললেন।, "তোমার মতো একটা মিডলক্লাস ফ্যামিলির মেয়েকে আমি আমার ছেলের বউ হিসেবে কোনদিন মেনে নেব না। বিশেষ করে যে আমার সামনে আমার ছেলেকে তার জন্ম নিয়ে কথা শোনায়, সেই অভদ্র মেয়ের ঠাঁই আমার বাড়িতে হবে না।"

সেঁজুতি চোখ বুজে বীতঃস্পৃহা ঝাড়ল। সে কী রুদ্রর বউ হতে আছে? মনের কোণে জেগে ওঠা প্রণয়ের আঁচটুকু এখনও যে ঠিকঠাক পাখা মেলেনি। জবাব দিলো মিহি গলায়, "আপনি ভুল ভাবছেন। আমি আপনার বাড়িতে কোনোদিন ঠাঁই নিতে চাইনি। কেন না জেনে কথা বলছেন, আঙ্কেল”

ভদ্রলোক কিছু বলতে চেয়েও থামলেন। কিছু একটা ভাবলেন দাঁড়িয়ে। সায় নিয়ে শান্ত করলেন নিজেকে। মুহূর্তেই পালটে গেল কথার সুর, "আচ্ছা বেশ!মেনে নিলাম, তুমি রুদ্রকে পছন্দ করো না। কিন্তু ও তো তোমাকে ভালোবাসে। আর যতদিন তুমি ওর চোখের সামনে থাকবে তোমার প্রতি আরো ডেস্পারেট হবে সে। তাহলে তুমি যখন ওকে চাওই না,ওর জীবনে থেকে কি করবে? তুমি নিজেও চাও না,ও তোমার পেছনে ঘুরে বেড়াক। তাহলে সরে যাও। এমন কিছু করো যাতে তোমার ছাঁয়াও রুদ্রর জীবনে পড়বে না।

সেঁজুতির বুকটা অজান্তেই দুরুদুরু করছে। কথা বলতে গিয়ে কেঁপে এলো কন্ঠস্বর, "কী বলতে চাইছেন?"

রেহানের চোখমুখ নিরেট।

ভণিতাহীন বললেন, "আজই ঢাকা ছেড়ে চলে যাবে তুমি। রুদ্র জানবে না তুমি কোথায়। খুঁজে পাবে না তোমাকে। তারপর নিজে থেকে ঠিক শুধরে যাবে। ভুলে যাবে তোমাকে।"

সেঁজুতির মস্তিষ্ক শূন্য হয়ে গেল। সব ছাপিয়ে অনুভূতি আটকে রইল শেষ লাইনে এসে। রুদ্রকে ভালোবাসে না এটা যে সূর্যের ন্যায় সত্যি। অথচ 'রুদ্র ভুলে যাবে' কথাটায় যেন বিকল হলো স্নায়ু। থিতিয়ে এলো হৃৎস্পন্দনের গতিপথ।

ভদ্রলোক ফের বললেন, "তারপর আমি আমার পছন্দের মেয়ের সাথে ওর বিয়ে দেবো। রওশন পরিবারের বউ হবে কোনো স্বয়ংসম্পূর্ণা মেয়ে। তোমার মতো ভিখারি বাড়ির মেয়ে নয়।"

সেঁজুতি জিভে ঠোঁট ভিজিয়ে বলল, "আপনার যদি এতই আপত্তি থাকে তবে আপনার নিজের ছেলেকে সামলানো উচিত। শুধু শুধু আমি ঢাকা ছাড়ব কেন।"

CamScanner

ভ্রু গোছালেন তিনি, "কেন? তোমার যখন আমার ছেলেকে পছন্দই নয়, তবে শহর ছাড়তে সমস্যা কোথায়? ও বুঝেছি। টাকা-পয়সা নিয়ে ভাবছ? ভেবো না। আমার কথা মেনে নিলে তোমার সমস্ত খরচার দায়িত্ব আমার।"

সেঁজুতি কিছু বলতেই যাচ্ছিল, বাধ সাধলেন রেহান। কটমটে কণ্ঠে বললেন, "উঁহু, না শুনতে আমি চাই না। যদি আমার কথার খেলাপ করেছ তো, তোমার ভুলের মাশুল কিন্তু তোমার পরিবার গুনবে, সেঁজুতি। আই সোয়্যার ইউ!"

মেয়েটা নিস্তব্ধ হয়ে পড়ল। মুখবিবর ফ্যাকাশে হলো অচিরে। ইঙ্গিত ধরতে এক ফোঁটাও ভুল হয় না। বিস্ময়াবহ নেত্রে কেবল দেখে গেল ওনাকে। প্রথম দিনের সেই রেহান, আর আজকের উনিটা যেন গুলিয়ে এলো মাথায়। হতবাক হয়ে বলল, "এসব আপনি কী বলছেন, আঙ্কেল?"

সেঁজুতির মুখায়বে স্পষ্ট ত্রাস। সুযোগটুকু লুফে নিলেন রেহান। নির্মমের ন্যায় বললেন, "ঠিকই শুনেছ। ধরো, হঠাৎ জানতে পারলে তোমার ছোটো বোন স্কুল থেকে আর ফেরেনি। পরেরদিন তার গুলিবিদ্ধ লাশ…"

"না।"

আর্তচিৎকারে থেমে যান রেহান। প্রৌঢ় ওষ্ঠপুটে ক্রুর হাসি ফোটে। ভ্রু উচিয়ে বললেন, "তাহলে তুমি রাজি?"

সেঁজুতির চোখের সামনে ঘোলা পৃথিবী তীব্র বেগে দুলছে। অসহায়ত্বের যাতাকলে পিষ্ট হচ্ছে বুক। চোখ, গাল ছাপিয়ে অশ্রুজল গলা অবধি এলো। মূর্তির ন্যায় দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। ঠোঁট নেড়ে বলল, "রাজি।"

বিজয়ী হাসলেন ভদ্রলোক। বুক ভরে শ্বাস টেনে পকেট থেকে চেকবই বের করলেন। ফটাফট সই করে বাড়িয়ে দিলেন সামনে।

"টাকার অঙ্ক বসিয়ে নিও। আশা করছি সারাজীবন বসে বসে খেতে পারবে।"

সেঁজুতি আর্ত চোখে চেক দেখল একবার। ভেজা অথচ শক্ত কণ্ঠে বলল, "দরকার নেই। এটা বরং আপনার কাছেই রেখে দিন। ছেলের বিয়েতে অনেক খরচ, তখন কাজে লাগবে।"

CamScanner

মুখের ওপর অপমানে রেহানের চেহারা থমথমে হলো। রাগে পিষে নিলেন দন্তপাটি। মটমটে চিবুকেও সেঁজুতির উদ্দ্বেগ এলো না। চোখ মুছে পিলপিলে পায়ে হাঁটা ধরল সে। চৌকাঠে এসে, ফিরে চাইল আবার। বসার ঘরের দেওয়ালে রুদ্রর একটা বড়ো ছবি ঝুলছে। স্যুটেড-বুটেড গম্ভীর লোকটা এদিকেই চেয়ে। চকচকে ফ্রেমের পানে নিষ্পলকচেয়ে রইল সেঁজুতি। চোখের দিঘল পল্লব চুইয়ে জল ঝরল কপোলে। মনে পড়ল রুদ্রর শেষ আবদার, "আমি যেন চোখ মেলে আপনাকে দেখতে পাই। আপনি আমায় একা করে যাবেন না যেন।"

সেঁজুতির বুক ফেটে কান্না এলো। আটকে রাখতে ঠোঁটে-ঠোঁট চেপে ধরে সবেগে। শ্বাস আটকে আসছে। ভেতরটায় নিষ্ঠুরের মতো কোপাচ্ছে কেউ। কুঠারের একেকটি ঘায়ে সেঁজুতির সবকিছু ধ্বংস হচ্ছে যেন। আচ্ছা, ও তো রুদ্রকে ভালোবাসে না। তাহলে এমন হচ্ছে কেন? ভালো না বেসে দূরে যাওয়ায় যদি এত কষ্ট, এত যন্ত্রনা? তবে ভালোবাসলে কী হতো? না কি রুদ্রকে ভালোবেসে ফেলেছে?

উত্তরের পূবেই রেহানের চণ্ড আওয়াজ শোনা যায়, "সংয়ের মতো দাঁড়িয়ে আছ কেন? বিদেয় হও।"

অপমানে, ক্লেশে জর্জরিত শূন্য হৃদয় নিয়ে সেঁজুতি রুদ্রর বিশাল ভবন হাড়ল। আর কখনও মানুষটার সাথে দেখা হবে কিনা জানে না। গাম্ভীর্যে উথলে আসা মুখ থেকে কথা শুনবে কি না জানে না। আচ্ছা, রুদ্র কি ঘুম ভেঙে ওকে খুঁজবে? যখন জানবে সেঁজুতি নেই, কী করবে? বাবার কথা মতোই ভুলে যাবে ওকে?

২৪.
নৈসর্গের আলো ধীরেসুস্থে মিলিয়ে ঘোর তমসা নামতেই ঘুম ভাঙে রুদ্রর। শোয়া থেকে ফুরফুরে মেজাজে উঠে বসে সে। একটু আগের কথাগুলো ভেবে প্রশান্তির শ্বাস টানল তারপর। সেঁজুতি এসেছে! শুধু কী আসা, রীতিমতো একটা ছোট্ট বাচ্চার মতো সেবা করেছে ওর। খাইয়েছে, মাথায় জলপট্টি দিয়েছে আরো কত কী। যা রুদ্র স্বপ্নেও ভাবেনি খুব তাড়াতাড়ি সেসব সত্যি হয়ে ধরা দিয়েছে মুঠোয়। ছেলেটা মুচকি হেসে নেমে দাঁড়াল। ফাঁকা ঘরের পুরোটাতে চোখ বোলায় একপল। সেঁজুতি কোথাও নেই দেখে তুরন্ত ভাঁজ বসল কপালে। মেয়েটা তাকে ওয়াদা করেছিল না? বলেছিল তো থাকবে এখানে। ওয়াশরুমের দরজা বাইরে থেকে বন্ধ। সাথে শূন্য বারান্দা দেখে মনটা ঝুপ করে খারাপ হলো রুদ্রর।

পরপরই চটে গেল মেজাজ। সেঁজুতি কি চলে গেছে? এর মানে ওকে মিথ্যে বলেছিল? ভালোবাসে না, আবার মিথ্যে মিথ্যে ওয়াদাও করে, বাহ!

CamScanner

রুদ্র দাঁত পিষে টেবিলের পায়ায় ক্ষুব্ধ লাথি বসাল। কেন এই অল্পতেই ভেবে নিয়েছিল সেঁজুতি ওর? কেন মানুষের সামান্য ভালো ব্যবহারেই ও দুনিয়া ভুলে যায়? সেঁজুতি তো ওকে ভালোবাসে না।

রুদ্র আহত মনে কাউচে এসে বসল। মিনিট কয়েকের বিশ্রান্ত চিত্তে সচেতন হলো পরপর। সেঁজুতি নিচে নেই তো? প্রত্যাশায় উথলে আসা বুক নিয়ে কক্ষ থেকে লম্বা পায়ে বেরিয়ে যায় সে। অদম্য বিশ্বাস হইহই করে বলছে, সেঁজুতি নিচেই থাকবে।

রেহান চৌধুরী এখনও যাননি। সোফায় বসে চোখের সামনে পত্রিকা মেলে ধরেছেন। মনযোগ নষ্ট হলো সিঁড়িতে কারো জোরালো পায়ের শব্দে। ধীরে-সুস্থে চোখ তুললেন তিনি।

রুদ্রর ঠোঁটে হাসি। স্ফূর্তি তার চোখেমুখে। ভদ্রলোক আশ্চর্য হলেন খুব। বড়ো হওয়ার পর ছেলেটাকে এক ফোঁটা হাসতে দেখেননি। সেখানে আজ এইভাবে হাসছে?

বিহ্বলতায় উঠে দাঁড়ালেন রেহান। তক্ষুনি রুদ্রর নজর পড়ল এদিকে। অবাক হয়ে বলল, "তুমি এখানে!"

রেহান এগিয়ে এলেন। কন্ঠে উদবেগ, "শুনলাম তুমি অসুস্থ!"

রুদ্রর ব্যস্ত কদম শান্ত হয়। আস্তে-ধীরে সবার শেষের সিড়িটায় এসে থমে। জবাব দেয় ভীষণ ছোটো, "ঠিক আছি এখন।"
বলতে বলতে তার হন্য চোখ চারপাশে দেখে নিল।ছেলের মতিগতি বুঝে ফেললেন রেহান

তাও শুধোলেন, "কাউকে খুঁজছ?"

রুদ্রর ভণিতাশূন্য জবাব, "হুঁ, সেঁজুতিকে।"

তিনি অবাক হওয়ার ভান করে বললেন, "সেঁজুতিকে? কেন, ও এখানে ঐ করছে? তাও এই রাতেরবেলা?"

রুদ্র সেই উত্তরে গেল না। হুট করে পারভেজ কে ডাকল। ঝড়ের বেগে ছুটে আসে সে।

"জি স্যার!"

"সেঁজুতি কোথায়?"

CamScanner

"স্যার, আমি তো বাজার করতে গিয়েছিলাম। এসে ম্যাডামকে পাইনি। মনে হয় চলে গিয়েছেন।"

রুদ্রর বুক মুচড়ে উঠল ব্যথায়। শুভ্র মুখটার চারপাশ ডুবে গেল মেঘে। সেই আমাকে কথা দিয়েও চলে গেলেন সেঁজুতি?

ছেলের মলিন চেহারা তীক্ষ্ণ চোখে মেপে নিলেন রেহান। পারভেজকে ইশারা করলেন যেতে। বিনাবাক্যে সে প্রস্থান নিতেই গলা ঝাড়লেন তিনি। বয়সয়ে শুধোলেন, "তা সেঁজুতি এখানে কেন এসছিল?"

রুদ্রর ধ্যান ভাঙে। বক্ষ পীড়া মাড়িয়ে আত্মস্থ হয় জলদি। জানায় দায়সারা, "এমনি।"

"এমনি? এমনি এলে ওর চলে যাওয়া নিয়ে তুমি এত উতলা থাকতে না”

রুদ্র ঠান্ডা চোখে চাইল।

"তুমি ঠিক কী শুনতে চাইছ, ড্যাড? সেঁজুতির সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক, তাই তো?"

সোজাসাপটা প্রশ্নে ভড়কে গেলেন ভদ্রলোক। কিন্তু ধরা দিলেন না। কন্ঠস্বর অটল রেখে বললেন “হ্যা আমি সেটাই জানতে চাইছি। সেঁজুতি কেন তোমার বাড়িতে এমন অবাধে যাতায়াত করে, রুদ্র? না কি আজকাল ও এখানেই থাকছে?”

রুদ্র মুখ ফিরিয়ে নেয়। চেহারায় বিরক্তি। একে তো সেঁজুতি না বলে চলে গেছে, দুইয়ে এসব প্রশ্নবাণে অতীষ্ঠ সে।

ছেলের নীরব অবজ্ঞায় উষ্মায় থরথরিয়ে উঠলেন রেহান। খ্যাপে বললেন, "তুমি কিন্তু আজকাল সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছ, রুদ্র। আমি তো ভাবতেই পারছি না, আমার ছেলের চরিত্র এমন হতে পারে। বিয়ের আগে কোনোরুপ বৈধ সম্পর্ক ব্যতীত একটা মেয়েকে কী করে এই বাড়িতে তুলতে পারো তুমি? ডাক্তারের কথায় এখানে না এলে তো সত্যিটা জানতেও পারতাম না।"

রুদ্র চট করে ফিরল। সতর্ক কন্ঠে বলল, "ও। এর মানে তুমি আমাকে দেখতে নয়, যাচাই করতে এসেছিলে সেঁজুতি এখানে আছেন কি না?"

রেহান থতমত খেলেন। বলতে গেলেন, "আ, আসলে..."

CamScanner

রুদ্র থামিয়ে দেয়। ওষ্ঠপুটে বক্র হাসি টেনে বলে, "কষ্ট করে আর মিথ্যে বলার দরকার নেই, ড্যাড। আই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড। হ্যাঁ, আমি সেঁজুতিকে ভালোবাসি। জিজ্ঞেস করেছিলে না সেদিন? আজ উত্তর দিলাম। তবে আমার মনে হয় না কথাটা আমার মুখ থেকেই প্রথম শুনেছ তুমি। কারণ, ইদানীং তো আমার পেছনে গোয়েন্দাগিরি করা তোমার রুটিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। তুমি যে সব জেনেই এখানে এসেছ, আ'ম শিওর এবাউট দ্যাট। তাই শেষ একটা কথা বলি তোমাকে, সেঁজুতি এখানে থাকে না ঠিকই। তবে খুব শীঘ্রই পাকাপোক্তভাবে ওনাকে এই বাড়িতে তুলব আমি। না, অবৈধভাবে নয়। বিয়ে করেই তুলব। তুমি ভেবো না, ডাকব তোমাদের।"

সহসা চড়া গলায় বিরোধাভাস করলেন তিনি, "অসম্ভব! একটা সামান্য স্কুল টিচারের মেয়েকে আমি আমার ছেলের বউ হিসেবে কোনও দিন মেনে নেব না, রুদ্র।”

বাবার রুষ্ট ধ্বনি, উঁচু বাক্যেও নিরুদ্বেগ সে। জবাব দিলোও নির্লিপ্ত, "সেটা তোমার সমস্যা। আমার নয়।"

রেহান হতবাক হয়ে বললেন, "এর মানে? তুমি আমার মতের বাইরে যাবে, রুদ্র?"

"যেখানে অফিসের সামান্য রুলস নিয়েও কম্প্রোমাইজ করি না। সেখানে আমার ভালোবাসা নিয়ে কম্প্রোমাইজ করব তোমার মনে হয়?"

ছেলের ছুড়ে দেওয়া ইঙ্গিত বুঝতে রেহানের এক দণ্ডও সময় লাগেনি। হতাশায়, ব্যর্থতায় শুভ্রকায় আদল ডুবে গেল আঁধারে। মুখে যা এলো উগড়ে দিলো সেটুকু, "বাবার অবাধ্যতা করার শিক্ষাটা তোমার মা তোমাকে ভালোই দিয়ে গেছেন দেখছি।”

রুদ্রর স্বভাবসুলভ অভিব্যক্তি বদলে গেল অমনি। নিরেট চিবুকের দুধার আরো মটমটিয়ে উঠল। হিমের চেয়েও শীতল চাউনিদ্বয় বড়ো আরামসে উপেক্ষা করলেন ভদ্রলোক। বলে গেলেন নিজের মতোন, "তোমার মা আমাদের দুই ভাইবোনের জীবনটা শেষ করে দিয়ে গেছেন। এবার তুমি আমার সুনাম শেষ করতে উঠেপড়ে লেগেছ, তাই তো?"

কথায় দাঁড়িও পড়েনি, আচমকা ঘর কাঁপিয়ে হেসে উঠল রুদ্র। যেই হাসি দেওয়াল থেকে ও দেওয়াল পেরিয়ে যায়। সমুদ্রের বিক্ষিপ্ত ঢেউয়েরা যেমন আছড়ে পড়ে কূলের বুকে? সুতনু যুবকের এই হাসিও ঠিকড়ে পড়ছে তেমন।

পরিষ্কার তুচ্ছতাচ্ছিল্যের আভাসে রেহানের মাথায় আগুন ধরে গেল।

CamScanner

রুদ্র সময় নিয়ে থামে। হাসি মুছে মুখখানা করে ফেলল প্রস্তরাদিসম। কন্ঠে শ্লেষের বন্যা, "হাসালে ড্যাড! তোমার যে সুনাম এসেছে রুদ্র রওশন চৌধুরীর কাঁধে ভর করে, সেটা নিয়ে তাকেই কথা শোনাচ্ছ তুমি? ভুলে গেলে? আমি ব্যবসায় হাত দেওয়ার আগ অবধি, তোমার এই ইন্ডাস্ট্রিজ কেউ চিনতও না!"

রেহান দাঁত পিষে বললেন, "অহংকার করছ?"

রুদ্র মুখের ওপর জবাব দেয়, "হ্যাঁ, করছি। মায়ের থেকে অবাধ্য হওয়া শিখলে বাবার থেকেও তো কিছু শেখা উচিত।"

স্পষ্ট কথার পিঠে হতভম্ব হয়ে গেলেন তিনি। উত্তর দেবেন কী, বিস্ময়ে টের পেলেন শব্দভান্ডার শূন্য হয়ে এসছে। রুদ্র নির্ভিক চিত্তে ঘোষণা দিলো, "সেঁজুতির একটা হ্যাঁ-এর অপেক্ষায় আছি আমি। ততদিন অবধি তুমি যা করার করতে পারো। কিন্তু যেদিন উনিও আমায় ভালোবাসবেন? আই সোয়্যার ড্যাড, সৃষ্টিকর্তা ছাড়া এই রুদ্র কাউকে মানবে না। তোমাকেও না।"

রেহান স্তব্ধ। পাথর বনে দাঁড়িয়ে রইলেন শুধু। রুদ্র ফিরতে এক পা বাড়াল। হঠাৎ থেমে, ঘুরে তাকাল আবার। শান্ত অথচ কড়া কন্ঠে বলল, 'আর হ্যাঁ, আমার মা নয় বরং তুমিই তাঁর জীবন বিষিয়ে দিয়েছিলে। এখন তো সে নেই ড্যাড, এবার অন্তত রেহাই দাও। আর কত নিজেকে নিচে নামাবে, বলো তো?"

রুদ্র আর এক মুহূর্ত থামল না। গটগটিয়ে ঘরে রওনা করল। একবার ঘুরেও চাইল না নিথরের ন্যায় দাঁড়িয়ে থাকা বাবার পানে। ছেলের গমনপথে চেয়েই ক্রোধে ফেটে পড়লেন রেহান। মাথার প্রতিটি নিউরন সুদ্ধ টগবগিয়ে উঠল। দাঁত কিড়মিড় করলেন নিজে নিজে। পরপরই মুখভঙ্গি ই মেয়ের হাগের বদলাই।রাগের বদলে পৈশাচিকতায় বেঁকে আসে ঠোঁটদুটো। ভাবলেন, "ওই মেয়ের মুখ থেকে “হ্যা” শব্দটা তুমি আর শুনতেও পারবে না।যে ভয় আমি দিয়েছি সেঁজুতিকে, সে কখনও তোমার সামনেও আসবে কিনা সন্দেহ! তাহলে এবার দেখা যাক, এই লড়াইয়ে কে জেতে?"

সেঁজুতি অনেক ভেবেও ঠিক করতে পারছে না কোথায় যাবে, কার কাছে যাবে। আত্মীয় স্বজনের চিন্তা যে প্রথমেই অচল। মেয়েটার তীরহারা সাগরে একমাত্র সাহারা ছিল আরিশা। এখন ওর কাছ থেকেও চলে যেতে হচ্ছে। রুদ্র যে ওই ঠিকানা আরো আগে থেকেই জানে। কিন্তু কীভাবে চলে যাবে? আরিশাকে সব খুলে বললে মেয়েটা ওকে কোনওদিন ছাড়বে না। আবার ঢাকার মধ্যে থাকলেও রুদ্র এক চুটকিতে ওকে খুঁজে বের করবে। নারায়নগঞ্জে গিয়েও যার থেকে রেহাই পেল না সে কি এমনি এমনি নিস্তার দেওয়ার লোক? সব মিলিয়ে সেঁজুতি চিন্তায় হাঁসফাঁস করে

CamScanner

উঠল। দমবন্ধ বাতায়ণে প্রাণ ফেরাতে বাসের জানলা খুলল তৎপর। চলতে থাকা গাছগুলোতে ফেলে রাখল ভেজা চোখের ঝাপসা মনযোগ। সময় গড়াতে গড়াতে যত রাস্তা ফুরিয়ে যাচ্ছে? হুট করে ওরাই যেন জানিয়ে দিলো সেঁজুতির পরের গন্তব্য কোথায়!

রুষ্ট দুটো চোখ নিয়ে কাউচের দিকে একভাবে চেয়ে আছে রুদ্র। ঠিক যেখানে ওইদিন ঘুমোচ্ছিল সেঁজুতি। যেবার প্রথম কাছ থেকে ওর মেদুর আনন বিঁধে যায় নজরে। ব্যস। যত ক্ষোভ পাতা ঝরার ন্যায় খসে পড়ল অমনি। রুদ্র ক্লিষ্ট ঢোক গেলে। ব্যথায়, বেদনায় উথলে আসে কন্ঠনালি, "আর কত জ্বালাবেন আমায়, সেঁজুতি? আর কত পোড়াবেন? আজ যদি আপনিও আমায় ভালোবাসতেন এই মুহূর্তে আপনাকে বিয়ে করে ফেলতাম। কিন্তু না, আপনি তো অটল। দুনিয়ায় সব করা গেলেও আমাকে ভালোবাসা যাবে না।

তাই বলে কিন্তু আমি হার মানিনি। আপনার ভালোবাসা আদায়ের জন্যে রুদ্র বিশ্রান্ত হবে না, সেঁজুতি। কোনো দিন না।"

একটু থামল সে। ফের বলল, "কিন্তু আপনিও আজ ঠিক করেননি এটা। আমাকে কথা দিয়েও চলে গেলেন? অবশ্য কষ্ট তো সেদিন থেকেই দিচ্ছেন যেদিন থেকে ভালোবেসেছি। শুধু আজ দিলেন বুক মুচড়ে ওঠা ব্যথা। বুঝিয়ে দিলেন আমি আপনার কাছে কতটা গুরুত্বহীন!"

রুদ্র দীর্ঘশ্বাস ফেলল। পাশে রাখা মুঠোফোন বেজে উঠল তখন। স্ক্রিনে আরিশার নাম ভাসছে। ওইদিনই সেভ করেছিল রুদ্র। ও রিসিভ করল। মেয়েটার অস্থির প্রশ্ন ছুটে এলো নিমিষে, "ভাইয়া, সেঁজুতি আছে?"

রুদ্র ভ্রু গোছায়, আশ্চর্য হয়। সেঁজুতি আছে মানে কী? রাত নয়টা বাজে, ওনার তো এখন বাসায় থাকার কথা। সে হাঁ করতে যাবে, আরিশা নিজেই হড়বড় করে বলল, "আমি না ওকে অনেকক্ষণ ধরে ফোন করছি। বারবার সুইচড অফ বলছে। ও তো কখনও ফোন অফ রাখে না। অফিসের নাম্বারেও কল করলাম, ধরছে না। তাই বাধ্য হয়ে আপনাকেই..."

রুদ্রর শুভ্র ললাট টানটান হয়। একটা সুক্ষ্ম খটকা জেগে ওঠে মনে। ফোন বন্ধ মানে? ব্যস্ত জবাব দিল, "আমি দেখছি।"

সেঁজুতির ট্রেন দশটা দশে। ঘড়িতে দশটা বেজে গেছে প্রায়। এই মুহূর্তে মেয়েটা মূর্তির ন্যায় স্টেশনের বেঞ্চে বসে আছে। হাতে টিকিট, কাঁধে ব্যাগ। ব্যস। এভাবেই রওনা করছে সিলেটে। ওর আরো একজন ভালো বন্ধু রয়েছে, সাবরীন। অনাসেই আলাপ। তবে মেয়েটা বিবাহিত। বিয়ের পর, বর সমেত সেখানেই থাকে। আরিশার মতো ঘনিষ্ঠতা না থাকলেও, সম্পর্ক ভালো।

CamScanner

কোথায় যাবে, কার কাছে এসব নিয়ে দুশ্চিন্তায় যখন সেঁজুতির শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসছিল? ঠিক সেসময় আচমকাই সাবরীনের নামটা উঠে এলো মাথায়। দুজনের কথাও হয়েছে। সে যাবে শুনে সাবরীন এক পায়ে রাজি। আপাতত ওখানে গিয়ে থাকবে সেঁজুতি। এক সপ্তাহের মধ্যেই কোনো চাকরি জুটিয়ে অন্য কোথাও চলে যাবে তারপর।

ও যে সিলেট থাকতে পারে, রুদ্রর তা আন্দাজেও আসবে না। ভালোই হলো সব দিক দিয়ে। আচ্ছা, লোকটা ওকে আটকে রাখতে একটা চুক্তি করেছিল না? তিন বছরের চুক্তি। কী হবে সেই চুক্তির? ও যে চলে যাচ্ছে। চুক্তির জন্যে হলেও কি রুদ্র ওকে খুঁজবে? জানতে পারবে কখনও, ওনাকে ছুড়ে আসা সেই চ্যালেঞ্জে সেঁজুতি যে গো-হারান হারল?ইস, কখনও কি বলা হবে?বলতে পারবে সেঁজুতি?

"মিস্টার নাক উঁচু রুদ্র রওশন চৌধুরী, আপনার সাথে শুরু হওয়া লড়াইটা শেষ হওয়ার আগেই আমি হেরে গেলাম। জরিমানা দায়ের করবেন এখন? শুধু অফিসের নয়, নিজের সঙ্গে করা লড়াইয়েও জয় আসেনি আমার। স্বীয় চুক্তিটাও টেকেনি দেখুন। আপনি টিকতে দিলেন না। এতবার নিজেকে বুঝিয়েও আমি ব্যর্থ। আপনার সম্মোহনী প্রেম আমাকেও টেনে নিয়েছে হয়তো। নাহলে কেন এত কষ্ট হচ্ছে আমার? বুকের এই ক্ষতটাই বা কীসের?"

সেঁজুতি ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। সেকেন্ড কয়েকেই আবার শক্ত করে মন। না, আবেগে ভাসা চলবে না। যে শহরে মানুষের মনের কোনো দাম নেই, সেখানে আবার আবেগ! নিজেকে সামলায় ও। মাথার মধ্যে রেহানের হুমকিগুলো কিলবিলিয়ে ছুটছে। মেগাফোনে তখন ট্রেন আসার ঘোষণা হলো। সেঁজুতি চোখের জল মুছে উঠে দাঁড়ায়। আস্তেধীরে অজগরের ন্যায় লম্বা ট্রেনটা দৌড়ে এসে থামল তার সামনে। অপেক্ষায় থাকা যাত্রীরা সব ফুঁসে উঠল ভেতরে যাওয়ার জন্যে। ভিড়টা যখন কমে আসে, তখন পা বাড়ায় সেঁজুতি। এক পা গিয়ে দাঁড়িয়ে যায়। ঘুরে দেখে নেয় চারপাশ। এই চারটে মাস তার কাছে অনেক কিছু। না চাইতেও কত কী পেয়েছিল এখানে। আর সবথেকে দামি যেটা পেয়েছে? সে হলো রুদ্রর মতো পাগল প্রেমিক। যার প্রণয়াকাঙ্ক্ষার কাছে পৃথিবীর সবকিছু তুচ্ছ। যার এক বুক তেষ্টার নিকট পথিকের তৃষ্ণাও ব্যর্থ হবে হয়তো। সেঁজুতি রাঙা ঠোঁট পিষে ধরে। কান্না আটকানোর বাধ সাজায় নরম ত্বকের মাঝে। না না, এসব আর ভাববে না। রুদ্রর কথা যত মনে করবে, তত দুর্বল লাগবে নিজেকে। তত বেশি যন্ত্রণা হবে বুকে। এমন হলে ও যাবে কী করে? আর না গেলে যে.... সেঁজুতি আর ভাবতে পারল না। দুদিকে মাথা নেড়ে অটল রইল সিদ্ধান্তে। যেচে পড়ে নিজের পরিবারকে বিপদে ফেলার দুঃসাহস তার নেই। হবেও না কখনও।

সেঁজুতি ট্রেনে উঠল। ভেতরে না ঢুকে দাঁড়িয়ে রইল দরজায়। চারপাশটা দেখল ক-বার। দূর থেকে বহুদূর, যতটা দেখা যায়। মন বলছে কেউ আসবে। কেউ ডাকবে ওকে। খুব রাগ দেখিয়ে বলবে, "আমায় ফেলে চলে যাচ্ছেন, সেঁজুতি? কোথায় পেলেন এত সাহস?"

CamScanner

সেঁজুতির হৃদয় তোলপাড় করে কান্না পেল। মুখ লোকাতে ঝড়ের বেগে চলে এলো ভেতরে। ভেজা চোখ মুছে মন দিলো কেবিন খুঁজতে। সময় লাগেনি। দরজার দুটো কেবিন পরের কেবিনটাই ওর। ভেতরে তখন পুরোপুরি ফাঁকা। বাকি যাত্রীরা পৌঁছায়নি হয়তো। সেঁজুতি গিয়ে জানলা ঘেঁষে বসল। দুর্বলের মতো মাথা এলিয়ে রাখল সিটে। চোখের পর্দায় রুদ্রর মুখটা ছাড়া আর কিচ্ছুটির দেখা নেই। ভাবল মন দিয়ে, ওনার কি ঘুম ভেঙেছে? খুঁজছে আমায়? জেনে গেছে আমি নেই? উনি হয়তো ভাবছেন, ওনাকে দেওয়া কথা আমি রাখিনি। এর শোধ তোলার ফন্দিও আঁটছেন হয়তো। অনেক বেশি কাজ দেওয়ার পাঁয়তারাও করবেন। ইস, যখন জানবেন এই শহরের কোথাও আমি নেই কেমন করবেন উনি?

কেবিনের দরজা খোলার শব্দ হলো হঠাৎ। তুরন্ত গলবিলে উপচে আসা কান্নার ঢেউ গিলে নিলো সেঁজুতি। চোখ না খুলে ঠায় বসে রইল। ধরেই নিলো, হয়তো কেবিনের অন্য যাত্রী এসেছেন। তারপর কেটে গেল অনেকক্ষণ। আগন্তুকের বিন্দুমাত্র সাড়া নেই। বাতাসে শুধু নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ ভেসে বেড়ায়। চোখ বুজেও সেঁজুতির মনে হলো কেউ দেখছে ওকে। নিবিষ্ট ধ্যানে আবিষ্ট মোহ। একযোগে তাকিয়ে আছে যেন। চট করে চোখ মেলল সে। দুনিয়া কাঁপিয়ে চমকে উঠল অমনি।

বিস্ময়ের মাত্রা গাঢ় থেকে প্রগাঢ় হয়। কপালের ঘাম বাড়ে। লাগাম ছাড়ায় বক্ষপটে তেড়ে ওঠা উচাটন। অথচ ঠিক যতটা উৎকণ্ঠিত সে, সামন বসা মানুষটা ততটাই স্থির।

ট্রেন চলছে। লোহার চাকায় তার ঝিকঝিক ঝিক ঝিক শব্দ। পাশের ছোট্ট চারকোনা জানলা ছাপিয়ে হুহু করে হাওয়া আসছে ভেতরে। সামনের ক্ষুদ্র কাঠের টেবিলটা বাধা হয়েছে মুখোমুখি বসা মানুষ দুটোর। নিশ্চল নয়নে একে অপরকে দেখছে তারা। সেঁজুতি না হয় বিস্ময়ে শব্দ খুইয়েছে, কিন্তু ওই মানুষটা? সে চুপ করে কেন? কেন কথা বলছে না? তবে কি সে কল্পনা? রাতের অন্ধকারে দেখা কোনো চকচকে স্বপ্ন? সেঁজুতি ঢোক গিলল। টইটম্বুর চোখ নিয়ে প্রশ্ন করল মিহি স্বরে, "আপনি কি সত্যিই এসেছেন?"

কন্ঠ ভীষণ রকম কেঁপে এলো সাথে। লোকটা যদি উত্তর না দেয়, কিংবা ভ্রম হিসেবে উবে যায়? ও কি মেনে নিতে পারবে? সব চিন্তা-চেতনার ছেদ ঘটিয়ে জবাব দেয় সে, "চলে যাচ্ছিলেন?"

শাণিত ওই আওয়াজ সেঁজুতির প্রতিটি শিরায় মিশে গেল। এর মানে সত্যিই রুদ্র এসেছে? সেঁজুতি খুশি হতে গিয়েও থমকাল, ভয় পেল। উনি কীভাবে জানলেন আমি ট্রেনে? চলন্ত ট্রেনে উঠলেনই-বা কী করে? ধরা পড়েছে মানে এখন তো আর যাওয়া হবে না। উনি যে কিছুতেই যেতে দেবেন না। আর না যেতে পারলে যে, ওর পরিবার বিপদে। রেহানের সেসব কথা

CamScanner

ভাবতেই সেঁজুতি আঁতকে উঠল আরেকবার। ভীতসন্ত্রস্ত চোখে চাইল রুদ্রর নিরেট চিবুক পানে। বলতে গেল, "শ..শু..."

রুদ্র টেবিল থাপড়ে ঝুঁকে গেল হঠাৎ। সেঁজুতির শব্দবাক্য সেখানেই শেষ। বুকখানা ছ্যাঁৎ করে লাফিয়ে উঠল ডরে। মাথাটাকে পিছিয়ে নিল সহসা। শীর্ণ পিঠ ঠেকল গিয়ে ট্রেনের ফোমযুক্ত সিটে। রুদ্রর চোখ দুটো জ্বলছে। ঠিক সেই তাদের শুরুর দিনগুলোর মতোই দপদপ করছে শিখায়। সেঁজুতির মুখমণ্ডল শুকিয়ে যায়। চেয়ে থাকতে পারে না। ভরডরে নুইয়ে আনে মাথা।

রুদ্র দাঁত চিবিয়ে বলল, "হাউ ডেয়ার ইউ, সেঁজুতি। আমাকে ফেলে যাওয়ার সাহস কোথায় পেলেন আপনি? কে দিলো এই স্পর্ধা আপনাকে? কথা দিয়েছেন না আপনি, আমি চোখ মেলে আপনাকে দেখব, বলেছিলেন তো? বলেছিলেন না, বলুন?"

ফাঁকা কেবিনে উচ্চ চিৎকারটুকু প্রতিধ্বনিত হয়। সেঁজুতির লোমকূপ অবধি থরথর করে উঠল। আতঙ্কে কাঁপন ধরা বুকে, ওপর-নিচে মাথা নাড়ল সে।

রুদ্র শান্ত হওয়ার বদলে খ্যাপে গেল আরো। রেগেমেগে বলল, "তাহলে কেন চলে যাচ্ছিলেন? এতটা অন্যায় আবদার করে ফেলেছি যে আপনার এভাবে পালিয়ে যেতে হচ্ছে? আপনি আমাকে ভালোবাসেন না, বেশ। জোর তো করিনি। অধিকার ফলাইনি যে ভালোবাসতেই হবে। নাহলে তো কবেই আপনাকে তুলে নিয়ে বিয়ে করতে পারতাম। করিনি তো। এর মানে আমি সময় দিয়েছি আপনাকে। চেয়েছি আপনি মনের বিরুদ্ধে গিয়ে নয়, আপনি মনপ্রাণ দিয়ে আমাকে ভালোবাসুন। যদি তা নাও হতো আমি মেনে নিতাম। আপনাকে দেখে দেখেই না হয় ভালো রাখতাম নিজে আমি তাই বলে চলে যাবেন, সেঁজুতি? কেন? এই আমিটাকে বিনাশ কনজেকে। ইচ্ছে আপনার?"

লম্বা কথার শেষে দম নিলো রুদ্র। ক্রোধ, ক্লেশ, মনস্তাপ যেন ঝরে পড়ল সবেতে। সেঁজুতিকে নিরুত্তর, নিস্পন্দ দেখে চুরমার হলো বুক। রাগে ফেঁপে ওঠা চেহারা তলিয়ে গেল বিষাদে। মাথা নেড়ে বলল, "ওকে ফাইন! আপনাকে ভালোবেসে পাপ করেছি, তাই না? তাহলে পাপ মোচনের ্যবস্থাটাও তো আমারই করা উচিত। আপনি তো আমায় ভালোবাসেন না, ঘৃণা করেন। এক কথায় রুদ্র রওশন চৌধুরীকে অসহ্য লাগে আপনার। ঠিক আছে, এক্ষুনি এই সব সমস্যার সমাধান করে দিচ্ছি। এই মুহূর্তে চলন্ত ট্রেন থেকে লাফিয়ে পড়ব আমি। আপনার চোখের সামনে ট্রেনের চাকাগুলো আমায় কেটে টুকরো টুকরো করে দেবে। শান্তি পাবেন? নিশ্চয়ই পাবেন। ওয়েট..."

বলেই কেবিন থেকে বেরিয়ে গেল রুদ্র। সেঁজুতির অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল। এক দণ্ডও বসে না থেকে হুড়মুড়িয়ে ছুট লাগাল পেছনে।

CamScanner

মুখোমুখি দুটো কেবিনের মাঝে সরু গলির মতো রাস্তা। সেখান দিয়ে দরজার দিকে হেঁটে যাচ্ছে রুদ্র। অশান্ত তার গতিপথ। পেছনে দমকা হাওয়ার ন্যায় ছুটে আসছে সেঁজুতি। চিৎকার করছে সাথে। কণ্ঠে মিনতি, "আমার কথাটা শুনুন। প্লিজ এরকম করবেন না। দোহাই আল্লাহর। দাঁড়ান।”

রুদ্র শুনল, তবে থামল না। লম্বা পায়ে ট্রেনের গেটে এসে দাঁড়াল। সেঁজুতির কলিজা ছলাৎ করে ওঠে। থেমে যায় শরীরের রক্ত চলাচল। রুদ্র একবার দেখলও না ওকে। দরজার বাইরে ফেলার জন্যে এক পা বাড়াতেই, সেঁজুতি ছুটে এসে ওর অন্য পা জড়িয়ে ধরল। হুহু করে কেঁদে উঠল সাথে। অনুনয় করল বোজা গলায়, "আল্লাহর কসম লাগে এমন করবেন না। আমি আপনার জন্যে চলে যাচ্ছিলাম না বিশ্বাস করুন। আমি তো আপনার বাবার ভয়ে চলে যাচ্ছি।"

রুদ্র সতর্ক চোখে চাইল। তেমনই সচেতন তার কণ্ঠ, "বাবার ভয়ে?”

সেঁজুতির প্রলাপ করা কথা থেমে যায়। হুঁশ ফিরতেই মাথা চক্কর কাটল। মুখ ফস্কে বলা কথায় শিউরে উঠল নিজেই। চোখ তুলে চাইতেই রুদ্রর প্রশ্নবিদ্ধ চাউনিদ্বয় জ্বালিয়ে দেয় বুক।

সেঁজুতি থম মেরে গেল। যেন শক্ত কোনো পাথর। রুদ্র এক হাঁটু ভেঙে সামনে বসতেই চোখ নামিয়ে নেয় সে। টুপ করে এক ফোঁটা জল গলে পড়ে কপোলে। রুদ্র ওর নিচু চিবুকটা আঙুলের ডগায় নিয়ে উচুতে তুলল। বড়ো ঠান্ডা তার স্বর, "আমার দিকে তাকান।"

সেঁজুতির বিশ্রান্ত অক্ষিকূট এলোমেলো ঘুরছে। ঢোক গিলছে সাথে। এখন কী বলবে? কী উত্তর দেবে? রুদ্র যে সব না শুনে ছাড়বে না, ঢেড় জানে ও। কিন্তু সবটা বললে যে বাবা ছেলের সম্পর্ক খারাপ হবে। সেঁজুতি তা চায় না। চাইতে পারে না। সে নীরব অসহায়ত্বে হাঁসফাঁস করে উঠল। রুদ্র ফের বলল, "আমার দিকে তাকান, সেঁজুতি।"

সেঁজুতি শুনছে না। তুলছে না চোখ। রুদ্র খেই হারাল মেজাজের। ধমকে উঠল, "তাকান।"

মেয়েটা ছলকে ওঠে ভয়ে। চোখ মেলায় তড়িৎ। রুদ্র দ্ব্যর্থহীন প্রশ্ন ছুড়ল, "ড্যাড আপনাকে কী বলেছে?”

২৫.
আরিশার ইন্টারভিউ আছে আজ। একটা চ্যানেলে তার সাক্ষাৎকার প্রচারিত হবে। মিষ্টি সুরেলা কণ্ঠে অল্পদিনেই বেশ নাম কামিয়েছে মেয়েটা। এই তো কদিন আগেই একটা ইউটিউব চ্যানেল থেকে তার গাওয়া গান আপলোড হয়, যেটা নেট দুনিয়ায় ভীষণ ভাইরাল এখন। আবার কদিন

CamScanner

আগেই একটা চ্যানেল কর্তৃপক্ষ যেচে ওকে কল করেছিল এই সাক্ষাৎকারের জন্যে। শুযটিং বহু আগেই শেষ। এগারটা নাগাদ টেলিভিশনে সম্প্রচারিত হবে শুনে ঝটপট ওপর থেকে নেমে এলো অভ্র।

সোফায় তখন রেহানা বসে। খবর দেখছিলেন তিনি। মনযোগে ভাটা দিতে ধুপধাপ পা ফেলে এসে দাঁড়াল অভ্র। ভীষণ ব্যস্ত ভঙ্গিতে বলল, "আম্মু, রিমোটটা দাও তো।"

ল্যাপটপ, ফোন এসবের বাইরে যে ছেলে কখনো টেলিভিশন দেখে না, সে আজ হঠাৎ রিমোর্ট চাওয়ায় চোখ কপালে তুললেন রেহানা। কণ্ঠে বিস্ময় এনে বললেন, "তুই টিভি দেখবি?"

"হ্যাঁ। একটা প্রোগ্রাম আছে। তাড়াতাড়ি দাও, মিস হয়ে যাবে।"

ভদ্রমহিলা আর কথা বাড়ালেন না। রিমোর্ট ছেলের হাতে দিয়ে জায়গা ত্যাগ করলেন। অভ্র চটপট বসে পড়ল সেখানে। গুরুতর মুখভঙ্গি, যেন কী না কী দেখবে। রেহানা রুমে যেতে যেতে কাজের মেয়েটিকে ডাকলেন। বলে গেলেন, গাঢ় পাতি দিয়ে চা বানিয়ে রুমে দিয়ে আসতে।

অভ্র চ্যানেল ঘোরাল। আরিশার ইন্টারভিউ যে চ্যানেলে হওয়ার কথা ধরল সেটা। শুরু হয়েছে অনুষ্ঠান। ইন্ট্রো দিচ্ছে সবে। আরিশার পরনে সবুজ টপস। শুভ্র মেয়েটাকে দেখতে ঠিক সতেজ পাতার মতন লাগছে। অভ্রর দৃষ্টিজোড়া মুগ্ধতায় লুটোপুটি খায়। উপস্থাপক মেয়েটি একের পর এক প্রশ্ন করছেন। কী গুছিয়ে উত্তর দিচ্ছে ও! পর্দা থেকে এক বিন্দুও চোখ সরাচ্ছে না অভ্র। আরিশা হাত নাড়িয়ে নাড়িয়ে কথা বলছে, এসব দেখেও মূক হচ্ছে মোহে।

একটা সময় মেয়েটি জিজ্ঞেস করে বসল, "আপনার গলায় তো আমরা সচরাচর রোমান্টিক গান শুনে থাকি। তা বাস্তবেও কি কন্ঠশিল্পী আরিশা এতো রোমান্টিক?রোমান্টিকতা দেখানোর মতো কোনো নিজস্ব মানুষ কি রয়েছে তার?"

প্রশ্নের পিঠে রিনিঝিনি শব্দে হেসে উঠল আরিশা। অভ্র ভাবল, ও এড়িয়ে যাবে। যেমনটা করে সবাই। অথচ মেয়েটা নির্দ্বিধায় বলে দিলো, "হ্যাঁ আছে। আমার ভালোবাসার মানুষ, অভ্র! আমি রোমান্টিক কি না সেই ভালো বলতে পারবে। কোনোদিন সময় হলে আলাপ করাব সবার সাথে।"

অভ্র চমকে ওঠে। আশ্চর্য হয়। এত সহজে আরিশা স্বীকার করে ফেলল? অন্যান্য সেলিব্রিটিদের মতো একটু ভণিতাও করেনি। কথা এড়ায়নি। বুকের সমস্ত কোষ অবধি তার শীতল হলো আদুরে ভালো লাগায়। এজনোই আরিশা বারবার বলেছিল, প্রোগ্রামটা দেখো, তোমার জন্যে সারপ্রাইজ আছে। অভ্র মাথা নামিয়ে হাসল। তুষ্টিতে, তৃপ্তিতে উপচে আসা চিত্তে ফুরফুরে শ্বাস টানল।

CamScanner

আচমকা বাম কানটা টেনে ধরল কেউ। ভড়কে চাইল সে। রেহানাকে দেখেই চোখ গোল করে বলল, "তুমি রুমে যাওনি?"

"মেয়েটি কে?"
অপ্রত্যাশিত প্রশ্নে অভ্র ভ্যাবাচ্যাকা খায়। না বোঝার ভান করে বলে, "কোন মেয়ে?"

রেহানা কান আরো জোরে চেপে ধরলেন। অভ্র মুচড়ে উঠল ব্যথায়। তিনি বললেন, "ঢং করছিস? টিভির ওই মেয়েটি কে?"

"উনি তো আরিশা জামান, মা। ভালো গান গায়, আমি ওনার ফ্যান। সেজন্যেই তো শো-টা দেখছিলাম। তার সাথে আমার কান ধরার কী সম্পর্ক?"

রেহানা চোখ গরম করে বললেন, "এখনো মিথ্যে বলবি? মেয়েটি যে তোর নাম বলেছে আমি স্পষ্ট শুনেছি।"

অভ্রর সব জারিজুরি শেষ। মিইয়ে গেল এবার। শুনেছে যখন, কাটানোর আর কোনও উপায় নেই। বিফল কন্ঠে বলল, "আচ্ছা বলছি, বলছি। কানটা ছাড়ো।"

রেহানা হাত সরালেন। অভ্র সোজা হয়ে দাঁড়ায়। মাথা চুলকে উত্তর দেয়, "ও আরিশা। এবার বিবিএ থার্ড সেমিস্টার পড়ছে।"

"কতদিন ধরে চলছে এসব?"

সে মিনমিন করে বলল, "অনেক দিন।"

রেহানার চোখমুখ গম্ভীর। টিভির পর্দায় তীক্ষ্ণ চাউনি ফেললেন। মায়ের থমথমে চেহারা দেখে ভেতর ভেতর ঘাবড়ে যাচ্ছে অভ্র। তারওপর আরিশা ওয়েস্টার্ন পরেছে। এইরে! আগ বাড়িয়ে বলল, "মা, ও অনেক ভালো মেয়ে। মডার্ন হলেও খুব সংসারী। বিশ্বাস করো, সত্যি বলছি!"

রেহানা চোখ সরু করলেন। কন্ঠ পুরু, "তোকে জিজ্ঞেস করেছি?"

অভ্রর ঘাবড়ে যাওয়ার ধাত লাগাম ছাড়ায় এবার। কী বলবে বুঝতে পারে না। রেহানা অমন গম্ভীর স্বরেই বললেন, "মেয়ে আমার পছন্দ হয়েছে। একদিন নিয়ে আয় বাড়িতে।"

CamScanner

অভ্রর মুখাবয়ব সংকীর্ণ। অমন ভাবেই বেখেয়ালে ঘাড় নাড়ল সে। খেয়াল করতেই সচেতন চোখে চাইল। রেহানা দাঁড়িয়ে নেই, হাঁটা ধরেছেন। ঠোঁটে চাপা হাসি। অভ্রর কন্ঠে অবিশ্বাস, "ওকে তোমার সত্যিই পছন্দ হয়েছে?"

ভদ্রমহিলা ঘুরে চাইলেন পেছনে। চমৎকার হেসে বললেন, "তোর সাথে মিথ্যে বলেছি কখনো? আমার ছেলের পছন্দই তো আমার পছন্দ।"

অভ্র খুশিতে দিশেহারা। এক লাফে ছুটে এসেই মায়ের গলা জড়িয়ে ধরল। রেহানা হাসলেন। গায়ে-মাথায় হাত বোলালেন ছেলের।

এই আনন্দঘন সময়টাতেই দীর্ঘ পায়ে হাজির হলেন রেহান চৌধুরী। হাস্যহীন, লালচে চোখমুখ দেখে পরিবেশ বদলে গেল অচিরে। অভ্র মাকে ছেড়ে সরে দাঁড়াল। তীরস্থ হয়ে পড়লেন রেহানা।

ভদ্রলোক সোজা এসে তিন সিটের লম্বা সোফাটায় বসলেন। ঘন ঘন শ্বাস নিলেন কিছুক্ষণ। প্রখর রাগে ফুঁসছেন তিনি। রেহানা একবার ছেলেকে দেখলেন। কারোরই মাথায় কিছু ঢুকছে না। কাছে এসে চিন্তিত কন্ঠে বললেন, "কিছু হয়েছে, ভাইজান? তোমাকে এমন দেখাচ্ছে কেন?"

রেহান চোখ বুজে আঙুল ঘষছেন কপালে। কানের চারপাশে এখনও রুদ্রর কথা বাজছে। বাবা হয়ে এখন কি না ছেলের তর্জন-গর্জন মানতে হবে?

অভ্র রয়েসয়ে শুধাল, " আপনার কি শরীর খারাপ লাগছে, মামা?"

ভদ্রলোক মুখ খুললেন এবার। ঠান্ডা নয়, খ্যাপাটে গলায় উগড়ে দিলেন ক্ষোভ, "আমার নিজের প্রতি রাগ হচ্ছে, অভ্র। যে ছেলেকে কাঁধে চড়িয়ে মানুষ করেছি, আজ সেই ছেলে আমার বিরুদ্ধে গিয়েছে। আমাকে অসম্মান করতে এক বার ভাবছেও না। তাও কি না সামান্য একটা মেয়ের জন্যে? এই ব্যথা আমি কাকে দেখাব? এই ব্যর্থতা আমি কীভাবে লুকাব?"

রেহানা হতবাক হয়ে বললেন, "মেয়ে? রুদ্র কোনো মেয়ের জন্য তোমাকে অসম্মান করছে? মানে আমি ঠিক বুঝলাম না, ভাইজান। কোন মেয়ে, কী বলছ এসব?"

অভ্রও কিছু জানে না। তার চোখেও প্রশ্ন। চৌধুরী ওর দিকে চেয়েই বললেন, "অফিসের সেই মেয়েটির কথা মনে আছে তোমার? যে সবার সামনে রুদ্রকে অপমান করেছিল?"

অভ্রর বিলম্বহীন জবাব, "হ্যাঁ। সেঁজুতি।"

CamScanner

"হ্যাঁ। আর সেই মেয়ের প্রেমেই মজেছে তোমার ভাই। ভাবতে পারছ অভ্র, এমন বিশ্রীভাবে মেয়েটা ওকে ফাঁসিয়েছে যে ও এখন ঠিক ভুলের বিচার অবধি করে না। বাবা হয়ে আমি কি ওর খারাপ চাইব? কিন্তু সে আমাকেও মানছে না। কী বলছে জানো? বলছে ওই মেয়েই ওর সব। তার জন্যে দুনিয়ার সবাইকে ছাড়তে পারবে, তবে ওকে নয়।"

অভ্রর চোখ কপালে ঠেকল। ভাই সেঁজুতিকে পছন্দ করে? ভালোবাসে? কই আরিশা তো কিছু বলেনি কখনও। না কি সেও কিছু জানে না।

রেহানা হাঁ করে চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। আচমকা উৎফুল্ল চিত্তে বললেন, "কী বলছ, ভাইজান! রুদ্র একটা মেয়েকে ভালোবাসে? এটা তো খুব আনন্দের কথা। যে ছেলে সংসার, বিয়ে, মেয়ে এসবে কোনো রুচিই দেখায় না। বললে রেগেমেগে বাড়ি মাথায় তোলে, সে নিজে কাউকে পছন্দ করেছে? আলহামদুলিল্লাহ। কিন্তু এতে তোমার এত আপত্তি কীসের? তুমিই- বা মানা করছ কেন?"

ভদ্রলোক খ্যাঁক করে বললেন, "যা জানিস না তা নিয়ে কথা বলিস না তো। ওই মেয়ের বংশ পরিচয় কী? ওর বাবা একটা পাতি স্কুলের শিক্ষক। সে মেয়ে কোনোভাবে আমাদের সাথে যায়? আমার ছেলে দেখতে শুনতে, পড়াশোনা, বুদ্ধি বিবেচনা সব দিক থেকে ওই মেয়ের চেয়েও হাজারগুণে শ্রেষ্ঠ। গায়ের রঙেও তো আমার ছেলের পাশে মানায় না ওকে। না না, এটা আমি কিছুতেই মেনে নেব না। তাছাড়া ভরা অফিসে ওই মেয়ে আমার সামনে আমার ছেলের জন্ম তুলে কথা বলেছিল। আমি কী করে ভুলে যাব সেসব?"

অভ্র জিভে ঠোঁট ভিজিয়ে বলল, "কিন্তু মামা, সেখানে সেঁজুতির দোষ ছিল না। ভাই-ই ওকে আগে অপমান করেছিল। সেখানে ওইদিন অন্য যে কোনো মেয়ে হলেও এমনই করত।"

রেহান অবাক চোখে চাইলেন।

"তুই ওই মেয়ের হয়ে কথা বলছিস, অভ্র?"

ছেলেটা কিছু বলতে যায়। রেহানা চোখের ইশারায় থামতে বোঝালেন চাইলেন ভাইয়ের দিকে। কণ্ঠে নম্রতা, "যদিও ঘটনার আগামাথা আমি কিছুই জানি না ভাইজান, তবে যতটুকু শুনলাম তাতে রুদ্র যখন মেয়েটাকে ছাড়বে না বলেই দিয়েছে, তুমি আর কোনো অশান্তি বাড়িও না। বংশমর্যাদা তো সন্তানের চেয়ে বড়ো নয়। ওরা সুখে থাকতে চাইলে থাকুক না।"

রেহানের অটল স্বর, "না। আমি ওই মেয়েকে কিছুতেই মানব না। আমার ছেলে এর থেকেও ভালো কিছু ডিজার্ভ করে।"

CamScanner

ঘোষণা দিয়ে থামলেন তিনি। রেহানা ব্যর্থ শ্বাস ফেললেন। আচমকা দোরগথ হতে ভেসে এলো রাশভারি কিছু আওয়াজ, "কিন্তু আমার যে ওকেই চাই, ড্যাড।"

চকিতে ফিরে চাইল সবাই। ঠিক চৌকাঠে দাঁড়িয়ে আছে রুদ্র। পাশে নতজানু সেঁজুতিকে দেখেই তড়াক করে দাঁড়িয়ে গেলেন রেহান। রুদ্রর হাতের তালুতে বন্দি মেয়েটার কোমল হাত। দুজনকে এইভাবে দেখে ক্ষোপে চোখ ঘোলা হয় তাঁর। এই মেয়েকে রুদ্র কোথায় পেয়েছে? ওর তো আজকেই ঢাকা ছেড়ে যাওয়ার কথা। নাকি যে ভয় তিনি দিয়েছিলেন তাতে কাজ হয়নি?

রেহানা বিস্মিত হয়ে সেঁজুতিকে দেখছেন। রুদ্রর যে মেয়েকে মনে ধরেছে, সে কি সাধারণ কেউ? কিন্তু না, ততটাও অসাধারণ মনে হচ্ছে না। এর থেকেও শতগুণ সুন্দরী মেয়েদের ছবি রুদ্রকে দেখিয়েছেন তিনি। চোখ বুজে প্রত্যেককে প্রত্যাখান করেছে ছেলেটা। তাহলে কী দেখল এই মেয়ের মাঝে? আহামরি তো কিছু নেই।

সেঁজুতির চিবুক তখন বক্ষভাগে মিশে। মুখমণ্ডল চুপসে গেছে ভয়ে। বুকপুক করছে বুক। বাপ-ছেলের আসন্ন দাঙ্গার কথা ভেবে ত্রাসে গুটিয়ে যাচ্ছে বারবার। যা ভয় পেয়েছিল তাই হচ্ছে। ভুলবশত বলে ফেলা কথাটায় শুভ এমনভাবে চেপে ধরেছিল যে গলগল করে সব বলতে বাধ্য হয়েছে ও।

সেমুহূর্তে হাতে টান খেল হঠাৎ। রুদ্র পা বাড়িয়েছে সামনে। ওকে সাথে নিয়ে ক্ষিপ্র কদমে বাবার মুখোমুখি এসে দাঁড়াল। রেহানের চোখে আগুন। জোয়ারের ন্যায় চোখা নাক ফুলছে। ক্ষণে ক্ষণে দেখছেন রুদ্রর মুঠোয় থাকা সেঁজুতির হাতটাকে। রুদ্র মুখ খুলল। থইথই করা নীরবতা ভঙ্গ করে খুব ঠান্ডা গলায় বলল, "তুমি খুব বেশি বাংলা সিনেমা দেখো, ড্যাড। নাহলে তোমার থেকে এতো বোকামি আমি আশা করি নি। ধমকে ধামকে ছেলের ভালোবাসার মানুষকে সরিয়ে দেওয়ার প্রচলন এখন পুরোনো হয়ে গেছে। তুমি অন্তত নতুন কিছু করতে পারতে।"

ছেলের কথায় পরিহাস। রেহান ত্রস্ত সেঁজুতিকে দেখলেন। বিক্ষুব্ধ দৃষ্টির আগুন যেন ঢেলে দিলেন ওর গায়ে। এই মেয়ে এরই মধ্যে সব উগড়ে দিয়েছে? বাবা ছেলের মধ্যে ভাঙন ধরাতে চায়? রাগ চেপে রাখতে পারলেন না তিনি। বলেই ফেললেন, “বাহ! কান ভাঙাতে ভালোই জানো দেখছি। কী চাইছ? এসব বলে আমার ছেলেকে আমার থেকে দূরে সরিয়ে দেবে?"

সেঁজুতির চোখের টলমলে জল উপচে পড়ল এবার। রেহান চিৎকার ছুড়লেন, "এই মেয়েকে আমার বাড়িতে কেন এনেছ তুমি? কোন সাহসে? এই মূহূর্তে আমি একে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বার করে দেবো। সিকি.."

CamScanner

মাঝপথেই কথা কেড়ে নিলো রুদ্র। সতর্ক করল শান্ত স্বরে, "সাবধান ড্যাড! এই ভুল করতে যেও না। সেঁজুতি আমার কাছে থাকা মানে ওর ঢাল হয়ে ততক্ষণ থাকব, যতক্ষণ আমি নিঃশ্বাস নিচ্ছি। তুমি কেন, স্বয়ং বিপদও ওকে ছুঁতে ভয় পাবে তখন।"

বিস্ময়াভিভূতিতে মুঁদে আসা নয়ন তুলে রুদ্রর দিকে চাইল সেঁজুতি। শ্রবণেন্দ্রিয় মোহের তোপে বিবশ হয়ে পড়ল। ঠিক এইরকম একটা শক্ত কাঁধ, মাথার ওপর পোক্ত ছায়াই তো চেয়েছিল সে। যা কখনও বাবাও হতে চাননি। অথচ উনি! ঘোর ভাঙল রেহানের ক্ষুব্ধ আওয়াজে, "তুমি ছেলে হয়ে আমার সঙ্গে বেয়াদবি করছ, রুদ্র? ভুলে যেও না আমি তোমার বাবা। জন্ম যেমন দিয়েছি তেমন তোমার অসভ্যতামির জন্যে তোমাকে ত্যাজ্য করতেও দুবার ভাবব না কিন্তু।"

প্রত্যেকে অভিশঙ্কায় নড়ে উঠলেও, রুদ্রর মাঝে উদ্‌দ্বেগ এলো না। রেহানা বোঝাতে গেলেন, "ভাইজান, শান্ত হও। ও তোমার একমাত্র ছেলে, কেন এরকম করছ?"

"তুই চুপ কর। ও নিজেকে কী ভাবে? আমার ব্যবসাকে উচুতে নিয়েছে বলে আমার মাথাও কিনে নিয়েছে?"

রুদ্রর চোখের দৃষ্টির নড়চড় নেই। প্রতিটি পরতে কেবল শৈত্যপ্রবাহ। তেমনই নিরুদ্যম তার কন্ঠস্বর, "আমি জানি, সম্পর্ক ছিন্ন করতে তোমার জুড়ি নেই, ড্যাড। সুযোগ পেলেই স্ত্রীকে ডিভোর্সের হুমকি, তাঁর গায়ে হাত তোলা, সন্তানকে ত্যাজ্য এসব তোমাকেই মানায়। কারণ তুমি তো এসবের মূল্যই বোঝো না।"

স্তব্ধ রেহান গর্জে উঠলেন, "রুদ্র।"

"আমাকে ধমকে লাভ নেই। তোমার যা ইচ্ছে তুমি করে নাও। এই যে সেঁজুতির হাত ধরেছি? যতক্ষণ শরীরে রক্ত চলছে, ছাড়ব না আমি। আর তোমার ব্যবসা? এই মুহূর্তে আমি সব ছেড়ে দিলাম। তুমি নিজেও জানো, তোমার ব্যবসা রুদ্র নির্ভর হলেও রুদ্র কিন্তু তোমার ব্যবসা নির্ভর নয়।"

স্তম্ভিত রেহান তৎক্ষনাৎ কিছু বলতে পারেননি। তবে আর্তনাদ করে গেলেন রেহানা, "এসব কী বলছ, রুদ্র বাবার ওপর রাগ করে এমন সিদ্ধান্ত কেউ নেয়? তুমি একটু মাথাটা ঠান্ডা করো, আমি বোঝাচ্ছি ভাইজানকে।"

রুদ্রর মন গলল কী? গলেনি। বরং কঠিন শোনাল পরের কথা, "এই বোঝানোটা তো সেদিনও বোঝাতে পারতেন ফুপি, যেদিন আপনার চোখের সামনে ড্যাড আমার মা আর ফুপাকে জড়িয়ে মিথ্যে সন্দেহ করেছিল। সবার সামনে গায়ে হাত তুলেছিল আমার মায়ের। তখন কেন

CamScanner

বোঝাননি ওনাকে? সেদিন বোঝালে না আমি মা-ছাড়া বড়ো হতাম, আর না অভ্র বড়ো হতো ওর বাবা ছাড়া। কী, পারতেন না?"

এই একটি কথা যেন বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতন। সেঁজুতি সহ চমকে উঠল সকলে। হতবিহ্বল রেহানা ত্রস্ত চাইলেন ছেলের পানে। স্তম্ভিতর ন্যায় দাড়িয়ে অভ্র। চৌধুরী রেগেমেগে বললেন, "তুমি কিন্তু সীমা লঙ্ঘন করছ, রুদ্র। একটা বাইরের মেয়ের সামনে ঘরের পুরোনো কাসুন্দি ঘাঁটতে আনন্দ হচ্ছে তোমার?"

রুদ্র সোজাসাপটা বলল, "সেঁজুতি বাইরের মেয়ে নয়। সে আমার সব"

বিমূর্ততায় ঠোঁট ফাঁকা হয় মেয়েটার। চেয়ে থাকে হাঁ করে। মাথার নিউরনে দাপিয়ে বেড়ায় এই একটি কথা, "সেঁজুতি আমার সব"

রুদ্র ফের বলল, "অবশ্য কে ঘরের আর কে বাইরের সেটা বোঝার ক্ষমতা তো তোমার নেই, ড্যাড। থাকলে কখনো বোনের স্বামীকে জড়িয়ে নিজর স্ত্রীর চরিত্রে মানুষ কালি লাগাতে পারে না।"
“রুদ্র!”
রুদ্র রাগে হিতাহিত জ্ঞান খুইয়েছে। বাবার সামনে জীবনে প্রথমবার আঙ্গুল উচাল সে। কন্ঠস্বরে আগুন ঝরিয়ে বলল, "চিৎকার করবে না। কী
ভেবেছ, ছোটো ছিলাম বলে বুঝিনি? আমার মা হার্ট অ্যাটাকে নয়, আমার মা মরেছে তোমার দেওয়া মানসিক যন্ত্রণায়। তুমি তাকে মেরেছ। খুনি তুমি।"

রেহান বাকরুদ্ধ। বিকল মস্তিস্কে একবার ছেলেকে দেখলেন, একবার তার ঠাড় আঙুলটাকে। কন্ঠ ধরে এলো কথা বলতে গিয়ে, "আমি খুনি? তুমি আমাকে এভাবে বলতে পারলে?"

রুদ্রর কন্ঠও বুজে আসে। তাও স্পষ্ট আওড়াল, "পারলাম। কারণ আমি এতিম হওয়ার পেছনে তুমিই দায়ী। দিনের পর দিন আমার মাকে মানসিকভাবে এতটা বিধ্বস্ত করেছ তুমি, যে সেই ব্যথা সহ্য করতে না পেরে আমাকে একা রেখে চলে যেতে বাধ্য হয়েছে সে। তুমি কতটা নিচ, কতট জঘন্য মানসিকতার মানুষ সেটা তুমি নিজেও জানোনা, রেহান চৌধুরী আর এই জন্যে আমি সেই ছোট্টবেলা থেকে তোমাদের কাউকে সহ্য করতে পারি না। না তোমাকে, আর না তোমার বোনকে। তোমরা দুজন মিলে অভ্র আর আমার জীবন থেকে আমাদের বাবা-মাকে কেড়ে নিয়েছ।"

CamScanner

রেহানা হাতবাকের ন্যায় সব কথা শুনছেন। আজ যেন ঘোলা জল পরিষ্কার রূপে ধরা দিলো সামনে। এই তাহলে আসল কারণ? রুদ্র এই জন্যে ওনাকে পছন্দ করতেন না? এড়িয়ে যেতেন সব সময়?

রুদ্র নিজেই বলল, "আজ এতগুলো বছর পর যখন আমি আবার কাউকে ভালোবেসেছি, তখন তাকেও কেড়ে নিতে চাইছ, তাই না? ভালোই চাল চেলেছিলে তুমি। ভয় দেখিয়ে সেঁজুতিকে আমার থেকে দূরে সরানোর অনবদ্য আইডিয়া তোমার। তবে আমিও তোমার রক্ত, রেহান চৌধুরী। জ্ঞানশূন্য নই। ছেলে হয়ে বাধ্য হচ্ছি তোমাকে সাবধান করতে, ভবিষ্যতে আমার ভালোবাসার ওপর কোনোরকম বৈরীতা সৃষ্টি করতে যেয়ো না। ভালো হবে না সেটা। আমার রাগকে তুমি চেনো, সে ছাই চাপা আগুন হলেও একবার জ্বললে কিন্তু সব জ্বালিয়ে দেবে।"

চৌধুরী হতচেতন, বুদ্ধিভ্রষ্ট বিবশ জিভ ঠেলে বলতে পারলেন না কিছু। অভ্রর কোনো দিকে মন নেই। সে জড়ের মতো ধপ করে বসে পড়েছে সোফায়।

রুদ্র সেঁজুতিকে নিয়ে থামল না, দাঁড়াল না। বেরিয়ে গেল লম্বা পায়ে।

রেহানা ঝাপসা চোখে অভ্রকে দেখলেন। আঁচলে মুখ গুঁজে শব্দ করে কেঁদে উঠলেন পরপর। ছেলেটার মুখ দেখে, রুদ্রর কথা শুনে, জীবনের এই পর্যায়ে এসে মনে হলো তিনি আসলেই দোষী। সেই আট বছর থেকে যে ছেলেটাকে বড়ো করেছেন, সেই ছেলের মনের ভেতর তাদের জন্যে এত ক্ষোভ পুষেছিল, টেরও পেলেন না?

রাত তখন অনেক। হঠাৎ ফোনের রিংটোনে ধড়ফড়িয়ে উঠে বসল আরিশা। নিদ্রিত নয়ন মেলে চারপাশটা দেখল একপল। সেঁজুতির অপেক্ষায় ছটফট করতে করতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিল।

খেয়াল পড়ল মুঠোফোনের দিকে। এক নাগাড়ে বেজে চলছে এখনও। সেঁজুতির কোনো খোঁজ পাওয়া গেল কী?

আরিশা ত্রস্ত হাতে ফোন তোলে। হতাশ হয় পরপর। অভ্র কল দিয়েছে।

রিসিভ করে কিছু বলবে, পূর্বেই ওপাশ থেকে শক্ত প্রশ্ন এলো, "ভাই যে সেঁজুতিকে পছন্দ করে, তুমি জানতে?"

মেয়েটা হোঁচট খায়। অপ্রত্যাশিত প্রশ্নে ভাঁজ বসে কপালে। হঠাৎ এই কথা? জবাব দেয় বিলম্বহীন, "হ্যাঁ, কেন?"

CamScanner

অভ্র উত্তর দিলো না। পালটা প্রশ্ন করল, "আমাকে জানাওনি কেন? নাকি প্রয়োজন বোধ করোনি?"

স্বরের হাল অন্যরকম। এতদিনের সম্পর্কে এমন কখনও শোনেনি আরিশা। উদ্‌বেগ নিয়ে বলল, "না, তা কেন হবে? আসলে আমার মাথাতেই ছিল না। সেঁজুতি ওনাকে পছন্দ করে না বলে আমোলেও নিইনি। তাই বলে এভাবে বলছ কেন?"

"তাহলে কীভাবে বলা উচিত, আরিশা? ভাই একটা মেয়েকে পছন্দ করে যে কি না তোমারই বেস্টফ্রেন্ড। তোমার সাথেই থাকে। আর আমি জানতে পারছি অন্য কারো মাধ্যমে। আমি কি পৃথিবীতে এতটাই অপ্রয়োজনীয়? কেউ আমাকে কিচ্ছু বলতে চায় না।"

ছেলেটার আওয়াজ ভেজা। যেন এক্ষুনি গলা ফেটে কান্না উথলে আসবে। আরিশা বোঝাতে চাইল, "অভ্র, তুমি ভুল ভাবছ। আচ্ছা বেশ, তোমার খারাপ লেগেছে? ঠিক আছে আ'ম সরি! আর কখনো কোনো কিছু তোমার থেকে লুকোবো না। আই প্রমিস ইউ।"

অভ্র কাষ্ঠ হেসে বলল, "উঁহু, আমি জানি, সবাই আমার থেকে সব লুকোবে। মা লুকিয়েছেন এরপর তুমিও।"

অভ্রর যে কিছু একটা হয়েছে আরিশার বুঝতে বাকি নেই। নাহলে আমোদ, ফুর্তিতে মেতে থাকা মানুষটা হঠাৎ এত ভারী ভারী কথা বলছে কেন? আরিশা কণ্ঠে নম্রতা ঢেলে বলল, "তোমার কিছু হয়েছে, অভ্র? হলে বলো না আমায়। তোমার কি মন খারাপ?"

তার রিনরিনে স্বরে জাদু মিশে। অভ্র হাঁসফাঁস করে উঠল। বেদনার শব্দফুলি ঠিকড়ে পড়ল কণ্ঠ হতে, "আমার ভীষণ কষ্ট হচ্ছে, আরিশা। কেমন দমবন্ধ লাগছে সবকিছু। কেন যেন ঠিকঠাক শ্বাস নিতে পারছি না। মনে হচ্ছে, মনে হচ্ছে সব অপরিচিত, অচেনা, দেখেও অদেখা। কী করলে রেহাই পাব বলো তো?"

আরিশা কিছু বোঝেনি। অথচ ব্যাকুল চিত্তে বলল, "একবার দেখা করবে, প্লিজ।"

অভ্র থমকায়। দেওয়াল ঘড়িতে বারোটা ছাড়াবে। এত রাতে দেখা? মানা করতে চাইল। পূর্বেই ভেসে এলো মেয়েটার ব্যগ্র স্বর, "প্লিজ, না কোরো না, অভ্র! এই মুহূর্তে দেখা করতে চাই আমি। আমার প্রিয় মানুষটার যে আমাকে প্রয়োজন।"

"থাক আরিশা। আজ কিছু ভালো লাগছে না। কাল এসো না হয়।"

CamScanner

আরিশা জোরদার আপত্তি জানাল, "একদমই না। এখন মানে এখনই। আমার তোমাকে দেখতে মন চাইছে, অভ্র। হাসতে থাকা অভ্রটাকে দেখেছি, এবার গোমড়ামুখো অভ্রটাকেও দেখব না হয়। জীবনটা তো খুব ছোট্ট বলো, কোনো ইচ্ছেই অপূর্ণ রাখতে নেই। এই সামান্য ব্যাপারটায় তুমি আমায় সাহায্য করবে না, অভ্র?"

কথার মারপ্যাঁচে জড়িয়ে গেল ছেলেটা। মন খারাপ ভুলে মুচকি হেসে ফেলল। দীর্ঘশ্বাস ঝেড়ে বলল, "আচ্ছা। করব। তবে তোমাকে আসতে হবে না। তুমি তৈরি হয়ে বের হও, আমিই আসছি।"

এই এতক্ষণে ঠোঁটে হাসি ফুটল আরিশার। পরপর অন্ধকারে মিলিয়ে গেল তা। সেঁজুতির চিন্তাটা আবার দপদপ করে জেগে উঠল মাথায়। কোথায় মেয়েটা? রুদ্র ভাইয়া কি কোনো খোঁজ পেলেন?

হাইওয়ের লম্বা লম্বা পিলার ছুঁয়ে ঠান্ডা বাতাস ছুটছে। মাথার ওপর রোড লাইটের কড়কড়ে আলো। অথচ সামনে-পেছনে ঘোর অমানিশায় তলিয়ে সব। শহরের বুক ছাপিয়ে দৌড়ে চলা যানবাহনের বিশ্রাম নেই। অত শব্দের মাঝেও কোথা হতে ভেসে আসছে ঝিঝি পোঁকার ডাক।

হাইওয়ের সেই চওড়া ফুটপাত ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে রুদ্র। পেটানো শরীরটায় এক ফোঁটা নড়ন নেই। পকেটে গৌজা হাত দুটো একইরকম বন্দি। বাদামি চোখের চাউনি দূরের পথে স্থির। আর ঠিক পাশেই কলের পুতুল বনে দাঁড়িয়ে সেঁজুতি। রাত কত বাজে এখন? ১টা না দুটো? সেই যে রওশন ভিলা ছেড়েছে ওরা, তারপর থেকে এখানেই।

সেঁজুতির মুখাবয়বে উদ্বিগ্নতার ছাপ। মনের মাঝে হাজারখানেক প্রশ্ন। অথচ টু শব্দ করছে না। হুট করে রুদ্রকে ভয় লাগছে ওর। সেঁজুতি দুহাত কচলে আশেপাশে তাকাল। পরপর দৃষ্টি ফেলল পায়ে। তেড়ে আসা শনশনে হাওয়া, ধেয়ে যাওয়া দু-একটা গাড়ি ছাপিয়ে রুদ্রর মেঘমন্দ্র স্বর শোনা গেল তখন।

"কিছু বলতে চাইছেন আপনি?"

সেঁজুতি মুখ তুলে চাইল। মানুষটা ওর দিকে নয়, সেই আগের মতোই অন্য কোথাও চেয়ে। রুদ্রর মলিন চেহারা তার অপরাধবোধ তরতরিয়ে বাড়ায়। রওশন ভিলায় আজ যা যা ঘটেছে এর পেছনে সেই তো দায়ী। যদি ওসব না বলত রুদ্রকে, তবে কিছুটি হতো না। সেঁজুতির বুক ফেটে কান্না পায়। বাবা ছেলের এই যুদ্ধের কারণ হিসেবে নিজেকে কল্পনা করতেই, সংকীর্ণ মুখ বৃহৎ হয় আরো। নিচু কণ্ঠে বলল, "আমার জন্যে কেন এত অশান্তি করলেন আপনি? কেন আপনার বাবাকে কষ্ট দিলেন?"

CamScanner

রুদ্র নিরুত্তর। ভেসে এলো তার ভারি নিঃশ্বাসের শব্দ। যাতে মিশে হতাশা, গ্লানি। ও ফের বলল, "আমি কখনোই চাইনি আপনাদের সম্পর্ক আমার জন্যে খারাপ হোক। তাও..."

"সেসব নিয়ে আপনাকে ভাবতে হবে না।"

রুদ্রর জলদগম্ভীর স্বরে সেঁজুতির কথা থামল। টইটুম্বুর চোখে একইরকম চেয়ে থাকল সে। করুণ কণ্ঠে বলল, "আমার নিজেকে খুব নিচু মনে হচ্ছে, স্যার। মনে হচ্ছে সবকিছুর পেছনে আমিই দায়ী। কেন আপনি এত মেয়ে রেখে আমায় ভালোবাসতে গেলেন বলুন তো? কেন আমার জন্যেই আপনার এত ভয়ানক অনুভূতির সৃষ্টি হতে গেল?"

রুদ্র ফিরে চাইল এবার।

"তাতে আপনার কী? আপনার কাছে তো এসবের কোনো মূল্য নেই। এত পাগলামো করেও আপনার মন গলেনি। আপনি কি আমায় ভালোবাসেন, সেঁজুতি? বাসেন ন..."

বলতে বলতেও থেমে যায় ও। খেয়াল পড়ল সেঁজুতি চোখ নামিয়ে নিয়েছে। ঈগল চাউনি সতর্ক হলো অমনি। সচকিতে শুধাল, "আপনি কি আমায় ভালোবাসেন?"

অন্যসময় সেঁজুতি মুখের ওপর না বলে দেয়। কর্কশ কণ্ঠে বাক্য ছোড়ে, "না, বাসি না।"

অথচ আজ, উত্তরের বদলে ঢোক গিলল মেয়েটা। আই-ঢাই করার নায় ঠোঁট চোবাল জিভে। এতেই খটকা লাগে রুদ্রর। অধৈর্য হাতে সেঁজুতির বাহু টেনে নিজের দিক ঘোরাল সে। কণ্ঠে উদবেগ, "আমার দিকে তাকান, সেঁজুতি। আমার চোখের দিকে দেখুন। আপনি কি আমায় ভালোবাসেন? বলুন, কী হলো?"

সেঁজুতি মাথা নোয়ায়। সময় কাটায় খানিক। খুব ছোট্টো করে বঙ্গে, "জানি না।"

রুদ্রর ভ্রুযুগল টানটান হলো অচিরাৎ। শোকে নিথর হওয়া ঠোঁটে তুরস্থ হাসি ফুটল।

"মেয়েদের জানি না মানে কী? হ্যাঁ নাকি না?"

সেঁজুতি কিছু বলল না। ও যে নিজেই বিভ্রমে ডুবেছে। রুদ্রর শক্তপোক্ত কন্ঠ বদলে গেল হঠাৎ। আকুল হয়ে বলল, "ভালোবাসলে বলে দিন, সেঁজুতি। কেন পোড়াচ্ছেন এভাবে? আমার হৃৎপিণ্ডটাকে আর কত টুকরো করলে শান্তি পাবেন আপনি!"

CamScanner

সেঁজুতির চিবুক এবার বুকে মিশে যায়। প্রচুর জড়তা দেহে নিয়ে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে রইল। যখন মুখ তুলল, চোখ দুটোতে একপ্রস্থ জল।

রুদ্র বলল, "আমার জন্যে কি আপনার একটুও মায়া হয় না, সেঁজুতি?" কথার স্বর ঠিক সেঁজুতির বুকে গিয়ে বিঁধেছে। অমনি একটা কান্না ছিটকে এসে ওর গলায় গিয়ে দাঁড়াল। বুক খানা মুচড়ে উঠল ব্যথায়। চোখ ছাপিয়ে জল ফেলে বলল, "আমি সত্যিই জানি না, বিশ্বাস করুন। আমার কাছে কোনো উত্তর নেই, স্যার। আমি বলতে পারব না আপনাকে ভালোবাসি কি না। তবে এটুকু জানি, আপনার কিছু হলে আমার চিন্তা হয়, আপনি অসুস্থ হলে আমার দুঃখ হয়, আপনার কষ্ট হলে আমারও কষ্ট হয় আজকাল। আপনাকে ছেড়ে যাব যখন ভেবেছিলাম? বুকটা যন্ত্রণায় ফেটে যাচ্ছিল। আপনি আমার হৃৎস্পন্দন বাড়িয়ে দেওয়ার কারণ কি না জানি না, কিন্তু আপনার সঙ্গত্যাগ আমার নিঃশ্বাস বন্ধ করার কারণ!”

হিমালয়ের উঁচু প্রান্ত হতে তুষারখণ্ড ধ্বসে পড়ল যেন। আর সেই তুষারে ঠান্ডা হলো রুদ্রর জ্বলন্ত বুক। চোখদুটো শান্তিতে বুজে নিল সে। সেঁজুতির কথাগুলো যেন কথা নয়। তার মরুময় হৃদয়ে ঝুমঝুম বৃষ্টি। তৃপ্ত হেসে বলল, "আমার উত্তর আমি পেয়ে গেছি। আর কিছু বলতে হবে না আপনাকে। শুধু জেনে রাখবেন, আপনি আমার এক টুকরো চাঁদের এক ফালি জ্যোৎস্না, সেঁজুতি। আপনার প্রতি অনুরক্তিতে আমি গলা অবধি ডুবেছি। মনের দূরত্ব রাখলেও আমার দৃষ্টির সীমায় থাকবেন। অনুরোধ করছি, চোখের আড়াল হয়ে এই রুদ্রকে খুব দ্রুত নিঃস্ব করার পরিকল্পনা করবেন না।"

সেঁজুতির চোখের পানিটা গড়িয়ে পড়ল গালে। রুদ্র এগিয়ে আসে হঠাৎ। হাতের আঙুলগুলোর চাওয়া-পাওয়াকে প্রশ্রয় দিলো আজ। নিরেট হস্ত তালুতে ওর ক্লান্ত মুখটা তুলল। সেঁজুতি চোখ ওঠায়। জলের পুকুর ভরতি মৃগনয়নের সন্ধি হয় রুদ্রর ধূসর চাউনির সাথে।

"মাঝেমধ্যে আপনার প্রেমে আমার মরে যেতে ইচ্ছে করে, সেঁজুতি। পরপরই ইচ্ছে করে আপনাকে ভালোবেসে একটুখানি বুকে জড়াতে। শুধু অধিকারের জন্যে পিছিয়ে যাই। সেই অধিকার কবে হবে আমি জানি না। শুধু জানি, আমি মরছি। একটু একটু করে আপনার প্রতি, আপনার ভালোবাসার প্রতি। ভালোবাসলে এত যন্ত্রণা, এত ভোগান্তি হয় কেউ কেন বলেনি আমায়, বলুন তো! বললে কি আমি ভালোবাসতাম কখনও?"

সেঁজুতির হৃদয় নিংড়ে এলো কান্নায়। আচমকা কী হলো, কে জানে! হুড়মুড় করে জাপটে ধরল ওকে। প্রশস্ত পিঠটাকে দুহাতে খামচে ধরে হুহু করে কাঁদল। মনে হলো, এই শক্ত বুকটাই পৃথিবীতে ওর একমাত্র আশ্রয়। এখানে থাকলে ও নিরাপদ। দুনিয়ার কারো সাধ্য নেই একটা ফুলের টোকা দেবে শরীরে।

CamScanner

অন্যদিকে থমকে দাঁড়িয়ে আছে রুদ্র। সেঁজুতির হঠাৎ কাণ্ডে চমকে গেছে ভীষণ। মেয়েটা নিজে থেকে বুকে এসেছে ওর? পরের দফায় বিস্ময়ের ঘোর লেজ তুলে পালাল। তোলপাড় চালাল অনুভূতিরা। ভালো-মন্দ, উচিত- অনুচিত নিয়ে আর এক দণ্ড ভাবল না রুদ্র। দুহাত তুলে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে নিল সেঁজুতিকে। দৃঢ় তার বাঁধন। ঠিক প্রথম দিনের মতোই পণ করল আরেকবার।

এই মেয়েটাকে সে ছাড়বে না। এর মাঝে কেবল একটি তফাত আজ। সেদিন রাগ ছিল, আজ ভালোবাসা আছে। যেখানে মিশে আছে তার প্রণয়ের এক বুক তৃষ্ণা। আর কিছু প্রণয়ের না পাওয়া আকাঙ্ক্ষা।

সেদিন রাতে একদম বাড়ি অবধি সেঁজুতিকে পৌঁছে দিলো রুদ্র। গেইটের বহু আগে গাড়ি থামিয়ে হেঁটে হেঁটে এলো ওর সাথে। দুজনের কারোর কোনো কথা নেই, হাতে হাত ছোঁয়া নেই। নেই নিঃশ্বাসের আদান- প্রদান। অথচ সেঁজুতির মনে হচ্ছিল একটা বিশাল পৃথিবী তার সঙ্গে সঙ্গে হাটছে। রুদ্র এত্ত কাছে থাকায় যে প্রশান্তিতে বুকে ছেঁয়ে এসেছে সেসব আর কিছুতে নেই। আচ্ছা, কী নাম এই প্রশান্তির?

২৬.

অরুণা! নামের মতোই মিষ্টি এই নারী। যার প্রেমে প্রথম দেখায় হুমড়ি খেয়েছিলেন রেহান চৌধুরী। টগবগে যুবকের জন্যে পরিবার থেকে পাত্রী খোঁজা চলছিল। ভদ্রলোকের ছোটো মামার শালির মেয়ে ছিলেন অরুণা। কোনো এক পারিবারিক অনুষ্ঠানেই প্রথম দেখা দুজনের। শান্ত, ভদ্র, আস্তে কথা বলা মেয়েটিকে দেখে রেহানের এত পছন্দ হয়েছিল! তৎপর পরিবারকে জানালেন। বিলম্বহীন বিয়ের প্রস্তাব গেল অরুণাদের বাড়িতে। অথচ ফিরতি খবর এলো-মেয়ে রাজি নয়। সে আরো পড়াশুনা করবে। সৌম্য দর্শনে এগিয়ে থাকা রেহান চৌধুরী, এই প্রত্যাখান মেনে নিতে পারেননি। গোঁ ধরে রইলেন, বিয়ে করলে অরুণাকেই করবেন। এক কিশোরীর পেছনে তাঁর এই উঠেপড়ে লাগা বিফলে গেল না। সম্ভ্রান্ত পরিবার, সাথে মেয়ের প্রতি ছেলের এই পাগলামি দেখে অরুণার বাবাই মত দিলেন বিয়েতে। বাবার সেই সিদ্ধান্তের ওপর আর রা করতে পারেনি বেচারি! শেষমেশ বিয়ে হয় দুজনের।

কিন্তু অরুণা স্বভাবসুলভ চুপচাপ, শান্ত গোছের মেয়ে। এক কথায় ভীষণ অন্তর্মুখী! প্রয়োজনের বেশি একটা কথা সে বলে না। অন্য মেয়েদের মতো হেসে গড়াগড়ি খাওয়া স্বভাবে বিরল। বিষয়টা স্বাভাবিক। অথচ রেহানের মধ্যে এর বিরুপ প্রভাব পড়ল। অরুণা যত শান্ত থাকত তত সেই প্রভাব প্রখর হতো তাঁর। ভাবতেন, অরুণার বিয়েতে মত ছিল না। বলতে গেলে জোর করে সংসার করতে হচ্ছে। হয়তো এখনও ওনাকে মন থেকে মেনে নিতে পারেনি। বাড়ি ভরতি লোকের মাঝে অরুণার সাথে দুটো আলাদা কথা বলার ফুরসত পান না রেহান। অফিস থেকে

CamScanner

ফিরতে ফিরতে রাত গড়াত। এমন গুরুতর বিষয় তোলার মতো শক্তি নেই তখন। ভেবেচিন্তে আলাদা ফ্ল্যাট কিনলেন তিনি।

বাবার ভিটে ছাড়লেন স্ত্রীকে নিয়ে। এসব নিয়ে অরুণার কোনোকালেই কোনো গাঁইগুঁই ছিল না। স্বামী যা বলবেন তাই শিরধার্য। ফ্ল্যাটে শুরু হয় দুজনের নতুন সংসার। কিন্তু স্বভাব কি বদলানো যায়? অরুণাও বদল হলেন না। রেহানের মাথায় বাজ পড়ল যেন। অরুণাকে নিজের কাছে ধরেবেঁধে রাখতে খুব তাড়াতাড়ি সন্তান নিতে চাইলেন। অন্তত কোলে সন্তান এলে মেয়েটা সংসারে মন দেবে ভেবে।

তাই বিয়ের ঠিক দেড় বছরের মাথায় জন্ম হলো রুদ্রর। যখন তার চার বছর বয়স, তখন রেহানার বিয়ে হলো ঢাকাতে। ভাইবোন পাশাপাশি বিধায়, নিরন্তর আসা-যাওয়া চলত। রেহানার স্বামী এনামূল ছিলেন একজন চমৎকার মানুষ। ভীষণ ফুরফুরে মেজাজি, আর কথা বলতে ভালোবাসা মানুষ যাকে বলে। সারাক্ষণ হইহই করে বেড়াতেন। গল্প, কবিতার প্রতি ভদ্রলোকের অমোঘ টান। যেখানে রেহান চৌধুরী বই বিমুখ, সেখানে অরুণা ছিলেন বইপ্রেমী নারী। এনামুলের সাথে এই আমূল মিল থেকেই মাঝেমধ্যে বেশ গল্প হতো।

আর এটাই চক্ষুশূল হয়ে ধরা দিলো রেহানের কাছে। স্ত্রীর প্রতি অত্যধিক পসেসিভ তিনি কিছুতেই এসব নিতে পারতেন না। এনামুলের কথায় কথায় মজা করা, বেড়াতে এলেই অরুণার কাছে রান্নার আবদার, ভদ্রলোকের অসহ্য লাগত। স্বীয় দ্বন্দ্বে টিকতে না পেরে বোনকে ডেকে একদিন সরাসরি বলে দিলেন সবকিছু। ভাইয়ের মনে উপচে পড়া বিষ রেহানাকেও গ্রাস করে ফেলল। রেহান যেন চোখে আঙুল দিয়ে দেখালেন, এনামুলের চরিত্র ভালো নয়। রেহানার মস্তিষ্ক ঘুরতে থাকে। যখন যে যেটা বোঝায়, সেটাকেই সত্যি ধরে নেন। ভাইয়ের এক কথায়, গোটা ব্যাপারটাকেই গেঁথে ফেললেন মাথায়।

সময় আস্তেধীরে বাড়ছিল। অভ্রর বয়স দেখতে দেখতে কদম ফেলল চার বছরের কোঠায়। আর দু-ভাইবোনের সন্দেহের তিরে ক্রমাগত ক্ষতবিক্ষত হচ্ছিল, অরুণা-এনামুলের পাপহীন সম্পর্ক।

আর সেই সন্দেহে সাপে বর হলো একদিন।

সেবার এনামুল হক চট্টগ্রাম গেলেন ব্যবসার কাজে। ফেরার পথে আগে রুদ্রদের বাড়ি। ওর জন্যে ব্যাগ ভরতি খেলনা কিনেছেন ভদ্রলোক। ভাবলেন, একবারে এগুলো দিয়ে নিজের বাড়ি ফিরবেন না হয়। স্মার্ট ফোনের ব্যবহার জোরালো হয়নি সেসময়। অত দূরের পথ থেকে ফিরতে ফিরতে এনামুলের মুঠোফোনটাও চার্জের অভাবে বন্ধ হয়ে গেল।

CamScanner

এদিকে শিশু অভ্রর গায়ে ধুম জ্বর ছুটেছে। স্বামীর ফেরার কথা আজ, অথচ ফোনে পাওয়া যাচ্ছে না। দিশেহারা হয়ে ভাইকে কল করলেন রেহানা। রেহান এক কথায় অফিস ছেড়ে গেলেন, ভাগনেকে নিয়ে ডাক্তার দেখাবেন বলে।

রুদ্রর বয়স তখন আটের গোড়ায়। ফুপা তার ভীষণ পছন্দের মানুষ। সাথে চকলেট, খেলনা পেয়ে আনন্দে বাড়িময় ছেলেটা হইচই করে বেড়াল।

অরুণাও টেবিল ভরা খাবার সাজিয়ে আপ্যায়নের ব্যবস্থা করলেন। এনামুল যেতে চাইলেও দিলেন না। কোনোমতেই না খাইয়ে ছাড়বেন না তিনি।

সবই ঠিকঠাক চলছিল। ছোটো রুদ্র খেলতে গিয়ে জুস ফেলল মেঝেতে। অরুণা বেখেয়ালে হাঁটতে গিয়ে তাতে পিছলে পড়ে গেলেন। ব্যথায় চ্যাঁচিয়ে উঠলেন জোরে। এক চিৎকারেই ওয়াশরুম থেকে ত্রস্ত বেরিয়ে এলেন এনামুল। লম্বা জার্নি করে গোসলে ঢুকেছিলেন কেবল। কোমর অবধি প্যান্ট, উদাম শরীরে তোয়ালে ঝুলছে কাঁধে। তাড়াহুড়ো পায়ে দৌড়ে বসার ঘরে এলেন তিনি। অরুণার অবস্থা বেগতিক, পড়ে আছেন মেঝেতে। বাড়িতে বুয়াও নেই। এনামুল ধরে তুলতে গেলে অরুণার শক্তিতে কুলোয় না। কোমর, পিঠ ব্যথায় টনটন করে উঠছে। ভদ্রলোক আর উপায় পেলেন না, পাঁজাকোলায় তুলে নিলেন ওনাকে। ভীষণ লজ্জায় হাঁসফাঁস করে উঠলেন রমণী। নামাতে বললেন বারবার। এনামুল এক কথায় বলে দিলেন, "লজ্জা পাবেন না, ভাবি। সম্পর্কে বড়ো হলেও, আপনি আমার ছোটো বোনের বয়সি। বড়ো ভাই হয়ে বিপদে পাশে দাঁড়াব না?"

অরুণার বলার কিছু রইল না। তক্ষুনি বোনকে নিয়ে বাড়িতে ঢুকলেন রেহান। এমন দৃশ্যে দুজনের মাথায় গোটা আকাশ ভেঙে পড়ল। এতদিনের সমস্ত সন্দেহ যেন চট করে স্পষ্ট হয়ে ধরা দিলো চোখে। নিজেদের মতো সাজিয়ে নিলেন কিছু নোংরা আর বিকৃত ভাবনাদের। ব্যস, মাথায় রক্ত চড়ে বসল রেহানের। হারিয়ে গেল হিতাহিতজ্ঞান।

রুদ্র খেলছিল ছাদে। প্রবল চ্যাঁচামেচির শব্দ নিচ থেকে ছুটে এলো এখানেও। ধড়ফড়িয়ে উঠেই সিঁড়ি বেয়ে দৌড়ে নেমে গেল সে। দোতলায় আসামাত্র চমকে গেল বিদঘুটে কোনো দৃশ্যে। মায়ের গালে বাবার সপাটে চড় বসানোর সেই চিত্রে থমকে যায় শিশুমন। পাশেই দাঁড়িয়ে আছেন রেহানা। চার বছরের অভ্র কোলে বসে নিরন্তর কাঁদছে। মাথা নত করে রাখা এনামূল স্তম্ভের ন্যায় দাঁড়িয়ে। রুদ্র স্তব্ধ, বিস্মিত। মাকে মারতে দেখে আতঙ্কে থরথর করে উঠল। সবার সামনেই রেহান যা মুখে এলেন তাই বললেন স্ত্রীকে। এনামুলকে জড়িয়ে সেসব কুৎসা তখন রুদ্রর ছোট্ট মাথায় ঢোকেনি। কিন্তু এনামুল কথার পিঠে প্রতিবাদ করেন, বোঝাতে চান দুজনকে। রেহান শুনতে নারাজ। ভদ্রলোকের গায়েও প্রহার করতে বাদ রাখেননি। কেবল নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে

CamScanner

থাকেন অরুণা। সবকিছু ছাপিয়ে অবাক চোখে স্বামীর দিকে চেয়ে রইলেন শুধু। নিজের হয়ে চুল পরিমাণ সাফাইও
দিলেন না। চুপচাপ পা বাড়ালেন ঘরে। পাশ কাটিয়ে যাওয়ার সময় রুদ্র স্পষ্ট দেখল মায়ের চোখের ব্যাকুল বর্ষাদের।

সেই ঘটনার পর থেকেই রেহান নিজের মধ্যে ছিলেন না। যেভাবে পারতেন, যখন পারতেন, ইনিয়ে বিনিয়ে কথা শুনিয়েছেন স্ত্রীকে। কাজে সামান্য কোনো খুঁত পেলেও বলে বসতেন, "পরকীয়াটা ভালোই পারো, আর এটা পারো না?"

অরুণার প্রত্যুত্তর নেই। ছিলও না কখনও। নিশ্চুপ হজম করতেন সব। স্বামীর পানে চাইতেন নিষ্প্রাণ নয়নে। কিন্তু কে জানত, এই চুপ থাকাটাই একদিন কাল হয়ে দাঁড়াবে। ওই তাকিয়ে থাকাই সুশ্রী রমণীর ভেতরটাই দেবে পাহাড়সম অভিমানের? ঘটনার ঠিক দশ দিনের মাথায় অরুণার হার্টব্লক হয়। হাসপাতালে নিতে নিতেই সব শেষ। আকাশ ছোঁয়া বেদনা বুকে চেপে ধূলিয়া ছাড়লেন তিনি। বাকিদের মতো রেহানও ভেবেছিলেন, অসুস্থতা। অথচ আজ যেন সব উত্তর রগে রগে ছুটছে। রুদ্র চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে, অরুণা মানসিক চাপে পিষ্ট হয়ে পৃথিবী ছেড়েছিলেন, অসুস্থতায় না।

"তাহলে কী এই মৃত্যুর জন্যে আমিই দায়ী?" নিজেকেই শুধালেন রেহান। সমগ্র শরীর দুলে উঠল অমনি। ছলছল চোখ তুলে চাইলেন শুভ্রকায় দেওয়ালের পানে। মাঝারি সাইজের ফ্রেমে তাঁদের ফ্যামিলি ফটো ঝুলছে। যেখানে মাথায় ঘোমটা তোলা অরুণার কোলে শিশু রুদ্র হাসছে। আহা! এই ছেলেটার মুখ থেকে হাসিটা কেড়ে নেওয়ার জন্যে তিনিই দোষী? এত সুন্দর নারীর আহুতির পেছনের দায় শুধু তাঁর?

রেহান উঠে এগিয়ে গেলেন। খুব কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন ছবিটির। অরুণার হাস্যোজ্জ্বল মুখের দিকে চেয়ে রইলেন কিছু পল। প্রশ্ন করলেন ভাঙা গলায়, "আমাদের সংসার কি এতটাই ছন্নছাড়া ছিল, অরুণা? ভালোবাসা ছিল না? তুমি কি কখনও ভালোবেসেছিলে আমাকে? কথাটা কখনও জানাও হয়নি। অথচ এই রেহান প্রথম দেখায় ভালোবেসেছিল তোমাকে। আমি তোমায় কখনও কষ্ট দিতে চাইনি, অরুণা। শুধু চেয়েছিলাম তুমি আমাকে মন থেকে মেনে নাও। স্বামী বলে নয়, নিজের ইচ্ছেতে কাছে এসো। কিন্তু কখনও এমন হয়নি জানো! সেজন্যেই তো এনামুলের সাথে তোমার কথা বলা আমি নিতে পারতাম না। তাই বলে এত অভিমান করেছিলে আমার উপর? একেবারে আমায় ছেড়েই চলে যেতে হলো? আজ তোমার ছেলে সবকিছুর জন্যে আমাকে দোষ দিচ্ছে। সবকিছুতে আমার অন্যায় দেখছে। অথচ এটা বুঝতে পারছে না, তোমাকে হারিয়ে আমিও কি খুব ভালো ছিলাম? দ্বিতীয়বার নিজের জীবনটাকে

CamScanner

কারোর সাথে জড়ায় নি। কেন বলো তো?কারণ ভালোবাসা বারবার হয় না। এই অরুণা, তুমি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ? যদি পাও, তবে রুদ্রটাকে একটু বলে দাও না, আমি ইচ্ছে করে তোমায় মারিনি। আমি খুনি নই। খুনি নই আমি!"

শক্তপোক্ত রেহান আজ কান্নায় ভেঙে পড়লেন। ঝরঝরে বৃষ্টির মতো কেঁপে উঠছে শরীর। আচমকা কেউ একজন হাত রাখল কাঁধে। শশকের নায় ব্যস্ত ভঙ্গিতে চোখ মুছলেন রেহান। ফিরলেন পেছনে।

রেহানা দাঁড়িয়ে। ফোলা চোখমুখ প্রমাণ রেখেছে, কেঁদেছিলেন তিনিও। সেদিনের সেই ঘটনার সমান দায় তো ওনারও। সব মাড়িয়ে এনামুল যখন ওনার কাছে এসেছিলেন। হাত ধরে জিজ্ঞেস করলেন করুণ স্বরে, "তুমিও কি ভাবছ এসব সত্যি, রেহানা? তুমিও কি আমায় অবিশ্বাস করছ?"

রেহানা মুখ ঘুরিয়ে রাখলেন। সাথে ঝাড়া মেরে ছাড়িয়ে নিলেন হাত দুটো। স্ত্রীর এই নীরব অবজ্ঞাই ভদ্রলোককে বুঝিয়ে দিলো উত্তর। সেই যে বাড়ি ছাড়লেন, আর ফেরেননি।

ছেলের মুখের দিকে চেয়ে একটা সময় সব ভুলতে চেয়েছেন রেহানা। চেয়েছিলেন আবার সংসার শুরু করতে। কিন্তু এনামুলের খোঁজ মেলেনি। অন্যদিকে মা মরা রুদ্রটাও একা। দিন যত বাড়ছিল, ছেলেটা গুমড়ে উঠছে নিস্তব্ধতায়। রেহানা আর শ্বশুর বাড়ি গেলেন না। থেকে গেলেন এখানে। একা হাতে দু-দুটো ছেলেকে মানুষ করলেন। দুই ভাইবোনের বয়স কম। দুজনকেই পরিবার থেকে আবার বিয়ে দিতে চাইল। অথচ দুজনেই নারাজ, অটল তাদের সিদ্ধান্তে। রেহানা না হয় অপেক্ষা করছেন স্বামীর। কিন্তু রেহান? কেন বিয়ে করেননি তিনি? এই প্রশ্নের উত্তর কি রুদ্র খুঁজবে কখনও? বুঝবে তার মায়ের মৃত্যুতে বাবার কোনো হাত নেই?

"কিছু বলবি?"

রেহানার ধ্যান ভাঙল। আর্ত নেত্রদ্বয় নামিয়ে নিলেন অমনি। কিশোরীর ন্যায় ফুঁপিয়ে উঠলেন পরপর। হাহাকার করে বললেন, "আমার কিছু ভালো লাগছে না, ভাইজান। তুমি রুদ্রকে ফিরিয়ে আনো। আমাদের ঘৃণা করে, ভাইজান। কিন্তু আমরা তো ওকে ভালোবাসি, বলো! যে ছেলেটাকে সন্তানের মতো দুহাতের ওপর মানুষ করেছি, তার ঘৃণা আমি সহ্য করতে পারব না। কাল থেকে অভ্রও কথা বলছে না আমার সাথে। বারবার কেমন করে দেখছে আমায় জানো। ওর চোখমুখ দেখে বুঝতে পারি আমি। যে ছেলেটা জানত তার বাবা নিখোঁজ, কাজে বেরিয়ে ফেরেনি। সে কাল শুনল, তার বাবা আমাদেরর জন্য হারিয়ে গেছে। মুখে কিছু না বললেও, ছেলেটা যে আমাকেই দায়ী করছে, ভাইজান। আমি আর নিতে পারছি না এসব। সন্তানের এমন প্রশ্নবিদ্ধ চাউনি ভেতরটা ছিঁড়ে ফেলছে আমার। তুমি কিছু করো, ভাইজান, রুদ্রকে ফিরিয়ে আনো তুমি।

CamScanner

পয়সার দম্ভ, বংশ, মর্যাদা সব ভুলে যান। ছেলেটার জন্যে হলেও সেঁজুতিকে মেনে নাও তুমি। রুদ্র মাকে হারিয়ে কোনওদিন ভালো ছিল না, আজ যদি সেঁজুতিকে নিয়ে ভালো থাকতে চায় থাকুক না, ভাইজান। আমি তোমার কাছে অনুরোধ করছি, ওদের তুমি মেনে নাও।"

ভাইয়ের সামনে দুইহাত জড়ো করে হাউমাউ করে কাঁদছেন রেহানা। কিছুক্ষণ থম ধরে থেকে মাথা নাড়লেন চৌধুরী। খুব ছোটো করে বললেন, "দেখছি।"

২৭.

দরজা খুলে একটি অপরিচিত মুখ দেখে কপাল কোঁচকালেন আমির। তাগড়া যুবকের আগাগোড়া নিরীক্ষণ করলেন স্পষ্ট চোখে। শুধালেন, "আপনি?"

কোর্টপ্যান্ট পরিহিত লম্বাচওড়া যুবক পালটা প্রশ্ন ছুড়ল, "এটা কি সেঁজুতিদের বাড়ি?"

যুবকের কণ্ঠে অনিশ্চয়তা। মেয়ের নাম শুনে আমিরের ভ্রু টানটান হলো। কণ্ঠে উদ্‌দ্বেগ এনে বললেন, "জি। কিন্তু আপনি কে?"

"ভেতরে এসে বলি?"

গম্ভীর স্বর, সাবলীল ভঙ্গি। ভদ্রলোক ঘাড় নেড়ে বললেন, "হ্যাঁ, আসুন।"

রুদ্র ভেতরে ঢুকল। বসার ঘরের চারদেওয়ালে চোখ বোলাল এক বার। আমির পাতলা ফোমের সোফাটা দেখিয়ে বললেন, "বসুন।"

ও বসতে বসতে বলল, "আপনি নিশ্চয়ই সেঁজুতির বাবা।"

আমির দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলেন এবার। কে এই ছেলে? ভদ্রভাবে বললেন, "কিছু মনে করবেন না, আপনাকে ঠিক চিনতে পারিনি।"

গুরুভার ছেলেটি চমৎকার করে হাসল। বলল পরিচ্ছন্ন ভাষায়, "আমি রুদ্র রওশন চৌধুরী। ঢাকা থেকে এসেছি। আপনি কাইন্ডলি আপনার মিসেসকে ডাকবেন? কিছু কথা বলব, যেখানে ওনারও থাকা উচিত।"

আমির ক্রমশ তলিয়ে যাচ্ছেন বিভ্রমে। তাও প্রশ্নের বাণ চাপা দিয়ে মুনারার নাম ধরে ডাকলেন। মিনিট কয়েকেই ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন তিনি। অচেনা রুদ্রকে দেখে তৎপর আঁচল প্যাঁচালেন কাঁধে। রুদ্র নিজের মতন বলল, "আপনাদের সাথে আমার কিছু কথা আছে। বসলে ভালো হয়।"

CamScanner

মুনারা কী বলবেন, কী করবেন বুঝতে পারছেন না। আড়চোখে স্বামীর দিকে চাইলেন। চোখের ইশারায় বসতে বললেন আমির।

রুদ্র কপালের পাশ চুলকে বলল, "আমি একজন ব্যবসায়ী। আমার বাবাও তাই। আমাদের গোটা পরিবারে চাকরি করে এমন কেউ নেই। ঢাকায় অনেকগুলো গার্মেন্টস আছে আমাদের। এছাড়া কিছু আবাসিক হোটেল, রেস্টুরেন্টও আছে। আমার ডাকনাম রুদ্র। মা নেই। পরিবার বলতে ফুপি, বাবা আর আমার ভাই অভ্র।"

নিজের ব্যাপারে সবকিছু বলে থামল সে। আমির-মুনারা মুখ চাওয়া- চাওয়ি করলেন। বুঝতে না পেরে বললেন, "এসব আপনি আমাদের কেন বলছেন?"

রুদ্রর কণ্ঠে দাপট।

"বলছি, কারণ আছে। আমি সেঁজুতিকে পছন্দ করি, ওকে বিয়ে করতে চাই।"

এক কথায় চমকে উঠলেন দুজনে। এতক্ষণের বিভ্রান্ত আঁখিজোড়া, বিস্ময়ে ফ্যালফ্যাল চেয়ে রইল।

রুদ্র বলল, "আপনারা ওর অভিভাবক বলে সরাসরি আপনাদের কাছেই প্রস্তাব নিয়ে এসেছি। আপনারা চাইলে আমার ব্যাপারে সবরকম খোঁজ নিতে পারেন।"

পকেট থেকে ভিজিটিং কার্ড বের করে আমিরের সামনে রাখল সে।

"এতে আমার অফিস, বাসা সবকিছুর অ্যাড্রেস আছে। যেকোনো সময় আপনি তদন্ত করতে যেতে পারেন। তবে হ্যাঁ, এবার একটু ভালো করে খোঁজ নেবেন, আঙ্কেল। গতবার রাফিনের যেভাবে নিয়েছেন ওরকম হালকা নিলে চলবে না।"

রুদ্রর লালচে ঠোঁটে চাপা হাসি। অথচ কথা বলতে ভুলে গেলেন আমির। একইরকম তাজ্জব বনে চেয়ে থাকেন মুনারা। এই ছেলে এতকিছু জানল কী করে? রুদ্র উঠে দাঁড়াল। ব্যস্ত ভঙ্গিতে বলল, "আমি এখন আসি। আপনারা খোঁজ নিয়ে আমাকে জানান। বিয়েটা যত তাড়াতাড়ি হয় তত ভালো। আপনাদের মেয়ে যা ত্যাড়া, কখন না বেঁকে বসে আবার।"

সবটা নিজের মতো আওড়ে পা বাড়ায় সে। চৌকাঠ ছুঁতেই ডেকে • উঠলেন আমির, "দাঁড়াও বাবা।"

রুদ্র থামল। ফিরে চাইল পেছনে। ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন।

"তোমাকে তুমি করে বললাম। তুমি তো আমার ছেলেরই বয়সি।"

"সমস্যা নেই।"

আমির কিছু বলতে চেয়েও থামলেন। মুখাবয়বে ইতস্তত ভাব। জিভে ঠোঁট ভিজিয়ে বললেন, "সেঁজুতি কি তোমার অফিসেই কাজ করে?"

"হ্যাঁ।"

একবার মুনারার দিক চাইলেন ভদ্রলোক। ফোঁস করে শ্বাস ফেললেন তারপর। সেদিন রাফিন তো এমন কিছুই বলেছিল। তবে এই সেই ছেলে। আমিরের পুরুষালি চোখ দুটোয় হুট করে জলে ভরে উঠল। অনুনয় করলেন, "সেঁজুতির সাথে একবার দেখা করিয়ে দেবে, বাবা?"

মুনারাও ব্যগ্রচিত্তে বললেন, "হ্যাঁ বাবা, কতদিন মেয়েটাকে দেখি না। একবার দেখা করানোর ব্যবস্থা করবে?"

দুটো বয়স্ক মানুষের চোখের জল দেখে রুদ্র অস্বস্তিতে পড়ে যায়। সেঁজুতি তো জানেই না, ও এখানে এসেছে। একটু চুপ থেকে বলল, "আচ্ছা দেখছি!"

প্রৌঢ় দুজন খুশি হয়ে গেলেন। মুনারা চোখ মুছে বললেন, "চলে যাচ্ছ কেন? বসো, দুপুরে খেয়ে না হয়..."

রুদ্র হাত উলটে ঘড়ি দেখে বলল, "না আন্টি, ফিরতে হবে। আজ আসি। তাছাড়া, আপনার মেয়ে জামাই হলে খাওয়া দাওয়ার ওপরেই তো থাকব।"

সোজাসাপটা জবাবে হোঁচট খেলেন তিনি। রুদ্র বেরিয়ে গেল। সিঁড়ি থেকে নেমে যাওয়া অবধি চেয়ে রইলেন আমির। মুনারা দরজা আটকেই শুধালেন, "ছেলেটাকে দেখে কী মনে হলো আপনার?"

উনি বিলম্বহীন বললেন, "জানি না। এইটুকু আলাপে বুঝতে পারছি না কিছু। তবে বেশ বুদ্ধি মাথায়। আর লজ্জাশরমের একটু বালাইও নেই দেখলে, কীভাবে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে গেল? সত্যি,

CamScanner

আজকালকার ছেলে- মেয়েরাও না। যাক গে, ওসব ছাড়ো। শেষমেশ আমার মেয়ের সাথে দেখা হচ্ছে, এতেই হবে। যাই, স্কুল থেকে দুটোদিন ছুটির ব্যবস্থা করি।"

আমির তাড়াহুড়ো পায়ে রওনা করলেন। মুনারা অবাক চোখে চেয়ে থাকেন সে পথে। এই কী সেই লোক, যে কিছুদিন আগেও মেয়ের জাহান্নাম কামনা করল?

সেঁজুতি কাজ করছে। ভীষণ মনোযোগে দেখছে মনিটরের গ্রাফিক্সগুলো। নিবেশনের গাঢ়তায় দরজায় আসা মানুষটিকে খেয়াল অবধি করেনি। রুদ্র ঠায় দাঁড়িয়ে সেখানে। বক্ষপটে হাত গুঁজে এক ভাবে দেখছে ওকে। কী ভীষণ ললিত একটি মুখ। লাইটের কড়া আলোয় জ্বলজ্বল করছে কপোল। রক্তাভ অধরে কী যে আকর্ষণ। আচ্ছা, কী আছে এই মেয়ের মাঝে? কিছু নেই। তবুও ভালো কালো। অন্যরকম মিষ্টি ভালো লাগা। যে ভালো লাগায় বসন্তের ডালের সবচেয়ে রঙিন ফুলটি খিলখিলিয়ে হাসছে। এই সে মেয়েটা নিষ্পোষ্ঠ চেপে কাজে ডুবেছে। মৃগনেত্র ছোটো করছে মাঝেমধ্যে এসব দেখে রুদ্রর বক্ষস্পন্দন থমকে আসতে চায়। উথাল-পাতাল ঢেউ ওঠে হৃদয়ে। প্রেমিক সুলভ কাতর মনটা প্রশ্ন ছুড়তে চাইল, "সেঁজুতি, একটু কি কাছে আসা যায় না? একটু কি ভালোবাসা যায় না আমাকে?"

"আপনি?"

হঠাৎ কথায় ধ্যান ভাঙল রুদ্রর। নড়ে উঠল একটু। সেঁজুতি বসা থেকে দাঁড়িয়ে গেছে। সেও মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াল এবার। উচাটনে ভরতি মনখানা সামলাতে বাঁ হাত চুল ঠেলল ওপরে। সিলভার রঙা হাতঘড়ি সুদীপ্ত পুরুষের কব্জিতে বড়ো সানন্দে বসে আছে। তারপর সোজাসুজি চাইল ওর দিকে। হঠাৎ রুদ্রকে দেখে অবাক হয়েছে সেঁজুতি। চেহারায় স্পষ্ট সেই ছাপ। রুদ্র এগিয়ে আসে। স্তম্ভের ন্যায় দাঁড়ানো সেঁজুতিকে পরতে পরতে গরখ করল একবার। জিজ্ঞেস করে স্বর নামিয়ে, "বিরক্ত করেছি?"

সেঁজুতি মাথা নাড়ল দুপাশে। রুদ্র বলল, "বসুন।"

সাথে চোখের ইশারার চেয়ার দেখাল।

পুতুলের ন্যায় বসল মেয়েটা। রুদ্র হুট করে চমকে দেওয়া কাণ্ড ঘটাল একটা। টেবিলের ওপর দুহাত ঠেসে ঝুঁকে গেল ওর দিক। সেঁজুতি ভড়কে যায়। কুণ্ঠায় গুটিয়ে আসে শরীর। ইদানীং লোকটাকে দেখলে আড়ষ্ট হয়ে গড়া যেন রুটিন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

রুদ্রর পূর্ণ দৃষ্টি তখন ওর ওপর। গভীর চোখে সেঁজুতির ক্ষুদ্র আদল মেপে নিল একপল। কপাল হতে শুরু করে যা এক সময় ঠিকড়ে পড়ল ঘাড়ের জোড়া তিলেও। রুদ্র ভ্রু বাঁকায়। দুটো কালো

CamScanner

তিল একইসাথে একই জায়গায় মিশেছে। পাশেই চকচক করছে ধূসর রঙা আরেকটি ভিল। মাই গুডনেস! এটা তো আগে খেয়াল করেনি।

সবাই মিলে যেন মিছিল নামিয়েছে রুদ্রর সংযত থাকার বিরুদ্ধে। লোকটার এই ক্ষুরধার চাউনি নিতে পারে না সেঁজুতি। গায়ে কাঁটা দিলো আজও। অধৈর্য সে কম্পিত, নিচু কণ্ঠে বলল, "ককিছু বললববেন, সস্যার?"

রুদ্র উত্তর দিলো না। তবে ফটাফট বলল, "একটা খেলা খেলবেন?" সেঁজুতি হতভম্ব হয়। বুঝতে না পেরে বলে, "খেলা? মানে?"

রুদ্র সোজা হলো। আচমকা ঘুরে গিয়ে দাঁড়াল টেবিলের ওইপাশে। ঠিক সেঁজুতির বসে থাকা চেয়ারের সামনে। এত ঘনিষ্ঠে আসা দেখে শরীর ছলকে উঠল মেয়েটার। কিছু বোঝার আগেই রুদ্র চেয়ার টেনে নিজের দিকে ঘোরাল ওকে। অমনি চোখজোড়া কোটর ছেড়ে বেরিয়ে এলো সেঁজুতির। নির্বোধ বনে বসে রইল কেবল। হাঁ করবে, এর আগেই রুদ্র ঝুঁকে এলো আবার। থমকায় সেঁজুতি। কণ্ঠনালিতে চাপা পড়ে কথা। রুদ্র পেশিবহুল হাত দুটোর ভর রাখল চেয়ারের দুই হাতলের ওপর। ঠিক মধ্যমণিতে বন্দি করল ওকে। সম্মোহে উপচে আসা দৃষ্টিযুগল ফেলে রাখল মেয়েটার ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকা নয়ন তারায়। ঠোঁট নেড়ে বলল, "ঠিক পাঁচ মিনিট আপনি আমাকে আর আমি আপনাকে দেখব। একবারের জন্যেও চোখের পাতা ফেলা যাবে না।"

সেঁজুতি খেই হারিয়েছে রুদ্রর বাদামি চোখে। যেন দিশা নেই কিছুর। শুধাল ওর মতোই, "ফেললে?"

"হেরে যাবেন।"

"হারলে?"

"সেটা খেলার পরেই বলি?"

ও কপাল কুঁচকে বলল, "না জেনে খেলব কেন?"

রুদ্র একপেশে হাসল, "বেশ, যদি আপনি হারেন তাহলে আমি যা বলব আপনাকে তাই শুনতে হবে। আর যদি আমি হারি, আপনি যা বলবেন আমি শুনব। চলবে?"

CamScanner

শেষটুকু শুনেই সেঁজুতি রাজি হয়ে গেল। তাকিয়ে থাকার এই প্রতিযোগিতায় সে জিতবে নিশ্চিত। স্কুলে কত খেলেছে! আর একবার জিতলে রুদ্রকে নাকানিচুবানি খাওয়াবে এমন সুযোগ হাতছাড়া করা যায়? আত্মবিশ্বাসে হইহই করে বলল, "আমিই জিতব।"

রুদ্রর হাসি প্রগাঢ়, "দেখা যাক। আপনি তৈরি?"

প্রফুল্ল চিত্তে মাথা নাড়ল সেঁজুতি। শুরু হলো দুটো প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের ছেলেমানুষি খেলা। রুদ্র নিষ্পলক চেয়ে থাকে। ঠিক যেভাবে সেঁজুতি চেয়ে আছে। ঘড়ির কাঁটা সময় ছাপিয়ে যায়, সেকেন্ড ছাড়িয়ে মিনিট পার হয়। অথচ চোখ সরে না ওদের। সেঁজুতির বুকের ভেতর ধুপধাপ কাঁপছে। রুদ্রর ধারালো চাউনিতে দ্বিখণ্ড হচ্ছে ক্রমশ। তাকিয়ে থাকাই মুশকিল। বড়ো কসরতে নয়ন জোড়া মেলে রাখে মেয়েটা।

সময় ধীরেসুস্থে বাড়ছে। যেন তাড়া নেই ওদের। অথচ বিপাকে পড়ল রুদ্র। এমন অন্তরঙ্গে দাঁড়িয়ে সেঁজুতিকে দেখতে দেখতে সংযম হারাচ্ছে তার। এত কাছে দুজন। যেখান থেকে তপ্ত শ্বাস আছড়ে পড়ারও শব্দ শোনা যায়।

রুদ্র অনুভূতির তাণ্ডবকে প্রশ্রয় দিলো আজ। নাছোড়বান্দা মনটাকে সায় দিতে, আচমকা চুমু খেয়ে বসল সেঁজুতির কপাল বরাবর। পিলে সুদ্ধ চমকে উঠল মেয়েটার। থরথরিয়ে কাঁপন ধরল গায়ে। রুদ্র সরে আসে। ঢোক গিলে ধাতস্থ করে নিজেকে। ভণিতাহীন বলে দেয়, "সরি। বাট আই কান্ট ইগনোর মাই ফিলিংস।"

আর এক মুহূর্ত থামে না তারপর। বের হতে নেয় ঝড়ের বেগে। সেঁজুতি নিস্তব্ধ তখনও। কেন যেন মাথা ঘুরছে। গরম হয়ে আসছে গাল। মারবেল চোখের নড়ন নেই যখন, সেসময় ফিরে চাইল রুদ্র। কেমন রহস্য করে বলল, "বাড়ি যান, সেঁজুতি। সেখানে আপনার জন্য সারপ্রাইজ আছে। যা আমার চুমুর থেকেও বড়ো।"

মেয়েটা উত্তর দেবে কী? তব্দা খেল এই কথায়। রুদ্র চলে যায়। কাচের নড়তে থাকা দোরপথে তাজ্জব বনে চেয়ে রয় সেঁজুতি। পরপর মন্থর বেগে হাতটা উঠে আসে গালে। কুণ্ঠায় ডুবে গেল সহসা। ইস, কী নির্লজ্জ লোক!

সম্পর্কবিহীন যে চুমু খেতে পারে, সে সম্পর্ক হলে কী করবে?

২৮.

সদর দরজা ঠা করে খোলা দেখে থমকে দাঁড়ায় সেঁজুতি। বিস্ময়ে ভ্রু বেঁকে গেল সাথে। আরিশা তো কখনো এরকম দরজা খুলে রাখে না। মেয়েটা যে ওর থেকেও আরো বেশি সচেতন। কোনও

বিপদ হলো না তো? অস্থির চিত্তে ত্রস্ত ভেতরে ঢুকল সেঁজুতি। সামনের রুমটা ঘুটঘুটে অন্ধকার। আরিশা আগের বাসা ছেড়ে দিয়েছে এক সপ্তাহ হলো। সেঁজুতি আর ও মিলে এই নতুন ফ্ল্যাটটা ভাড়া নিয়েছে। অত বড়ো কোম্পানির পিএ হওয়ায় মেয়েটার এখন মাইনে ভালো। শুধু শুধু অচেনা মেয়েদের সাথে ঘরবাড়ি শেয়ার করে থাকার কী দরকার?

ওদের বসার ঘরটা দক্ষিণমুখী। রাতেরবেলাও বাইরে থেকে যথেষ্ট আলো আসে। অথচ আজ সবকিছু কেমন তিমিরে তলানো। হাত-পাও খুঁজে পাওয়া মুশকিল। সেঁজুতির বুক ধুপধাপ কাঁপছে। খারাপ কিছু হলো না তো? আরিশাটা তো একাই ছিল বাসায়।

ও শশব্যস্ত দেওয়াল হাতড়ে সুইচ টিপল। আলো জ্বলতেই অন্ধকারে মাখা ঘরের চেহারা বদলে গেল নিমিষে। সেই আলোয় মেয়েটা ভালো করে তাকাতেও পারেনি, চিৎকার ছুড়ল কেউ একজন, "আপুউউ!"

সেঁজুতি পিছিয়ে যায় এক কদম। সামনে থেকে ইতি ছুটে এসে কোমর জড়িয়ে ধরায়। বিহ্বলতায়, বিমূঢ়তায় স্তব্ধ হয়ে গেল। সব কেমন স্বপ্নের মতো লাগছে। ইতি এখানে কী করে এলো? সেঁজুতি চোখ ঝাপটে আরো ভালো করে দেখল ওকে। প্রশ্নে উপচে পড়া নয়ন তুলে সামনে চাইতেই সটান হলো পিঠের হাড়। আমির-মুনারা দাঁড়িয়ে আছেন। তরুণীর সমস্ত শরীর কেঁপে ওঠে। স্তম্ভিত লোচনে নেমে আসে ভুবন-জীবন কাঁপিয়ে দেওয়া বিস্ময়। এত মাস পর বাবা-মা, বোন সবাইকে দেখে কোটর ছাপিয়ে গেল জলে। ইতি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। বড়ো মায়া নিয়ে বলছে, "তুমি অনেক পচা, আপু! এত দিন আমাদের থেকে দূরে থাকতে পারলে? একটুও কষ্ট হয়নি তোমার? একবারও আমাদের মিস করোনি?"

সেঁজুতির কান্নায় কন্ঠরোধ। বোনের অভিযোগে ভেঙে আসে ভেতরটা।
হাঁটমুড়ে বসেই বুকের মধ্যে টেনে নিল ওকে। হুহু করে কেঁদে গাল-গলা ভেজালো। ইতিও থেমে নেই, সমানে কাঁদছে।
সেঁজুতি মাকে দেখেই উঠে দাঁড়াল। মুনারা চোখে জল নিয়ে শুধালেন, "কেমন আছিস?"

সেঁজুতি নিরুত্তর। আচমকা ঝাঁপ দিলো মায়ের বুকে। মুনারার কান্নার বানে গুড়িয়ে যায়। এতদিন পর সন্তানকে বুকে নিয়ে সব বেরিয়ে গলা ছিঁড়ে। হাউমাউ করে এক চোট কাঁদলেন তিনিও।

শুধু এক কোণে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে রইলেন আমির। কেন যেন মেয়েটার কাছে যাওয়ার সাহস হচ্ছে না। কম অন্যায় তো করেননি ওর সাথে। চোখ নামিয়ে হাতের উলটো পিঠে অশ্রুজল মুছলেন। ইচ্ছে তো করছে মুনারার মতো একইরকম একটু বুকে নিতে মেয়েটাকে। কিন্তু উপায় কই? বাবা

CamScanner

হিসেবে কী করেছেন তিনি? মেয়েটাকে আঘাত করা ছাড়া। সেঁজুতি নিশ্চয়ই অভিমান পুষে আছে এখনও। কাছে আসা দূর, কথাই বলবে না। ক্ষমাও করেনি মনে হয়।

ঠিক সেই সময় তাঁকে চমকে দিয়ে সেঁজুতি সামনে এসে দাঁড়াল। পেছনের সব ভুলে ডাকল ভেজা গলায়, "বাবা।"

আমির হতবিহ্বল, হতবাক। চোখ তুললেন অবিশ্বাস নিয়ে। সেঁজুতি ঠোঁট চেপে কাঁদছে। দৃষ্টিতে ব্যাকুলতা, বাবার আদর পাওয়ার। আমির কী বলবেন ভেবে পেলেন না। চেয়েও থাকতে পারলেন না ওর মুখের দিকে। মাথা নামিয়ে নিলেন ফের। পরপরই কেঁদে উঠলেন শব্দ করে। সেঁজুতি আর সময় নিল না। আছড়ে পড়ল বাবার বুকে। আমির আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে কাঁদেন। অনুশোচনায় ছারখার হয়ে বলেন, "আমায় ক্ষমা করে দে মা, ক্ষমা করে দে।"

সেঁজুতি কাঁদতে কাঁদতে জবাব দেয়, "না বাবা, আমি সব ভুলে গেছি। কিছু মনে রাখিনি।"

মুনারা আঁচল মুড়িয়ে চোখের জল মুছলেন। ছোটো মেয়েটাকে আরো চেপে রাখলেন কাছে। বাবা-মেয়ের এই আনন্দ মিলন দেখে দেখে মুচকি চোখে হাত দেয় সে। কী আশ্চর্য! এদের কান্না দেখে কখন যে নিজেও কেঁদে হাসল আরিশা। খেয়াল হলো কোটর দুটো ঝাপসা হয়ে এসেছে। তৎপর কাছে এলো। ইতি আবদার ছড়ল শিশুর ন্যায়, "আমাকেও একটু জড়িয়ে ধরো না,বাবা"।

আমির সেঁজুতিকে ছেড়ে সরে এলেন। দুজনেই হেসে ফেললেন কথাটায়। বাম হাত বাড়িয়ে ওকেও টেনে নিলেন বুকে। দুই পাশে দুই মেয়ে। আহা, আজ যেন বুকখানা একদম ভরা ভরা লাগছে। কে বলে টাকা থাকলেই ধনী হওয়া যায়? এই যে, তার দুই রাজকন্যা বুকে মিশে আছে। একজন বাবার কাছে এর চাইতে বড়ো সম্পদ আর হয়?

"যাক! কান্নাকাটি দেখছি এখনো চলছে। আমি ভাবলাম দেরি হলো, পাব না এসে।"

স্বতঃস্ফূর্ত কন্ঠটা কোথেকে ভেসে এলো হঠাৎ। চকিতে ফিরে চাইল সেঁজুতি। দরজায় রুদ্র দাঁড়িয়ে। গম্ভীর পুরুষটির গম্ভীরতা বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। আজকাল ঠোঁটের ভাঁজে ডিমবাতির মতো হাসি দেখা যায়। এই যে, এখনও হাসছে। অথচ চমকে উঠল সেঁজুতি। চোখ দুটো ঠেকে গেল কপালে। এ কী। উনি এখানে কী করছেন? নতুন বাসা চিনলেন কী করে? যদিও চিনেছেন, এখনই আসতে হলো? এখন বাবা-মায়ের সামনে কী না কী বলে বসবে। আজকাল তো এর মাঝে একটু লজ্জাও দেখা যায় না। তাছাড়া কেউ জিজ্ঞেস করলে কী উত্তর দেবে? রাতেরবেলা বস বাড়িতে আসা তো বাবা-মা ভালো চোখে দেখবেন না। সেঁজুতি কান্না ভুলে ঘাবড়ে গেল। বাবার দিক চেয়ে চেয়ে ঢোক গিলল ক-বার।

CamScanner

আমির হাতের তালু দিয়ে চোখের পানি মুছলেন। ঠোঁটে হাসি টেনে বললেন, "রুদ্র, এসো বাবা। তা এত দেরি করলে যে আসতে?"

বাবার মুখে রুদ্রর নাম শুনে ছলকে উঠল সেঁজুতি। চোয়াল ঝুলে গেল ক-হাত। বাবা ওনাকে চিনলেন কী করে?

রুদ্র এই বিমূঢ়তায় কোনো তোয়াক্কা করেনি। বড়ো সাবলীল ভঙ্গিতে ভেতরে ঢুকল। বললও সাবলীলভাবে, "আপনার মেয়ের আগে তো আসতে পারি না আঙ্কেল, তাই অপেক্ষা করছিলাম। আপনাদের বোঝাপড়া কি শেষ?"

সেঁজুতি টের পাচ্ছে মাথা ঘুরছে ওর। এই তো, ডান-বাম করছে শুধু। কিছুই বুঝতে না পেরে একবার আরিশার দিক চাইল। কিন্তু লাভের লাভ হলো না। আরিশা তো দেখছেই না এদিকে। বোকার মতো দাঁত কেলিয়ে হাসছে শুধু।

এর মাঝেই রুদ্রর কাছে ছুটে গেল ইতি। মাথা হেলিয়ে-দুলিয়ে বলল, "হ্যাঁ। আব্বুব আপুকে আর আপু আব্বুকে ধরে খুব কেঁদেছে, দুলাভাইয়া। সব ঝামেলা শেষ।"

সাথে দুইহাত দিয়ে ক্রস দেখায় মেয়েটা। ইতির 'দুলাভাইয়া' সম্বোধনে সেঁজুতির কান গরম হয়ে আসে। ঘোলা হয় পরিষ্কার দুই চোখ। ধমকাবার জন্য হাঁ করবে, থেমে গেল রুদ্রর কথা শুনে। ছেলেটা তুষ্ট কণ্ঠে মাথা নেড়ে বলল, "ভেরি গুড!"

সাথে ফোলা গালটা টেনে দিলো ইতির। সেঁজুতি জড়বুদ্ধি বনে রইল। এসব কী হচ্ছে এখানে? ঘটছেটা কী? এরা সবাই সবাইকে কীভাবে চেনে?

আরিশা তখন বলল, "ভাইয়া দাঁড়িয়ে কেন? বসুন না।"

চেয়ারও এগিয়ে দিল সাথে। রুদ্র হেসে বলল, "সমস্যা নেই। আমি ঠিক আছি।"

তারপর সোজাসুজি সেঁজুতির দিকে চাইল সে। নির্বোধের ন্যায় চেয়ে থাকা মেয়েটিকে দেখে ওষ্ঠপুটে বাঁকা হাসি ফুটল।

সেঁজুতি খেই হারাল এবার। অধৈর্য হয়ে বলল, "আচ্ছা, ব্যাপারটা আমাকে একটু খুলে বলবে কেউ? উনি এখানে কেন? আর মা, বাবা তোমরাই-বা ওনাকে কীভাবে চিনলে?"

CamScanner

মুনারা স্ফূর্ত কণ্ঠে জানালেন, "না চিনে পারি? ওর জন্যেই তো তোকে খুঁজে পেলাম। ওই তো আমাদের নিয়ে এলো এখানে।"

সেঁজুতি হোঁচট খেল। কণ্ঠ শৃঙ্গে তুলে বলল, "কী?"

মৃদু হাসলেন মুনারা। রুদ্র পাশেই দাঁড়িয়ে তাঁর। লম্বা চওড়া ছেলেটার মাথায় হাত রাখলেন তিনি। হঠাৎ স্পর্শে থমকায় রুদ্র। ফিরে চায় বিস্মিত বনে। ভদ্রমহিলা নিবিড় স্নেহে মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, "তোমাকে প্রাণ ভরে দোয়া করি বাবা, আল্লাহ তোমার সব ইচ্ছে পূরণ করুক। তোমার জন্যেই বাবা-মেয়ের সব ঝামেলা এতদিনে কেটেছে। নাহলে কে জানত, কবে চোখের দেখা দেখতাম মেয়েটাকে! তুমি দেখো, আল্লাহ তোমার খুব ভালো করবেন।"

ভীষণ ভালো কথাগুলোতে খুশির বদলে অভিব্যক্তি পালটে গেল রুদ্রর। এতক্ষণের উজ্জ্বল শুভ্র ত্বক পানসে হলো সহসা। চোখের পর্দায় মায়ের মুখখানা ভাসতেই, একটু একটু করে সব হাসি মুছে গেল তার। চওড়া বুকটা ছিঁড়েখুঁড়ে বেরিয়ে এলো পুঞ্জ পুঞ্জ দীর্ঘশ্বাসের ঝুলি। আচ্ছা, খুব কি ক্ষতি হতো যদি মাও বেঁচে থাকতেন আজ?

রুদ্র চোখ নামাল। গলা ঝেড়ে বলল, "আমি এখন আসছি।"

মুনারা ব্যস্ত হয়ে বললেন, "সে কী। চলে যাবে কেন? বসলেও তো না"

আমিরেরও একই কথা, "এই খুশির সময় কোথায় যাচ্ছ, বাবা?"

রুদ্রর বাদামি চোখ মেঝের ওপর। ওভাবেই জানাল, "একটা কাজ পড়েছে। আপনারা থাকুন, আমি তো আছিই।"

তারপর দ্রুত পায়ে ঘর ছাড়ল সে। সবার কাছে বিষয়টা সহজ হলেও, সেঁজুতির খটকা লাগল। ওনার গলাটা কেমন শোনাল না?

'আমি একটু আসছি' বলেই চপল পায়ে বেরিয়ে যায় সে। মুনারা মেয়ের যাওয়ার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে স্বামীর পানে চাইলেন। আমিরে ঠোঁটে চাপা হাসি। গলা খাঁকারি দিয়ে বললেন, "ইয়ে আরিশা, বাজারের ব্যাগটা দাও তো, মা। আজ সবার পছন্দের বাজার করে আনি।"

"শুনুন, এই যে শুনুন না।"

CamScanner

রুদ্র থেমে দাঁড়াল। কার্নিশের টইটম্বুর জলের ফোঁটা আঙুল দিয়ে ছিটকে ফেলল দ্রুত। পেছন থেকে দৌড়ে এসে দাঁড়ায় সেঁজুতি। জোরালো শ্বাস ফেলে বলে, "আপনার কি খুব বেশি তাড়া আছে?"

রুদ্রর পালটা প্রশ্ন, "কিছু বলবেন?"

সেঁজুতির বৃহৎ চোখের দৃষ্টিতে ছেলেটার কালো মুখ ঠিক ধরা পড়ে। জিজ্ঞেস করল সরাসরি, "আপনার কি মন খারাপ, স্যার?"

রুদ্র তড়িৎ মাথা নাড়ল দুপাশে। এসব ব্যথা সে কাউকে জানাতে পারে না। চাইলেও না। অথচ সেঁজুতি ঠিক বুঝে নিয়েছে। পৃথিবীর সব কোমলতা কণ্ঠে এনে শুধাল, "আপনার কি আপনার মাকে মনে পড়ছে?"

চমকে চাইল রুদ্র। অবাক হয়ে বলল, "আপনি কী করে বুঝলেন?"

সেঁজুতির উত্তর শিশুসুলভ, "জানি না। মনে হলো তাই বললাম।"

রুদ্রর বুক জুড়িয়ে আসে তাও। মেয়েটার জন্য তার এত প্রেমের কারণ যেন আরেকবার পরিষ্কার হলো আজ। এই যে না বলতেই ওকে বুঝে নিল, এই যে না জেনেই মনের কথা বলে দিলো, এসব কি সবাই পারবে?

রুদ্র অমন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই ঘোষণা করল, "সেঁজুতি ছাড়া পৃথিবীতে রুদ্রকে বোঝার মতো দ্বিতীয় মানুষ নেই।"

তার মন ভালো হয়ে যায়। ভুলে বসে দুঃখ। মৃদু হেসে বলে, "আর কিছু বলার নেই আপনার?”

ইঙ্গিত বুঝতেই মিইয়ে গেল সেঁজুতি। চোখ নামাল ত্বরিত। উশখুশে জিভে কথা খুঁজল কিয়ৎক্ষণ। সময় নিয়ে বলল, "একটা কথা জানতে চাইব?"

"বলুন।"

ও চোখ তুলে চাইল। ইতস্তত করে বলল, "না আসলে, সেদিন যে আমি ট্রেনে ছিলাম আপনি কী করে জানলেন? ঠিক সময় কী করে পেলেন আমায়? চলন্ত ট্রেনে উঠলেনই-বা কী করে?"

CamScanner

সেঁজুতির চোখমুখে আগ্রহের বন্যা। রুদ্র কপাল কুঁচকে বলল, "সেসব জেনে আপনি কী করবেন?"

মেয়েটা ঠোঁট উলটায়, "একটু জানলে কী হয়? বলুন না!"

রুদ্র দুই গাল ফুলিয়ে শ্বাস ফেলল। ও আবার বলল, "প্লিজ!"

ছেলেটা নিম্নোষ্ঠ কামড়ে কিছু একটা ভাবে। শেষে অনুনয় মেনে নিয়ে বলে, "আচ্ছা শুনুন, রাফিন-মানে আপনার সাথে যার বিয়ে হওয়ার কথা ছিল? তার সঙ্গে একদিন ভীষণ ঝামেলা হয়েছিল আমার। মনে আছে নিশ্চয়ই?"

সেঁজুতি ত্রস্ত ঘাড় ঝাঁকাল।

"মনে থাকবে না আবার? ওসব ভোলা যায় না কি?"

"সেদিন থেকেই আমি আপনাকে নিয়ে ইনসিকিউরড ছিলাম। যতই হোক, আমি তো মানুষ। সবসময় হাওয়ার মতো উড়ে গিয়ে আপনার বিপদে পাশে থাকতে পারব না। ভয় হলো, চিন্তা বাড়ল, এই বুঝি আমার প্রাণভোমরা ছিনিয়ে নেয় কেউ!"

এটুকুতেই গলা শুকিয়ে আসে সেঁজুতির। ভালোলাগায়, কিংবা ভালোবাসায়। রুদ্রর প্রাণভোমরা সে? ভাবতেই কুণ্ঠায় নিজের প্রাণই যেন ওষ্ঠাগত হলো।

রুদ্র বলে যাচ্ছে তখনও, "সেই ভয় থেকেই আমি দুজন স্পাই লাগিয়েছিলাম আপনার পেছনে। আই মিন আমার প্রাইভেট ডিটেকটিভ। যারা সবসময় আপনাকে চোখে চোখে রাখবে। আপনার খুঁটিনাটি সমস্ত ইনফরমেশন এনে দেবে আমাকে। আপনি কখন বের হচ্ছেন, বাসায় ঢুকছেন, কোথায় যাচ্ছেন সবকিছু। এই যে এখানে আমার সাথে দাঁড়িয়ে আছেন সেটাও কিন্তু তাদের সার্ভিলেন্সের মধ্যেই পড়ে!"

সেঁজুতির চোখ ভ্রুতে উঠে যায়। তাজ্জব হয়ে বলে, "এসব কী বলছেন আপনি?"

রুদ্র ঠোঁট কামড়ে হাসল। ভ্রু উচিয়ে বলল, "কেন? ভয় পেলেন?"

"না মানে...। আচ্ছা, আপনার স্পাইরা শুধু বাইরেই থাকে তো? না কি বাসার মধ্যেও..."

"না শুধু বাইরে।"

CamScanner

সেঁজুতি স্বস্তি পায়। সাগ্রহে শুধায়, "তারপর, তারপর কী হলো বললেন না তো!"

রুদ্র কাঁধ উচাল, "তারপর আর কী? যেদিন আপনি সিলেট যাচ্ছিলেন, আরিশা হঠাৎ ফোন করল আপনি বাসায় নেই। ফোন বন্ধ। সাথে সাথে মাহবুবকে কল করলাম আমি। শুনলাম অফিসেও নেই। এর মাঝে আমার ফোনে কল এলো, জানলাম আপনি স্টেশনের দিকে যাচ্ছেন। ব্যস, আর দেরি না করে বেরিয়ে যাই।

আপনার টিকিট কাটা থেকে বেঞ্চে বসে কেঁদে ভাসানো, সবটা দূর থেকে দেখেছি আমি। আপনি ঠিক যেই কেবিনের টিকিট নিয়েছিলেন? সেই পুরো কেবিনটাই আমি রিজার্ভ করেছিলাম। যাতে অন্য কেউ সেখানে যেতে না পেরে। আপনি ট্রেনে উঠলেন, আমিও উঠলাম। আপনার সামনে দিয়েই ঢুকলাম কেবিনে। অথচ আপনি ভাবনায় এতটাই মগ্ন ছিলেন, আমাকে দেখলেনই না। কাকে নিয়ে ভাবছিলেন অত? আমাকে?"

রুদ্র ডান ভ্রু নাঁচাল। প্রথমদিকে হাঁ করে থাকা সেঁজুতি, এবার ঠোঁট টিপে নেয়। চেহারায় লেপটে আসে চোরসুলভ ভাব। সত্যিই তো, ওনার কথাই ভাবছিল সেদিন। কিন্তু সেটা তো আর বলা যাবে না। রুদ্র হঠাৎ বলে বসল, "একটা কথা জানেন মিস সেঁজুতি, আপনার এই বোকা বোকা মুখটা দেখলে কেউ বুঝবেই না আপনি কী জিনিস!"

সেঁজুতি সিরিয়াস চোখে চাইল। জিভটা তেড়েমেরে ঝগড়া করতে যেয়েও, চুপসে রইল আবার। বলল দায়সারা, "ধন্যবাদ!"

রুদ্র মিটিমিটি হাসছে। বুঝতে পেরেও বলল, "স্পাই লাগানোর জন্যে?"

সেঁজুতি নাক ফুলিয়ে জানায়, "জি না। আমার পরিবারকে আমার কাছে নিয়ে আসার জন্যে।"

রুদ্র কিছু বলতে গেলেই কথা টেনে নেয় সে। কণ্ঠে উদ্‌দ্বেগ ঢেলে বলে, "আমি কিন্তু ফরমালিটি পালন করতে ধন্যবাদ দিচ্ছি না। যা বলেছি মন থেকে।"

পরপর স্বর নরম করে বলল, "আপনার জন্যেই খুব তাড়াতাড়ি আবার বাবা-মাকে কাছে পেলাম। নাহলে কতদিন জেদ ধরে দূরে সরে থাকতাম নিজেও জানি না।"

রুদ্র চোখ সরু করে, "আপনার ভীষণ জেদ, তাইনা?"

মেয়েটার ফটাফট জবাব, "একটু। তবে আপনার থেকে কম। আপনি তো জেদে তুলনাহীন।"

CamScanner

রুদ্র বুকের সাথে হাত গুঁজে দাঁড়াল। সোজাসাপটা বলল, "যদি তুলনাহীন জেদিই হোতাম, তাহলে আমাকে প্রত্যাখান করার পরেও এইভাবে আপনাকে চোখের সামনে রেখে দিতাম না। জোর করে হলেও বুকের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখতাম। ছটফট করলেও, ছাড়া পেতেন না!"

সেঁজুতির বুক ধক করে উঠল। গরম হলো ফরসা গাল। যেন চামড়া ভেদ
করে এক্ষুনি রক্ত আসবে বাইরে। সেই আরক্ত মুখবিবরে এক যোগে চেয়ে থাকে রুদ্র। মুগ্ধতার স্রোতে বাদামি আইরিশ ডুবুডুবু হয়। জিজ্ঞেস করে ঠোঁট নেড়ে, "তা আপনার কাছে আমার জেদের সজ্ঞাটা কী? কেনই-বা মনে হলো এমন?"

সেঁজুতির মিনসে জবাব, "বলব কোনো একদিন!"

"অপেক্ষা করতে বলছেন?"

"করবেন না?"

রুদ্র শব্দহীন হাসল। ঠিক চোখের দিকে চাইল ওর। জবাব দিলো ভরাট স্বরে, "আপনার জন্যে অপেক্ষা করতে করতে আমার এক জনম ফুরিয়ে গেলেও, আমি ক্লান্ত হব না।"

একদন্ড দাঁড়াল না আর। হৃদয় ছোঁয়া উত্তর দিয়ে ব্যস্ত পায়ে উঠে বসল গাড়িতে। স্টার্ট দিতে দিতে ফিরে চাইল আবার। তখনও মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তাকিয়ে সেঁজুতি। সরল মুখখানিতে কী যে মায়া। রুদ্র শীতল শ্বাস টানে।

প্রশ্ন ছোড়ে হুটহাট, "আপনাকে যদি আমার বাম পাঁজরের হাড় দিয়ে বানানো না-ই হবে, তাহলে আপনার প্রতি আমার এত টান কেন, সেঁজুতি? এত টান তো মোহ হতে পারে না। এ ভালোবাসা, সেঁজুতি। একটি জ্বলন্ত সন্ধ্যা প্রদীপের প্রতি রুদ্রর সীমাশূন্য অপরিমেয় ভালোবাসা।"

মনের কথা উগড়ে দিয়ে স্টিয়ারিং ঘোরাল সে। ফের ঠোঁট নড়ল, "ভালোবাসি সেঁজুতি!"

কথার পিঠে প্রত্যুত্তর করার উপায় রইল না। রুদ্র প্রস্থান নিল এর আগেই। গাড়ির পেছন থেকে উড়তে থাকা সাদা-কালো ধোঁয়ার দিকে চেয়ে থাকে সেঁজুতি। উদাসীনতায় আওড়াল, "আপনার ভালোবাসা প্রলয়ঙ্কারী রুদ্র মূর্তির ন্যায়। যা আমার সংযম ধীরে ধীরে গুড়িয়ে দিচ্ছে। হয়তো আলগোছে আমাকেও গ্রাস করছে আপনার সংখ্যাতীত "প্রণয়াকাঙ্ক্ষা"!

২৯.

আরিশার ছোট্ট ফ্ল্যাটে আজ উৎসব লেগেছে। দুহাত ভরে বাজার এনেছেন আমির। সেঁজুতি থেকে শুরু করে সবার পছন্দের একেকটা জিনিস। মুনারা রান্না করছেন। ইতি টেলিভিশন দেখছে। আমির গা পেতেছেন বিছানায়। বহুদিন পর একটা লম্বা জার্নিতে ক্লান্ত লাগছে ভীষণ! তার ওপর বিশাল বাজার চক্কর কেটেছেন আজ। সেঁজুতি এতক্ষণ বাবার পাশে বসে ছিল। বিস্তর গল্প শেষে বেরিয়ে এলো এবার। ঠোঁট ভরতি তৃপ্ত হাসির বাণ। বাবাকে কেমন নতুন করে চিনছে! সেই রাগী, গম্ভীর বাবা আর নেই। এ যেন একেবারেই অন্যরকম কেউ। আগে হুঁ-হাঁ ছাড়া জবাব না দেওয়া লোকটা আজকে ডেকে ডেকে কথা বলছে, গল্প করছে।

সেঁজুতির সমস্ত দুঃখ, আজকের এই আনন্দরা আরামসে শুষে নেয়। ফেরত দিয়ে যায় কিশোরী সুলভ প্রাণবন্ত ভাব। মেয়েটা আরিশাকে খুঁজে বেড়াল প্রথমে। ঘরের কোথাও সে নেই। নির্ঘাত ছাদে। সেঁজুতি তৎপর দরজা খুলে ছাদের সিঁড়ি ধরল।

আরিশা রেলিংয়ের ওপর বসে বসে কথা বলছে ফোনে। অভ্রর সাথে প্রেমের সবটুকু জানে সেঁজুতি। সেই বলেছিল। নিশ্চয়ই ওর সাথে কথা বলছে? ও ভাবল বিরক্ত করবে না। ফিরে আসতে নিলে পেছন থেকে ডেকে ওঠে মেয়েটা, "কী রে, চলে যাচ্ছিস কেন?"

সেঁজুতি ঘুরে চাইল, "তুই কথা বল, সমস্যা নেই।" "আরে আয় তো। আচ্ছা অভ্র আমি পরে ফোন দেই, বাবু?"

অভ্র মেনে নিয়েছে। কান থেকে ফোন নামাল আরিশা। সেঁজুতি বলল,

"শুধু শুধু ফোন কাটলি।"

"ওর সাথে তো দিনের চব্বিশ ঘন্টাই কথা বলি। আমরা দুজন কতদিন আড্ডা দেই না, বল তো!"

সেঁজুতি বিগলিত হাসল। আরিশা ধপ করে মেঝেতে বসে পড়ল ছাদের। ওর হাতটা টেনে বসিয়ে দিল পাশে। সেঁজুতি হাঁ করতেই যাচ্ছিল, আচমকা প্রশ্ন ছুড়ল মেয়েটা, "রুদ্র ভাইয়া ভীষণ ভালো না রে, সেঁজুতি?”

ও থমকায়। ভ্রু কুঁচকে বলে, "হঠাৎ এই কথা?"

"না, আসলে ভাবছি ওনাকে প্রথম প্রথম আমি কত খারাপ ভেবেছি। সেই চাকরিটার সময়, দেখলেই গা জ্বলত। মনে মনে কী গাল মন্দটাই না করতাম। অথচ লোকটা একটু রগচটা হলেও সত্যিকারের ভালো মানুষ। অহংকারী, তবে বেশ নরম মনের। ঠিক নারকেলের মতন বুঝলি?"

CamScanner

কথার পিঠে মৃদু হাসল সেঁজুতি। ও ফের বলল, "এমন একটা মানুষ তোকে ভালোবাসে, তুই কত ভাগ্যবতী ভাব তো একবার। আজ তুই অফিস যাওয়ার পরপরই আঙ্কেল, আন্টি এলেন। ভাইয়া নিজে দিয়ে গেলেন ওনাদের। এরপর তুই যখন অফিস থেকে বের হলি? ভাইয়া সাথে সাথে ফোন করে জানালেন আমাদের। ওনার কথানুযায়ী আমরা আলো নিভিয়ে সিরিয়াল ধরে অপেক্ষা করছিলাম তোর জন্যে। উনিই চাইছিলেন তুই চমকে যাবি, অবাক হবি, সাথে এত্ত এত্ত খুশি এসে লুটিয়ে পড়বে তোর পায়ে। আবার আমাকে বলেও দিয়েছেন আমি যেন সেই মুহূর্তটা ফোনে ভিডিয়ো করে রাখি। উনি দেখবেন, খুব খুশি হলে কেমন দেখতে লাগে তোকে। কী দারুণ না ব্যাপারটা?"

সেঁজুতি অবাক হলেও, হাসছে। লোকটা যে কত বাজে রকমের পাগল, ওর থেকে ভালো কে জানে?

মিহি কণ্ঠে বলল, "এসব যে ওনার কাজ আমি বেশ বুঝেছি।"

আরিশা কাঁধে হাত রাখল হঠাৎ। এত সময়ের সাবলীল কণ্ঠ, গুরুতর হলো। বলল, "ওনাকে একটা সুযোগ দিয়ে দেখ না। সবাই তো রাফিনের মতো নাও হতে পারে।"

সেঁজুতির হাসিটুকু মুছে গেল অমনি। ফিরল গাঢ় চোখে।

ও বলল, "সত্যি বলছি, মানুষটা ভালো। সুখী হবি তুই। উনি যে তোকে কতটা ভালোবাসেন, আমি দূরের মানুষ হয়ে বুঝতে পারছি। আর তুই তার এত কাছে থেকেও বুঝিস না? একবার ভেবে দেখ সেঁজুতি, আমি নিশ্চিত তুই ঠকবি না। কারণ আরিশাও এখন কাচ আর হীরের তফাত করতে শিখেছে। তাই তুইও রাফিনের মতো টিনের টুকরোর জন্যে রুদ্র ভাইয়ার মতো জহরতকে দূরে ঠেলে দিস না।"

সেঁজুতি কিছু বলল না। চুপচাপ চোখ সরিয়ে নিতেই আরিশা হতাশ হলো একটু। তক্ষুনি নিচ থেকে হাঁক ছুড়ল ইতি, "আপু, আরিশা আপু, খেতে এসো। আম্মু ডাকছে।"

আরিশা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়াল। সেঁজুতি তখনো বসে রয়। মানস্পটে, কানের পাশে কেবল রুদ্রর কথা বাজে। কিন্তু মন, সেখানে রুদ্রর প্রতাপ চলছে আদৌ?

মধ্যরাত! প্রায় একটা বেজে এসছে। ফ্রেশ হয়ে সবেমাত্র বিছানার দিকে হাঁটা ধরেছে রুদ্র, অমনি ডোরবেল বাজল। ছেলেটা দাঁড়িয়ে যায়। ভ্রু কোঁচকায় বিভ্রমে। দেওয়ালঘড়ি দেখে খটকা লাগে মনে। এত রাতে কে আসবে?

CamScanner

ততক্ষণে পারভেজ দরজা খুলেছে। আগন্তুকের সিঁড়ি বেয়ে ওঠার শব্দ স্পষ্ট পাচ্ছে রুদ্র। অধৈর্য সে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো বাইরে। বিস্মিত হয়ে বলল, "তুই?"

অভ্র হাস্যহীন এগিয়ে আসে। বিরস কণ্ঠে শুধায়, "কেমন আছ, ভাই?"

ছেলেটার শুভ্র আদলে ঘন অমাবস্যা। রুদ্র এমন কখনও দেখেনি। অভ্র তো ওর মতন নয়। বরং চনমনে একটা ছেলে।

একটু চুপ থেকে বলল, "ভেতরে আয়।"

বলে ঢুকে গেল ঘরে। অভ্র পেছনে আসে। রুদ্র কাউচে বসে পাশের জায়গা ইশারা করল। ও বসল সেথায়।

"হঠাৎ এখানে এলি, তাও এত রাতে?"

অভ্র নিশ্চুপ। উত্তরের বদলে মাথা নুইয়ে রাখল। রুদ্রর কণ্ঠ সন্দিহান,

"বাড়িতে কিছু হয়েছে?"

ছেলেটা থম ধরে থাকে। না কিছু বলছে, না কিছু বুঝতে পারছে রুদ্র। সে সাবলীল স্বর গম্ভীর করল এবার। পুরু কণ্ঠে ডাকল, "অভ্র। কিছু বলছি তোকে।"

কাঁধে হাত রাখতে যাবে, আচমকা অভ্র জড়িয়ে ধরল ওকে। রুদ্র চমকায়। অবাক হয়। অভ্র ঝরঝর করে কেঁদে ফেলেছে। যেন দশ বছরের ছোট্ট এক শিশু। কণ্ঠে পরিতাপের বর্ষা ঝরিয়ে বলছে, "আ'ম সরি ভাই! আ'ম সরি ফর এভ্রিথিং!"

রুদ্রর বিস্ময় সীমা ছাড়ায় এবার। বড়ো ভাইয়ের মতো গায়ে-মাথায় হাত বোলাল। কণ্ঠ মোলায়েম, "কী হয়েছে? বল আমাকে!"

অভ্র মুখ তুলে চাইল। সরে এসে ভেজা চোখ মুছতে মুছতে বলল, "ছোটোবেলা থেকে জেনে এসেছি আমার বাবা ব্যবসার কাজে গিয়ে আর ফেরেননি। কেন, কী কারণে সেসব মা আমাকে কোনোদিন বলেননি। না জেনে, না বুঝে আমি মনের মধ্যে বাবার প্রতি এক বিস্তর অভিমান পুষে রেখেছিলাম। ঠিক একইরকম অভিমান ছিল তোমার প্রতিও। বড়ো হতে হতে আমার দুনিয়া বলতে তো মা, মামা আর তোমাকেই জেনেছি। জানো ভাই, আমার খুব খারাপ লাগত,

CamScanner

যখন তুমি আমার সঙ্গে খেলতে না। মেপে মেপে কথা বলতে সবসময়। আমি ডাকলেও বাইরে আসতে না। একা থরে চুপ করে বসে থাকতে। আমার কষ্ট হতো ভীষণ। অথচ আজ বুঝতে পারছি, তুমি আসলে মামণির মৃত্যুতে ভেতর ভেতর কতটা ভেঙে পড়েছিলে। যেই ভাঙন আমাদের প্রতি তোমার এক আকাশ ঘৃণার জন্ম দিয়েছিল। সেজন্যেই তো কারোর সাথে কথা বলতে না। আমি হলেও হয়তো এমনই করতাম। এই তো, যখন থেকে শুনেছি আমার মায়ের জন্যে বাবা চলে গেছেন কোথাও, তখন থেকেই মায়ের ওপর নিপাত অভিমানে বুকটা ফেটে যাচ্ছে, ভাই। ভেতরটা অশান্তিতে চুরমার হচ্ছে শুধু। আর তাই, তোমাকে ভুল বুঝে বুঝে কাটিয়ে দেওয়া সমস্ত অতীতের জন্য আমি ক্ষমা চাইতে এসেছি। ক্ষমা করবে না আমায়?"

রুদ্র সব কথা মন দিয়ে শুনেছে। অভ্র থামতেই দীর্ঘশ্বাস ফেলল। অল্প হেসে বলল, "বোকা! সরি কেন বলছিস? এখানে তোর কী অন্যায়? আর আমার কেন তোর ওপর অভিমান হবে, অভ্র? কেন আমি ঘৃণা করব তোকে? তোর তো তখন চার বছর মাত্র। ঠিকঠাক কথাই বলতে পারতিস না। আমি আসলে নিজেই সহজ হতে পারিনি। ফুপি আর বাবার প্রতি রাগ পুষে পুষে তোকেও দূরে সরিয়ে দিতাম। কিন্তু বিশ্বাস কর, আমি সত্যিই তোকে আমার ছোটো ভাই মনে করি। শুধু মনেই করি না, আমি তোকে ভালোওবাসি, অভ্র। সত্যিই ভালোবাসি।"

প্রথমবার রুদ্রর মুখ থেকে নিজের ব্যাপারে এমন কিছু শুনে কান্না ভুলে গেল অভ্র। বিস্মিত বনে চেয়ে থাকল কেবল। রুদ্র নিজেই বলল, "আর একটা কথা কী জানিস? আমি কিন্তু ফুপি, ড্যাড সবাইকেই ভীষণ ভালোবাসি। তোরাই তো আমার আরেকটা পৃথিবী। সেদিন রাগের বশে বাধ্য হয়ে ড্যাডকে অতগুলো কথা শুনিয়েছিলাম। নাহলে কী করতাম বল? যখন জানলাম, ড্যাড সেঁজুতিকে ভয় দেখিয়ে, ব্লাকমেইল করে ঢাকা থেকে সরিয়ে দিচ্ছিল; আমি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারিনি।

আমি জানি অভ্র, পৃথিবীতে ড্যাড সবথেকে বেশি আমাকে ভালোবাসেন। কিন্তু আমার মায়ের সাথে হওয়া অন্যায়টাও তো মিথ্যে নয়। আর না মিথ্যে এনামূল আঙ্কেলের হারিয়ে যাওয়া।”

অভ্রর বাবার মুখটা চোখে ভেসে উঠল। সাদা-কালো ফ্রেমে দেখেছিল হাজারবার। সঙ্গে সঙ্গে গলার কাছে উথলে এলো কান্না। পুরুষালি কণ্ঠস্বর বুজে গেল কথা বলতে গিয়ে, "আমি যদি একটা জিনিস চাই, দেবে ভাই?"

রুদ্রর বিলম্বহীন জবাব, "কেন দেবো না? বল কী চাস!”

চট করে রুদ্রর হাত ধরল অভ্র। মুঠোর মধ্যে আষ্টেপৃষ্ঠে বলল, "তাহলে বাবাকে খুঁজে এনে দাও না, ভাই! তুমি চাইলে ঠিক পারবে আমি জানি। দাও না, ভাই। আমি একবার আমার বাবাটাকে

CamScanner

চোখের দেখা দেখতে চাই। তার হাতটা মাথায় নিয়ে আমার মাথায় রাখতে চাই। বাবা কেমন হয়, কেমন হয় তাদের চাউনি বুঝতে চাই সেটা। দেবে ভাই, বলো না। দেবে তো?"

রুদ্র এমন আবদার আশা করেনি। হোঁচট খেয়েছে বিস্ময়ে। কথার বাণে সবাইকে ঘায়েল করা ছেলেটা আজ কী বলবে, কীভাবে বলবে গুলিয়ে ফেলছে সব। সময় খাটিয়ে বলল, "হুঁ দেবো।"

অভ্র বুক ভরে শ্বাস নিল। ফের রুদ্রকে জাপটে ধরল দুহাতে। খুশিতে দিশা হারিয়ে বলে গেল অনর্গল, “থ্যাংক ইউ, ভাই! থ্যাংক ইউ!"

কিন্তু রুদ্র স্তব্ধ বনে থাকে। ঢোক গিলে চাপা দিলো উদ্যমী শোক। এনামুলের ব্যাপারে তো বহু আগেই খোঁজ নিয়েছিল সে। আসামের একটা চাইল্ড কেয়ার অ্যাসোশিয়েশানে কাজ করতেন ভদ্রলোক। কিন্তু সেই অবধি যেতে রুদ্রর যে অনেকটা সময় লেগে গেছিল। ততক্ষণে পৃথিবীর মায়া ছেড়ে চলে গিয়েছেন এনামুল। এই কথা রেহানও জানেন। কিন্তু দুজনেই মুখ ফুটে কাউকে জানাতে পারেনি। স্বামীর অপেক্ষায় এখনও পথ চেয়ে থাকেন রেহানা। এনামুল একদিন আসবে, এই আশায় রমণীর চকচকে মুখটা দেখে প্রতিবার ওরা গিলে ফেলত সবকিছু।

রুদ্র ফোঁস করে শ্বাস ফেলল।

মনে মনে বলল, "সরি রে, অভ্র। মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি তোকে। আমায় মাফ করিস। আঙ্কেলকে আমি কেন, দুনিয়ার আর কেউ কখনওই খুঁজে পাবে না।”

"ঘুমিয়েছ সেঁজুতি?"

সুনসান রাতে, ঘরের বাইরে থেকে হঠাৎ বাবার কণ্ঠ শোনা গেল। চট করে চোখ মেলল সেঁজুতি। কোমর থেকে বোনের হাত ছাড়িয়ে উঠে এলো আলগোছে। দরজা খুলতেই আমির বললেন, "এখনো ঘুমোওনি?"

"ঘুম আসছে না।"

উনি একটু চুপ থেকে বললেন, "বারান্দায় যাই চলো।"

সেঁজুতি অবাক হয়। রাত প্রায় দুটো বাজে। এই সময়, বাবার মুখে এমন কিছু সে আশাও করেনি। সায় দিতে ঘাড় নাড়ল তাও।

CamScanner

ঘরের বাকিরা তখন নিদ্রায় তলিয়ে। আমির-মুনারাকে যে ঘরে শুতে দেওয়া হয়েছে, সে ঘরেই একটা মোটামুটি চিকন বারান্দা আছে। মেয়েকে নিয়ে সেখানে এলেন ভদ্রলোক। সতর্ক নেত্রে স্ত্রীর ঘুমটাকে পরখ করলেন একবার।

বাবার বসার জন্যে সেঁজুতি একটা চেয়ার পেতে দিলো। আমির বসতে বসতে শুধালেন, "পড়াশোনার কী খবর? পরীক্ষা কেমন দিলে?"

এত আশ্চর্য হলো সেঁজুতি! পরীক্ষা দেওয়ার কথা বাবা জানলেন কী করে? আমির নিজেই বললেন, "তুমি কী ভেবেছ, বাড়ি ছেড়ে আসার পর তোমার খবর নেওয়ার চেষ্টা করিনি? করেছি। ভার্সিটি গিয়েই জেনেছি তুমি এই সেমিস্টার দিয়েছ। শুনে ভালো লাগলেও কষ্ট পেয়েছি বুঝলে। আমার কারণেই তো বাড়িমুখো হলে না। সেদিন তোমার সাথে আমি একটু বেশিই..."

পথিমধ্যে কথা টেনে নেয় সেঁজুতি, "ওসব কথা থাক না বাবা...."

"না। আমাকে বলতে দাও।"

বলেও, স্বল্প বিরতি নিলেন আমির। লম্বা দম টেনে বললেন, "তুমি কিছু কথা ঠিকই বলেছিলে। আমি সত্যিই ভালো বাবা হতে পারলাম না। আর না পারলাম তোমার মায়ের ভালো স্বামী হতে। আমি মেনে নেব সে কথা। আর এটাও ঠিক বলেছিলে, আমি রাফিনদের অবস্থার কথা জেনেই বিয়েতে এক কথায় মত দিয়েছিলাম। ওর সম্পর্কে তেমন কোনো খোঁজই নেইনি। নিলে হয়তো ওই পরিস্থিতিতে তোমায় পড়তে হতো না। সেদিন তোমার কথাগুলো শুনলে, নিজের সম্মানটাকে বড়ো করে না দেখলে, এসবের কিছুই ঘটত না বলো। আমারই দোষ, নিজেকে বুদ্ধিমান ভাবা লোকটা আমি আসলেই বড়ো বোকা!”

আমির হাত তুলে ছলছল চোখ মুছলেন। সেঁজুতির বুক মুচড়ে উঠে বাবার কান্না দেখে। কিছু বলতে চেয়েও ঠোঁট চেপে রাখে। মেয়ের দিক চাইলেন ভদ্রলোক। বড়ো নরম কণ্ঠে ডাকলেন, "আমার কাছে একটু আসবে?"

সেঁজুতির চিবুক তখন গলায়। দিঘল পল্লবে জলের ফোঁটা। আনত থেকেই বাবার কাছে গেল। বসল হাঁটু মুড়ে। আমির গভীর মমতায় হাত রাখলেন মাথায়। জিজ্ঞেস করলেন ধরা স্বরে, "সত্যিই আমার ওপর তোমার আর কোনো রাগ নেই তো?"

একটা ফুঁপিয়ে ওঠা কান্নার তোড় সেঁজুতির গলার কাছে আটকে রয়। ভেজা কণ্ঠে বলল, "না বাবা। তোমার ওপর রাগ করব সেই স্পর্ধা আমার আছে, বলো? যা ছিল সেটা শুধুই অভিমান। কিন্তু যেইমাত্র আমি তোমাকে দেখেছি সব বরফ গলে গেছে বিশ্বাস করো।"

CamScanner

বলতে বলতে বাবার উরুতে মাথা রাখে সেঁজুতি। আমির নিরন্তর হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। বাবার এমন আদর, এমন সান্নিধ্য মেয়েটা কোনোদিন পায়নি। জীবনে প্রথম পেয়ে কান্না পাচ্ছে শুধু। চোখমুখ আড়াল করতে মাথাটাকে বাবার কোলের ওপর মিশিয়ে নেয় সে।

সময় গড়ালে নীরবতা ভঙ্গ করলেন আমির। শুধালেন, "একটা কথা জিজ্ঞেস করব?"

সেঁজুতি আগ্রহ নিয়ে চাইল। ভদ্রলোক রয়ে সয়ে বললেন, "রুদ্রকে তোমার পছন্দ?"

অমনি বক্ষপট ধুক করে কাঁপুনি দেয় ওর। কুণ্ঠায় বেড়ে আসে হৃদযন্ত্রের গতি।

আমির নিজেই বললেন, "ছেলেটা তোমাকে বিয়ে করতে চায়, সেদিন সরাসরি আমাদের বাড়ি গিয়ে বলেছিল। যার অত বড়ো কোম্পানি আছে, সে তো সোনার চামচ মুখে দিয়ে জন্ম নিয়েছে। এমন ছেলে কি ভালো হবে? এদের চারিত্রিক দোষ থা..."

সেঁজুতি ধড়ফড় করে বলল, "না না বাবা। উনি অমন নন। একটু অহংকারী, তবে এসব দিক থেকে ভীষণ ভালো।"

বাবাকে হাসতে দেখে লজ্জায় চুপসে গেল মেয়েটা। উদ্‌দ্বিগ্ন কণ্ঠ মিনমিনে হলো সহসা, "না মানে তুমি ভুল ভাবছিলে, তাই আরকি।"

আমির ফোঁস করে শ্বাস ফেলে বললেন, "বুঝলাম। কিন্তু আমি আগেরবারের মতো কোনো ভুল করতে চাই না, মা। রুদ্রর ব্যাপার পুরোটাই আমি তোমার ওপর ছেড়ে দিলাম। নিজে এক পাও এগোব না, তুমি না চাইলে। তুমি এবার যা সিদ্ধান্ত নেবে, যা বলবে সেটাই করব। জীবন তোমার, সিদ্ধান্তও তো তোমারই হওয়া উচিত।"

সেঁজুতির শ্বাসের দশা জোরালো। হাঁসফাঁসে ভঙ্গিতেও চুপটি করে রইল।

ভদ্রলোক মৃদু হেসে বললেন, "রাত অনেক হলো, ঘুমাও গিয়ে।"

ভদ্র মেয়ের মতন উঠে গেল সেঁজুতি। আমির বুক ভরা স্বস্তি নিয়ে বিছানায় শুতে এলেন। ভেবেছিলেন মুনারা তন্দ্রায় বুঁদ। অথচ আলোটা নেভাতেই মুখ খুললেন তিনি, "বাবা-মেয়ের গল্প তাহলে শেষ হলো?"

CamScanner

আচমকা ব্যাপারটায় ভদ্রলোক চমকে উঠলেন এত। গোল গোল চোখ মেলে বললেন, "ঘুমাওনি এখনও?"

মুনারা শুধু হাসছেন। দুপাশে মাথা নাড়লেন ওভাবে।

আমির ভ্রু গোছালেন। এই মহিলা হাসছে কেন হঠাৎ? আচমকা মনে পড়ল একটু আগের কথা। সেঁজুতিকে বলছিলেন, তোমার মায়ের ভালো স্বামী হতে পারিনি। মানুষটা বিব্রত হয়ে পড়লেন। থতমত খেয়ে বললেন, "হেহে করে না হেসে ঘুমাও। অনেক ধকল গেছে না আজ?"

নিজেকে লুকোতে ওপাশ ফিরে শুয়ে পড়লেন ভদ্রলোক। পাশে শুয়ে থাকা রমণীকে কথা দিলেন মনে মনে, "তোমাকে আমি আর কখনও কষ্ট দেবো না, মুনারা। সেঁজুতির কথাকে মিথ্যে করে দিয়ে, যতদিন বেঁচে আছি? একজন ভালো স্বামী হয়ে দেখাব। দেখো তুমি!"

সেঁজুতি ঘরে ফিরে এলো। আরিশা, ইতি ঘুমে জবুথবু। ও চুপচাপ গিয়ে শুয়ে পড়ল পাশে। বুক ফুলিয়ে লম্বা শ্বাস টেনে চোখ বুজল তারপর। বিধিবাম। অক্ষিকূটে হানা দেয় দাপুটে সেই যুবক। তার পোক্ত চিবুকের ধার, তীক্ষ্ণ বাদামি চোখ আর মনকাড়া হাসিটায় আই-চাই করে উঠল সেঁজুতি। ঠোঁট উলটে বিড়বিড় করল, "আপনার ঘুমোতে না পারার শোধ বুঝি আমার ঘুম কেড়ে নিয়ে নিচ্ছেন?"

শুক্রবার।

ছুটির এই দিনেও বেলা করে ঘুমায় না রুদ্র। সবেমাত্র দীর্ঘ এক জগিং শেষে বাড়ি ফিরল সে। বসার ঘরে পেতে রাখা ডিভানে বসল ক্লান্তি কমানোর ছুতোয়। মালতি এসে কফি দিয়ে গেল তখন। রুদ্র টেবিলে রাখা পত্রিকা তুলে চোখের সামনে মেলল। দু-লাইনে নজর বোলানোর আগেই ফোন বাজল হঠাৎ। রুদ্র চোখ বোলায় স্ক্রিনে। সেভ করা নম্বরটি শুভ্র ললাটে ভাঁজের কারণ হয়। রিসিভ করে কানে গুঁজল সাথে সাথে।

"হ্যালো!"

ওপাশের লোকটি উৎকণ্ঠিত। নিমিষে আরো উতলা হয়ে বললেন, "স্যার, হ্যালো স্যার শুনছেন?"

"বলো!"

"খুব বড়ো সমস্যায় পড়েছি। শাহবাগের রেস্টুরেন্টে আসবেন একবার?"

CamScanner

রুদ্রর ঠান্ডা আওয়াজ, "কী হয়েছে?"

"স্যার, এখানে কতগুলো ছেলে চাঁদা নিয়ে ঝামেলা করছে। আমি তো সামাল দিতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছি। আপনি না এলে হচ্ছে না।"

শান্ত সকালে সহসা রুদ্রর মেজাজ বিগড়ে গেল।

"আসছি।"

বলেই লাইন কাটল সে।

সারাদিকের এত ঝামেলা। একটা দিন অন্তত নিঃশ্বাস ফেলার ফুরসত নেই। বেরিয়ে পড়ল তাড়াহুড়ো করে। ব্যস্ত রাস্তায় রুদ্রর ব্যস্ত গাড়ি ছুটছে। গাড়ির হুইল ঘোরাতে ঘোরাতেই হঠাৎ আনমনা হলো ছেলেটা। ভাবল গভীর মনোযোগ, "বিয়ের পর আমার এমন হুটহাট ছোটাছুটি সেঁজুতি মেনে নেবে তো।"

পরপর হেসে ফেলল নিজেই। মেয়েটার রাজি হওয়ার খবর নেই। আর ও কতদূর ভেবে ফেলছে! আদৌ সেঁজুতি তার হবে কি না তারই-বা কী নিশ্চয়তা? রুদ্র ভ্রু কুঁচকাল ফের। হবে না কেন? হতেই হবে। সেঁজুতি ওর না হলে কারোর না।

"আচ্ছা, সেঁজুতির কি তার জন্যে সত্যিই কোনো অনুভূতি নেই? যদি নাই থাকে তাহলে সেদিন ওভাবে চুমু দেওয়ার পরেও কিছু বলল না কেন? আগের মতো কেন রেগে যায়নি?

আমিরদের আজ ফিরে যাওয়ার কথা। স্কুল থেকে দুদিনের ছুটি নিলেও আরো একদিন বাড়তি থেকে গিয়েছিলেন। তাও মেয়ের জোরাজুরির তোপে। এদিকে সবাই মিলে সেঁজুতিকেও কাল থেকে জোরাজোরি করছে ফিরে যাওয়ার জন্যে। সব রাগ-অভিমান যখন মিটেই গেছে, শুধু শুধু চাকরি করার কী দরকার?

অথচ এটুকুতেই মেয়েটা আঁতকে উঠল। চাকরি ছাড়বে, নারায়নগঞ্জে ফিরে যাবে এসব যেন এখন চিন্তাও করা যায় না। সরাসরি তো আর বলতে পারল না, শুধু অজুহাত দেখাল অফিসের চুক্তিনামা নিয়ে। আমির আর রা করেননি। মেয়েটা এখানে ভালোই আছে। সারাজীবন তো কড়া শাসনে, হাতের মুঠোয় বন্দি রেখেছিলেন। এখন মুক্ত বাতাসে শ্বাস নিক একটু। রুদ্রর সাথে বিয়ের সম্বন্ধ এগোলে চাকরি তো এমনিতেই ছাড়তে হবে।

CamScanner

সকালের নাস্তা সাড়তে সাড়তে বেলা এগারটা গড়াল ওদের। মুনারা এঁটো বাসন ধুতে গেলেই টেনে সরিয়ে দিলো আরিশা। খুব রাগ দেখিয়ে বলল, "আন্টি, এসব আপনি ভুলেও ছোঁবেন না। এগুলো আমি ধোব।"

"ওমা, তুমি আবার রান্নাঘরে কেন এলে? আমি করে নিতাম।"

"না। আপনি আমার অতিথি না? রান্না করছেন, খাবার বাড়ছেন এই অনেক। এসব ধোয়াধুয়ির জন্য আমি আছি তো!"

মুনারা আপ্লুত হাসলেন। পিঠে হাত বুলিয়ে বললেন, "তুমি একেবারেই আমার সেঁজুতিটার মতো। এজন্যেই বোধ হয় দুটোতে এত মিলেমিশে থাকতে পারো।"

আরিশা মাথা নাঁচিয়ে বলল, "শুধু কি মিলেমিশে থাকছি? আমার তো আজকাল ওকে ছাড়া ঘুমও আসে না।"

বলেই ফিক করে হেসে উঠল মেয়েটা। মুনারাও হাসলেন। বললেন, "তুমি এত মিষ্টি, আরিশা। আমার কোনো ছেলে থাকলে একেবারে বউ বানিয়ে নিয়ে যেতাম তোমাকে।"

প্রাণবন্ত আরিশা লজ্জা পেল এবার। মিনসে কণ্ঠে বলল, "কী যে বলেন না, আন্টি।"

দুজনের কথার মাঝেই আচমকা কলিংবেল বাজল।

"আমি দেখছি।" বলে রান্নাঘর ছেড়ে গেল আরিশা। ছিটকিনি টেনে খুলতেই ওপাশের মানুষটি চমকে দিলো তাকে। ভীষণ বিস্ময়ে চোখ বড়ো বড়ো করে বলল, "তুমি! এখানে? কী ব্যাপার?"

অভ্রর ঠোঁটে চাপা হাসি। দুষ্টুমি করে বলল, "সমন্ধ পাকা করতে এলাম।"

মেয়েটা ভ্রু কোঁচকায়, "কীসের সমন্ধ?"

"বিয়ের!"

তব্দা খেল সে। একটু আগেই রান্নাঘরে মুনারা বিয়ের কথা তুললেন। এখন অভ্রও তাই। আশ্চর্য তো। বুঝতে না পেরে বলল, "আমার মাথায় তো কিছুই ঢুকছে না।"

CamScanner

অভ্র মিটিমিটি হাসছে। ভেতর থেকে তখন চ্যাঁচিয়ে উঠল সেঁজুতি। জানতে চাইল, "কে এলো, আরিশা?"

আরিশা উত্তর দেবে কী! সে ড্যাবড্যাব করে শুধু অভ্রকেই দেখছে। এই সম্পর্কের ক-মাসে ছেলেটা কখনও তার বাড়ির চৌকাঠেও আসেনি। আজকে হঠাৎ। বিভ্রমে হাবুডুবু খেতে থাকা মেয়েটার অচিরাৎ চোখ পড়ল অভ্রর পেছনে।

একজন অচেনা নারীর সাথে, ভীষণ চেনা লোকটি দাঁড়িয়ে আছেন। আরিশার বিস্ময় শৃঙ্গ ছাড়িয়ে গেল। অচেনা সেই নারী হাসলেন। বড়ো কোমল কণ্ঠে বললেন, "তুমিই তাহলে আরিশা?"

মেয়েটার চোখে প্রশ্ন। উত্তরে কোনোরকম মাথা নেড়ে অভ্রর দিক চাইল। সে শব্দহীন ঠোঁট নেড়ে বোঝাল, "মা।"

নেত্র ললাট ছুঁয়ে গেল আরিশার। মোমের মতো মুখটা সংকীর্ণ হলো অমনি। অভ্রটা এখন মা, মামা সব নিয়ে এসেছে কেন? সত্যিই কি বিয়ের কথা বলবে নাকি? হায় আল্লাহ। ও তো বাড়িতে এখনও কিছুই জানায়নি। আর আঙ্কেল-আন্টি, ওনারাই-বা কী ভাববেন। ইস রে!

রেহান মুখ খুললেন এতক্ষণে।

"আরিশা, আমাদের ভেতরে যেতে দেবে না বুঝি?"

ভদ্রলোকের কণ্ঠে রসিকতা। আরিশা হুঁশে এলো যেন। ত্রস্ত সরে দাঁড়াল দোর ছেড়ে। জিব কাটল মনে মনে। এই রে, বিস্ময়ের চোটে ধ্যান জ্ঞান সব খুইয়ে ফেলেছিল। বিনয়ী কণ্ঠে চটপট দুজনকেই সালাম দিল সে, "আসুন আঙ্কেল, আসুন আন্টি। ভেতরে আসুন।"

দরজা খুলতে গিয়ে উধাও হয়ে যাওয়া আরিশাকে বিরক্ত হয়ে খুঁজতে এলো সেঁজুতি। বসার ঘরে ঢুকতেই, থমকে গেল পা জোড়া। রেহান ঢুকছেন, সাথে অভ্র, অভ্রর মা সবাই আছে।

রেহানার মনোযোগ আরিশার দিকে। তার ছেলের পছন্দ করা মেয়ে। আহা কী কাটাকাটা চেহারার গঠন। এক দেখাতেই তো মনে ধরবে কারো। মেয়েটা তখন দরজার চওড়া কাঠে লেপটে গেছে। এত লজ্জা লাগছে হঠাৎ। আরিশার নিচু চিবুক উচুতে ধরলেন তিনি। মুগ্ধ হয়ে বললেন, "মাশাআল্লাহ! আমার ছেলের পছন্দ আছে কিন্তু।"

CamScanner

ও গুটিয়ে গেল আরো। আড়চোখের কোনা দিয়ে একপল দেখে নিল অভ্রকে। ছেলেটা লজ্জা পেয়েছে। মাথা চুলকে চাইছে এদিক-ওদিক।

অন্যদিকে শঙ্কায় কাঁপছে সেঁজুতি। তার মৃগনেত্রের চারপাশে আতঙ্ক কেবল। রুদ্রর বাবা আবার কেন এসেছে এখানে? সেদিনের সমস্ত কথা মেয়েটার মাথার ভেতর দপদপ করে উঠল। রেহানের সেই চাউনি, সেই হুমকি সব মনে করে থরথর করল শীর্ণ বুক। এখন তো বাসায় বাবা-মাও আছেন। আঙ্কেল যদি উলটো-পালটা কিছু বলে দেয়? অপমান করে? সর্বনাশ! সেঁজুতি শুকনো ঢোক গিলল। ভয়-ডরে রুদ্ধ হওয়া কণ্ঠে বাক্য ফোটাল টেনেটুনে, "আপপনারা?"

ব্যস, সকলের সব নিবেশন রকেট বেগে ঘুরে গেল ওর দিক। সব কটা চোখের চাউনি আছড়ে পড়ল একই সাথে। রেহান কেন এসেছেন সেই উত্তর দিলেন না। বরং প্রশ্ন করলেন পালটা, "শুনলাম তোমার বাবা মা এসছেন?"

সেঁজুতির চোয়াল ঝুলে যায়। এর মানে ও যা ভাবছিল তাই ঠিক? ইয়া আল্লাহ, কী করবে এখন? কী ভাবে সামলাবে সব? রুদ্রও যে নেই। উনি থাকলে ঠিক একটা ব্যবস্থা করতেন। ওনার বাবা যে কী বলতে পারেন না পারেন, সেঁজুতির আন্দাজ আছে। এসবের ছিটেফোঁটাও যদি তার বাবা মাকে বলে কী হবে। বাবা যে আর রুদ্রর দিক ফিরেও দেখবেন না।

সেঁজুতির হাঁটু কাঁপছে। রেহানা আরিশাকে ছেড়ে, কাছে এগিয়ে এলেন ওর। কণ্ঠে নম্রতা, "তোমার বাবা-মাকে একবার ডাকো, সেঁজুতি। একটু কথা ছিল আমাদের।"

আরিশা সমান বিভ্রান্ত। মেয়েটা নিজেও কিছু জানে না। সেঁজুতির সাথে মুখ চাওয়াচাওয়ি করল কিছুক্ষণ।

রেহান চৌধুরির আর দাঁড়িয়ে থাকার ধৈর্য হলো না। পেতে রাখা সিঙ্গেল সোফায় বসলেন হাত মেলে। কণ্ঠে গাম্ভীর্য এনে বললেন, "কী ব্যাপার? কতবার বললাম, ডাকো ওনাদের।"

সেঁজুতি তাও নড়ল না। হাঁসফাঁস করে একইরকম দাঁড়িয়ে রইল। ব্যাপারটা পছন্দ হলো না ওনার। খেই হারিয়ে বললেন, "আচ্ছা বেশ, আমিই ডাকছি।"

রেহান ডাকতে নিলেন, এর আগেই হাজির হলেন আমির উদ্দীন। সাথে মুনারা, ইতিও আছে। সেঁজুতির হৃৎপিণ্ড সচল নেই। ডান-বাম করছে ভয়ে।

আমিরকে দেখেই উঠে দাঁড়ালেন রেহান। এগিয়ে এসে মুখোমুখি দাঁড়াতেই ভাঁজ পড়ল ভদ্রলোকের কপালে। একবার মেয়েকে দেখলেন প্রশ্ন নিয়ে। মুনারা তৎপর ঘোমটা টেনেছেন মাথায়।

CamScanner

"আপনিই আমির উদ্দিন সাহেব? মানে সেঁজুতির বাবা?"

সাথে হাতটা বাড়িয়ে দিলেন তিনি। সব প্রশ্ন মিটিয়ে দিতে জানালেন, "আমি রেহান রওশন চৌধুরী। রুদ্রর বাবা। চেনেন নিশ্চয়ই আমার ছেলেকে?"

আমিরের চেহারা টানটান হলো অচিরে। চকচকে হেসে বললেন, "ওহ আচ্ছা আচ্ছা, আপনি রুদ্রর বাবা। দাঁড়িয়ে কেন বসুন।"

আরিশার ব্যাচেলর ফ্ল্যাটে সোফাসেট নেই। কোনোরকম একটা টু সিটের কিনে রেখেছিল। আর পড়ার জন্য দু চারটে প্লাস্টিকের চেয়ার আছে হয়তো। সে চটজলদি ঘরের ভেতর ঢুকে সব জায়গা থেকে চেয়ার কুড়িয়ে আনল। যা পেয়েছে তাতে অন্তত বসতে পারবে বড়োরা। রেহান সোফাতেই বসলেন। বোনকে দেখিয়ে বললেন, "ইনি আমার বোন রেহানা হক। আর ও অভ্র, আমার বোনের ছেলে।"

ভদ্রলোকের ঠোঁট ভরতি গদগদ হাসি। সেঁজুতি আশঙ্কা ভুলে আশ্চর্য বনে রইল। চোখেমুখে অবিশ্বাস নিয়ে তাকিয়ে থাকল একভাবে।

ওনারা একে-অপরের সাথে আলাপ সারলেন। ব্যস্ত হলেন গল্পে। শুধু সেঁজুতির এই হাঁ করে চেয়ে থাকা গেল না। সেদিনকার সেই রেহান চৌধুরীর সাথে আজকের লোকটাকে গুলিয়ে ফেলছে সে। ঠিক যেমন হয়েছিল রুদ্রর ফ্ল্যাটে? এ যেন তারই পুনরাবৃত্তি।

আরিশা অভ্রকেও চেয়ার এগিয়ে দিলো। কন্ঠে ভারি লজ্জা নিয়ে বলল, "বসো।"

ও বসল না। বরং ঘুরে গিয়ে গা ঘেঁষে দাঁড়াল তার। মেয়েটার বুক ধুকপুক করে। বড়োদের দেখে নেয় বড়ো বড়ো চোখে। চাপা কন্ঠে বলে, "কী কোরছ? সবাই আছে তো!"

অভ্রর ফিসফিসে স্বর, "তো থাকুক না। শুধু তো পাশে এসে দাঁড়িয়েছি, চুমু খেয়ে ফেলিনি।"

আরিশা থতমত খেল। এমনি সময়েও ছেলেটা এসব উদ্ভট কথা শোনায় ওকে। এখন মা, মামা এদের সামনেও? ছিঃ লজ্জা নেই। অবশ্য হবে কী করে? যার বড়ো ভাই নিজে গিয়ে মেয়ের বাড়িতে বলে আসে বিয়ের কথা। তার ছোটো ভাই তো এমনই হবে।

অভ্র কাঁধ দিয়ে ধাক্কা দিলো তখন। বলল টেনে টেনে, "অ্যাই চলো না ছাদে যাই।"

CamScanner

আরিশা চোখ তুলল না। ওভাবেই ভ্রু কুঁচকে বলল, "এই দুপুরবেলা ছাদে যাব কী করতে? বাইরে এত রোদ, মাথা ফেটে যাবে না?"

"আহা, খোলা ছাদে যাব না। ছাউনীতে দাঁড়াব।"

"কী কাজ ওখানে?"

"এখানে কী কাজ? এখন বড়োরা নিজেদের কথা বলবে, আমরা থেকে কী করব?"

আরিশা বলল, "তোমার মামা কী বলতে এসেছেন শুনব না? এখন না থাকলে সব মিস হয়ে যাবে, অভ্র। কথা না বলে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকো প্লিজ!"

মৃদু ধমকটায় অভ্র মুখ কালো করে। দাঁড়িয়ে থাকে বাধ্যের ন্যায়।

ওদিকে মুনারা রান্নাঘরে ছুটেছেন নাস্তার ব্যবস্থা করতে। ইতি তখন সবাইকে মাড়িয়ে সেঁজুতির কাছে এলো। ছোটো ছোটো চোখদুটো বড়ো করে শুধাল, "ওনারা কেন এসেছে, আপু? তোমাকে কি নিয়ে যাবে এখন?"

সেঁজুতি চোখ পাকাল। আস্তে করে ধমকাল, "চুপ থাক।"

অথচ সে নিজেও জানে না কিছু। খোশগল্প শেষে রেহানই প্রসঙ্গ তুললেন। শুকনো গলায় খাকারি দিয়ে বললেন, "আসলে আমির সাহেব, আমরা একটা বিশেষ দরকারে এখানে এসেছিলাম। যদি রাজি থাকেন, তবে বলতাম আরকি!”

অমনি মেরুদণ্ড টানটান করে ফেলল সেঁজুতি। এই তো, এতক্ষণে আসল কথা বের হবে।

আমির বললেন, "জি নিশ্চয়ই। বলুন না!"

"না মানে, আমি ঠিক জানি না আপনি আমার ছেলের সম্পর্কে কতটুকু কী জানেন। কতটা কী চেনেন ওকে। তবে বাবা হিসেবে বলছি না, আমার ছেলের মতো ছেলে সত্যিই লাখে একটা পাওয়া যায়। কোনো দিক থেকেই কোনও কমতি নেই তার। আমার সেই ছেলের পছন্দ হয়েছে সেঁজুতিকে। রুদ্র ওকে ছাড়া একটা মুহূর্ত ভাবতে পারে না এখন। সত্যি বলতে, আমি কিন্তু প্রথমে চাইনি এই সম্পর্ক মেনে নিতে। যথেষ্ট বাধা দিয়েছিলাম। কিন্তু ছেলেটা বড্ড জেদি। আর সেই জেদ, সন্তানের প্রতি ভালোবাসা সবকিছুর কাছে হার মেনে শেষমেশ চলে এলাম এখানে। ভাবলাম, ছেলেটা যদি কাউকে নিয়ে সুখে থাকতে চায়, থাকুক। আমি দুনিয়ায় আছিই-বা

কদিন। তাই যখনই অভ্রর থেকে যখন শুনলাম আপনারা ঢাকায় এসছেন। আমি এক মুহূর্ত দেরি করিনি। পরিবার নিয়ে ছুটে এসেছি দেখুন। এক কথায় বলতে পারেন, আপনার মেয়ের হাত চাইতে এসেছি। আমার পাগল ছেলেটার পথ্য হিসেবে আপনার মেয়েটাকে আমার প্রয়োজন, আমির সাহেব। যদি আপনাদের কোনো আপত্তি না থাকে, খুব তাড়াতাড়ি ওদের চার হাত এক করতে চাই আমি। না করবেন না, অনুরোধ।"

রেহানের কথায় ভণিতা নেই। এক নাগাড়ে সবটা গড়গড় করে বলে দম নিলেন একটু। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ল সেঁজুতি। লোকটা নিজে এসেছে বিয়ের প্রস্তাব দিতে? এমন কিছু তো ও কল্পনাও করেনি।

মুনারা চা-নাস্তা নিয়ে হাজির হলেন মাঝে। সবার হাতে হাতে কাপ দিয়ে স্বামীর পাশে বসলেন আবার। রেহানা মুচকি হেসে চুমুক দিলেন চায়ে। বুকটা স্বস্তির শ্বাসে ওঠানামা করল। যাক। ভাইজানকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছেন, এই অনেক।

কিন্তু অস্বস্তিতে পড়ে গেলেন আমির। মেয়েটাতো সেদিন হ্যাঁ-না কিছুই খোলাসা করে বলল না। এখন কী উত্তর দেবেন ওনাকে? একটু সময় নিয়ে বললেন, "আপনি আমাকে ভারি লজ্জায় ফেলে দিলেন, রেহান ভাই। আমি যে কী বলব এখন, কিছুই বুঝতে পারছি না। আসলে এই পুরো ব্যাপারটা আমি আমার মেয়ের ওপর ছেড়ে দিয়েছি। ও যদি রাজি থাকে, আমাদের কোনো আপত্তি নেই। আমার মেয়ে যা বলবে আমার সিদ্ধান্তও তাই।”

স্বামীর কথায় বুক ভরে গেল মুনারার। সত্যি কত বদলে গেছে মানুষটা।

ফোঁস করে দম ঝাড়লেন রেহান। ঘাড় ঘুরিয়ে ঠায় দাঁড়ানো সেঁজুতির দিক চাইলেন। জড়ের মতো চেয়ে থাকা মেয়েটা জড়সড়ো হলো। শশব্যস্ত নামিয়ে নিল চাউনি। রেহান উঠে ওর কাছেই এলেন। আরো দুইগুণ বেশি আড়ষ্ট হয়ে পড়ল সেঁজুতি। রেহানের জুতো জোড়ার নৈকট্যে থামা দেখে বৃহৎ হয় তা। এলোমেলো পাতা ফেলে চোখের।

হঠাৎই মাথায় হাত রাখলেন ভদ্রলোক। থমকে, চমকে মুখ তুলল সেঁজুতি। রেহানের চোখ শান্ত। যেন রাগ কী জানেনই না। সবরকম নম্রতা, কোমলতা গলায় এনে বললেন, "তুমি নিশ্চয়ই আমার ওপর ভীষণ রাগে আছ। অবশ্য থাকারই কথা। আমি জানি, তোমার সাথে আমি অন্যায় করেছি। খারাপ খারাপ কথাও শুনিয়েছি অনেক। এসবের জন্যে না হয়, সময়-সুযোগ বুঝে এই বুড়ো লোকটাকে একটা শাস্তি দিয়ো, মা। কিন্তু এর শোধ আমার ছেলের থেকে তুলো না, সেঁজুতি। ওর মেজাজ যেমন ভয়ংকর? ওর ভালোবাসা তার থেকেও আরো বেশি ভয়ংকর। আমি নিশ্চিত, এতদিনে এই কথার প্রমাণ তুমিও পেয়েছ। তোমার মন কী বলে সেঁজুতি, এমন প্রখর প্রণয় আদৌ ফিরিয়ে দেওয়া উচিত?"

CamScanner

সেঁজুতি নিশ্চুপ। উত্তর না দিয়ে মাথা নুইয়ে রাখল। ভদ্রলোক দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগলেন। শুধোলেন রয়েসয়ে, "বিয়েতে তোমার মত আছে?"

সেঁজুতি চোখের কোনা দিয়ে আরিশার দিক চাইল। মেয়েটা চোখ রাঙাল অমনি। শাসাল নীরবে, "হ্যাঁ বল।"

ওপাশ থেকে রেহানাও জিজ্ঞেস করলেন, "বলো মা, কী চাও তুমি? তোমার কি বিয়েতে মত নেই?"

রেহান উদগ্রীব চোখে চেয়ে। খুব করে চাইছেন সেঁজুতি হ্যাঁ বলুক। মেয়েটা 'না' বললে যে রুদ্রর খুশি হারিয়ে যাবে। এর জন্যে হয়ত দিনশেষে ওনাকেই দায়ী করবে। বহু আগেই তো মায়ের জন্যে একগুচ্ছ দায়ভার কাঁধে দিয়ে গেল। নতুন করে ভালোবাসা হারানোর দোষ বইবার শক্তি তাঁর নেই।

সেঁজুতির জবাব এলো সময় নিয়ে। চিবুক গলদেশে ঠেকিয়ে মিহি কন্ঠে জানাল, "রাজি"

"প্রিয়জন রেস্তোরা"

রংবেরঙের শব্দে লেখাগুলো সাইনবোর্ড আকারে মাথার ওপর ঝুলছে। কাচের দোর ঠেলে সেখান থেকে মাত্রই বের হলো রুদ্র। সাথে বেরিয়ে এলেন পুলিশের আরো দুজন কর্মকর্তা। ।। তার পেছনে কনস্টেবল। যাদের শক্ত ভাতের মুঠোয় বন্দি হয়েছে দুটো বখাটে ছেলে।

একটার নাক ফেটে রক্ত পড়ছে, অন্যটার কপালে কেটেছে কয়েক জায়গায়। সবই রুদ্রর মারের ফল। এরাই চাঁদাবাজি করতে এসেছিল এখানে। না দিতে চাইলে ভাঙচুর করেছে কিছু।

রুদ্র পুলিশ অফিসারদের সাথে হ্যান্ডশেক করে ধন্যবাদ জানাল। ছেলে ফুটোকে সাথে নিয়ে ওনারা উঠে গেলেন জিপে।

রুদ্র চোখ তুলে একবার জ্বলন্ত সূর্যটাকে দেখে নেয়। এত রোদ। তাও পড়িতে না বসে দরজায় শরীর ঠেসে দাঁড়াল সে। লাইটার দিয়ে সিগারেট ধরাল। টান বসাতে গিয়েও, থমকাল হঠাৎ।
মনে পড়ল সেই বাসে চড়ার
ঘটনা। তার গা থেকে সিগারেটের গন্ধ পেয়ে কেমন নাক-মুখ ঢেকে বসেছিল সেঁজুতি।
সিগারেটের গন্ধ সহ্য হয় না বলে। অথচ সারাদিনে অসংখ্য সিগারেটের জ্বলন্ত মাথা রুদ্রর পোড়া

ঠোঁটের সঙ্গী হয়। রুদ্র আনমনে হাসল। ভাবল, "যেদিন আপনার ঠোঁটে আমার অধিকার হবে, সেঁজুতি? সেদিন এই সিগারেট ছাড়ব আমি।"

এদিকে বিয়ের দিন-তারিখ ধার্য করতে লেগে পড়েছে সবাই। বেলা গড়িয়ে দুপুর প্রায়। রেহানদের তো না খাইয়ে ছাড়া যাবে না। আমির বসেছেন গল্পে। আরিশার বাসায় একেবারেই নতুন ফ্রিজ। পটাপট কয়েকটা শো করে ভালো টাকা জমিয়ে নিয়েছিল এটা। মাছ-মাংস যা ছিল সব নামিয়ে দেয় সে। মুনারার সাথে হাত লাগিয়ে লেগে পড়ে কাজে। ইতিও থেমে নেই। সেও যতটা পারছে করে দিচ্ছে। আয়োজনে আয়োজনে মাঝ দুপুরটা বেশ জমে উঠল। শুধু পুতুল বনে বসে আছে সেঁজুতি। তাকে রেহানা হক হাতের মুঠোয় ধরে রেখেছেন। উঠতেই দিচ্ছেন না পাশ থেকে।

আমিরের সাথে রেহানের কথা শেষ হওয়ার নাম নেই। কত রাজ্যের গায় দুজনের। যত আলাপ বাড়ছে, ভদ্রলোকের ওপর মুগ্ধ হচ্ছেন রেহান। স্কুল উচার শুনে যেভাবে নাক সিটকেছিলেন তিনি, আমির সেসবের বহু উর্ধ্বে। কী চমৎকার বাচনভঙ্গি লোকটার। কথা খুব গুছিয়ে বলেন। অবশ্য কার শ্বশুর দেখতে হবে না?

রুদ্রটাও তো কাঁটায় কাঁটায় এমন। ভালোই হলো, দুই জামাই-শ্বশুরে দারুণ জমবে। একা একা ভেবে হাসলেন রেহান। পরপরই ভয় জাগল মনে।

এই যে তিনি সেঁজুতির বাড়িতে এসেছেন, রুদ্র এসবের কিচ্ছু জানে না। যখন জানবে, বাবা ওর সেঁজুতিকে চাইতে এসেছিল ওর জন্যে-খুশি হবে তো ছেলেটা? সব রাগ ভুলে আবার ফিরবে তো বাড়িতে?

অভ্রর চাউনি উশখুশে। কিছুটা মন খারাপ বলা যায়। যার বাসায় যার উদ্দেশ্যে সব কাজ ফেলে এলো এখানে, সেই ওকে পাত্তা দিচ্ছে না। দেখো, কী ব্যস্ত সে। একদণ্ড ওর দিকে তাকানোরও সময় নেই।

ছেলেটা গাল ফুলিয়ে রাখল। আরিশা এর মাঝেই ওড়নায় হাত মুছতে মুছতে হাজির হয়। পীবর ঠোঁট ভরতি হাসি।

রেহানা সেঁজুতির সাথে কথা বলছিলেন। ওখানেই গিয়ে দাঁড়াল সে। ফোড়ন কাটল কথার ভেতর, "কী বলছ তোমরা? আমিও একটু শুনি।"

রেহানা কেমন করে চাইলেন। গম্ভীর মুখে বললেন, "তুমি আবার কী শুনবে?"

CamScanner

আরিশা থতমত খেল। মিনমিন করে বলল, "না মানে.."

"এত মানে মানে করতে হবে না। যত তাড়াতাড়ি পারো বাবা-মাকে খবর দাও। বলো যে তাঁদের মেয়েকে অতি সত্বর বাড়ির বউ করতে চাই আমি।"

আরিশা মুখটা চুপসে রেখেই মাথা নাড়ল। সেঁজুতি ফিক করে হেসে উঠল তখন। অমনি সতর্ক চোখে চাইল সে। ভদ্রমহিলা কী বলেছেন হুঁশ পেতেই লজ্জায় নুইয়ে এলো শত হাত।

রেহানা ঠোঁট চেপে হাসছেন। আরিশা কুণ্ঠায় আইঢাই করে ওঠে। দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না, চপল পায়ে চলে যায় আবার।

অভ্র তা দেখে ফের মন খারাপ করল। এলো একটু, তাও কথা না বলে চলে গেল? হুহ!

সবকিছুর মধ্য থেকে আলগোছে উঠে এলো সেঁজুতি। তার ভেতরটায় দামামা বাজছে অনুভূতির। ভূপৃষ্ঠ কাঁপানো ভূমিকম্প যেন ঘাঁটি গেড়েছে বুকে। মেয়েটার গলায় একটা মোটা স্বর্ণের চেইন ঝুলছে। রেহানা আটঘাট বেঁধেই এসেছিলেন। বিয়ের কথা পাকাপাকি হতেই একেবারে ব্যাগ থেকে চেইন বার করে পরিয়ে দিয়েছেন ওকে।

সেঁজুতি বিছানার ওপর থেকে ফোন হাতে তুলল। দুরুদুরু বক্ষে কল দিলো রুদ্রকে। উনি তো জানেন না ওনার বাবা এসেছেন এখানে। জানলে নিজেও সাথে আসতেন। সেঁজুতির মাথায় একটা দুষ্টু বুদ্ধি এলো।

কোনো একটা দরকারের কথা বলে রুদ্রকে ডেকে পাঠালে কেমন হয়?

লোকটা আসবেন, আর এলেই নিজের পরিবারকে এখানে দেখে চমকে যাবে ভীষণ। তারপর যখন শুনবে, বিয়েতে সেঁজুতি রাজি। কী করবে তখন? বোকার মতো হাঁ করে চেয়ে থাকবে? ওইদিন তার খুশি হওয়াটুকু যেমন আরিশাকে ভিডিয়ো করতে বলা হয়েছিল? আজ সেই চমকে যাওয়া সেঁজুতি নিজে ভিডিয়ো করবে।

তারপর লোকটার কোটর ভরা অবিশ্বাসের দিক চেয়ে স্বীকারোক্তি দেবে, "শেষমেশ আপনার ভালোবাসার কাছে মাথা নোয়াতে বাধ্য হলাম, কন্দ্র। চিরতরে সিদ্ধান্ত নিলাম আপনার হয়ে যাব। এবার খুশি তো আপনি?"

CamScanner

মাথা নুইয়ে লাজুক হাসল সেঁজুতি। রিং হচ্ছে তখনও। রুদ্র ড্রাইভ করছিল। সামনেই ফোন রাখা। স্ক্রিনে সেঁজুতি লেখা দেখেই শশব্যস্ত রিসিভ করল সে। বলল ভীষণ স্বাভাবিক গলায়, "হ্যাঁ সেঁজুতি, বলুন!"

সেঁজুতি চোখ বুজে নেয় আবেশে। বুক ভরে লম্বা শ্বাস টানে। জিজ্ঞেস করে মিহি স্বরে, "কোথায় আপনি?"

"বাসায় ফিরছি। কেন?"

"ব্যস্ত?"

রুদ্র ভ্রু কুঁচকাল, "কেন? কিছু দরকার?"

"দরকার ছাড়া বুঝি আপনাকে ফোন করা যাবে না?"

ছেলেটা দীর্ঘ হেসে বলল, "যাবে না কেন? যার হৃদয়ের প্রত্যেকটি প্রকোষ্ঠ জুড়ে আপনি, যার দেহের প্রতিটি শিরায় ছড়িয়ে আপনি তাকে ফোন করা এমন কী?"

সেঁজুতির কন্ঠরোধ হয়ে আসছে। অনুভূতির তাণ্ডবে জমে যাচ্ছে শরীর। ইচ্ছে করছে এক্ষুনি বলে দিতে, আমাদের বিয়ে ঠিক হয়েছে, রুদ্র। হাঁ করেও ঠোঁট টিপে নিল সে। তবে যে ওনার চমকে যাওয়া মুখটা মিস হয়ে যাবে।

সেঁজুতি মুচকি হাসল। গুরুতর হওয়ার চেষ্টা করে বলল, "এসব শুনতে আপনাকে ফোন করিনি। আপাতত গাড়ি ঘুরিয়ে আমাদের বাসায় আসুন।"

রুদ্রর কপালে ভাঁজ পড়ল, "কিছু হয়েছে?"

ছেলেটার এক হাত হুইলে ব্যস্ত রইলেও, পূর্ণ মনযোগ ফোনে। চেয়ে থেকেও খেয়াল করেনি সামনে। বিশালদেহী হলদে ট্রাক কেমন ঝড়ের বেগে ধেয়ে আসছে তার দিক। রুদ্রর টনক নড়ল যখন, তখন অনেক দেরি। ট্রাক থেকে গাড়ির দূরত্ব ইঞ্চিখানেকও নেই। দানবাকৃতির বাহন দেখেই ছেলেটার শুভ্র আদল ফ্যাকাশে হয়ে যায়। হন্তদন্ত হাতে ঘোরাতে চায় গাড়ি।

সেঁজুতি ওপাশ থেকে বলতে নিল, "আপনার জন্যে একটা সারপ্রাই....

CamScanner

আচমকা এক বিকট শব্দে কথা আটকে গেল ওর। কিছু দুমড়ে মুচড়ে যাচ্ছে, পিষ্ট হচ্ছে যেন। ফোনের লাইনটাও খট করে কেটে গেল তারপর। সেঁজুতির মস্তিষ্ক রুদ্ধ হয়ে যায়। সচল দেহ জমে বরফ খণ্ড বনে। কীসের আওয়াজ এসব? উনি ঠিক আছেন তো?

সেঁজুতির হৃৎপিণ্ড ছলাৎ ছলাৎ করছে। কম্পিত ব্যস্ত হাতে কল লাগাল আবার। বন্ধ। বারবার বন্ধ।

মাথাটা ভরে উঠছে নানা বিশ্রী ভাবনায়। ভয়ে আতঙ্কে মেয়েটা ঢোক গিলছে শুধু। মাথা ঘুরছে। কাঁপছে গোটা শরীর। দিগ্বিদিক ভুলে সে ছুটে এ ঘরে আসে। অশান্ত, অস্থির চোখমুখ দেখেই থমকে যায় সবাই। আনন্দে রমরমে পরিবেশটা মুহূর্তে থিতু হয়ে পড়ল। সেঁজুতি হাউমাউ করে কাঁদছে। উপস্থিত সবাই ভরকে গেল এতে।

সেঁজুতি ফ্যাসফ্যাসে গলায় বলল, "ওনার কী যেন হয়েছে। উনি ঠিক নেই। আঙ্কেল, আঙ্কেল ওনার খোঁজ নিন। ওনার কিছু হলে আমার কী হবে?"

সেই প্রথম থেকে অসহ্য লাগা মানুষটাকে নিয়ে জিভ থেকে আপনা- আপনি বেরিয়ে এলো এই কথা। মেয়েটা নিজেও হয়তো খেয়াল করেনি। বহু কষ্টে শ্বাস ফেলার আগেই মাথা ঘুরে পড়ে গেল ফ্লোরে।

৩০.
একা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল।

আই-সি-ইউর শুভ্রকায় বেডে লম্বালম্বি শুয়ে আছে রুদ্র। শরীরের বেশিরভাগ অংশ ধবধবে সাদা ব্যান্ডেজের আড়ালে। দুর্ঘটনায় মাথা থেকে এক করে জখম হয়েছে শরীরের সিংহভাগ জায়গা। চেতনাশূন্য মানুষটিকে দেখে বুক দুমড়ে-মুচড়ে গেল সেঁজুতির। টলমলে চক্ষু হতে উপচে পড়ল জল। ঠোঁট দুটো চেপে ধরল কান্না থামানোর প্রয়াসে। পারল না। ওরা বেরিয়েই আসে কণ্ঠফুঁড়ে। ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল সেঁজুতি।

সেই বিকেল থেকে খুঁজতে খুঁজতে রুদ্রকে এই হাসপাতালে পাওয়া গেছে। রেহান আর অভ্র এক মুহূর্ত বিশ্রাম নেয়নি। দুজন মিলে উন্মাদের মতন খুঁজে বেড়িয়েছে ওকে। সাথে হাজারটা ফোনকলের চেষ্টা তো ছিলই। কোথাও কোনও আশার আলো যখন নেই, সে মুহূর্তে রেহানের ফোনেই কল এলো। হাসপাতাল থেকে জানাল, রুদ্রর অ্যাক্সিডেন্টের কথা। একটা বড়ো ট্রাকের সঙ্গে ধাক্কা লাগে তার কালো গাড়ির।

CamScanner

মাঝরাস্তায় উলটে যায় রীতিমতো। ট্রাকের চাকার তলায় দলিতমথিত হয়ে পিষে যায় বাহন। পথচারী যারাই এই দুর্ঘটনা চাক্ষুষ দেখেছিলেন, প্রত্যেকে ভেবেছেন ভেতরের মানুষটা শেষ। এমন শক্তপোক্ত ট্রাকের নিচে গাড়ি পিষে গেলে বাঁচার আশা থাকে? কিন্তু কথায় বলে না, রাখে আল্লাহ মারে কে?

রুদ্র যখন দেখেছে মৃত্যু ধেয়ে আসছে? বাঁচার উপায় নেই, এক মুহূর্ত না থেমে চলন্ত গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়েছিল। পিচঢালা পাকা রাস্তায় ছিটকে পড়ায় মাথার পেছনে জোরালো আঘাত লেগেছে। গোড়ালির হাড় নড়েছে, ফিমার নড়বড়ে। সময় মতো হাসপাতালে না আনা হলে হয়তো রক্ষে হতো না এ যাত্রায়। রক্তক্ষরণ তো কম হয়নি!

সেঁজুতি কাতর চোখ মেলে চেয়ে রয়। সুঠামদেহী যুবকের এই নেতিয়ে থাকা সে নিতে পারছে না। এর চেয়ে ভালো ধমকাত, বকত-সেই প্রথম দিন গুলোর মতো কর্কশ কথা শোনাত। ওপর ওপর মেয়েটা নিষ্প্রভ দাঁড়িয়ে রইলেও, ভেতরটা চিৎকার করে বলল, "উঠুন না, রুদ্র। একবার উঠুন। আমাকে অপমান করুন। প্রতিশোধ নিন। যা ইচ্ছে তাই বলুন। তাও উঠুন।"

রেহানা হা-হুতাশ করে কাঁদছেন। চৌধুরী পায়চারি করছেন সমানে। বাকি সবার মধ্যে এক ফালি নীরবতা। রুদ্রর চিকিৎসা শেষ হয়েছে আরো আগে। সবাই আসতে আসতে রক্ত দেওয়ার পালাও শেষ। তবে জান ফেরেনি এখনও। চিকিৎসক জানিয়েছেন, অবস্থা ভালো নয়। এক্ষুনি কিছু বলা যাচ্ছে না। আগামী চব্বিশ ঘন্টায় জ্ঞান ফিরতেও পারে, নাও পারে। এই খবর যেন একটু আগের হাসিখুশি মানুষগুলোর মধ্যে আরো বিষাদের ছায়া ঢেলে দেয়।

এসেছিল রাত আটটায়, অথচ এখন ঘড়িতে দুটো বাজে। নির্ঘুম মানুষগুলো অপেক্ষায়, রুদ্র চোখ মেলে একবার দেখবে তাদের। কিন্তু সময় এগোলেও, অপেক্ষা ফুরাবার অন্ত নেই।

শেষমেশ অভ্র, আমির সবাইকে বুঝিয়ে শুনিয়ে বাড়ি ফেরার সিদ্ধান্ত নিল। মুনারা মেয়ের কাছে এগিয়ে আসেন। টানা ক-ঘন্টা এখানেই দাঁড়িয়ে সেঁজুতি। আইসিইউ-এর যে ছোট্ট জানলা থেকে রুদ্রর মুখটা দেখা যাচ্ছে, সেখানেই খুঁটি গেড়েছে পায়ের। মুনারা কাঁধে হাত রেখে বললেন, "সেঁজুতি, এখন বাড়ি চল, মা। কাল আবার আসব।"

ও ফিরল না। নড়লও না একটু। শুধু আস্তে করে জানাল, "আমি এখানেই থাকব।"

"এখানে কীভাবে থাকবি? এখন তো রুদ্রর কাছে কাউকে যেতে দেবে না।"

ওপাশ হতে রেহানও সায় মেলালেন, "এভাবে কেন কষ্ট করবে, মা? ওর জ্ঞান তো ফিরবে না আজ। কবে ফিরবে তাও..."

CamScanner

বলতে বলতে ফোঁস করে শ্বাস ফেললেন তিনি। সেঁজুতি অসহায় চোখে চাইল, "একটু থাকি না, আঙ্কেল।"

রেহান আর কিছু বলতে পারলেন না।। ইতি ঘুমে টলছে। রেহানাকে আগলে বসে আছে আরিশা।

এতক্ষণে মুখ খুলল সে, জানাল, "আপনারা যান আঙ্কেল, আমি আছি ওর সাথে।"

বড়োরা মাথা নাড়লেন। কাঁদতে কাঁদতে কাহিল রেহানাকে ধরে ধরে পা বাড়ালেন মুনারা। অনিচ্ছায় চলে গেলেন রেহানও। যেতে যেতে বারবার ফিরলেন পেছনে। ছেলেটাকে ফেলে যেতে একটুও ইচ্ছে করছে না। কিন্তু করিডোরে এত মানুষ যে একইসাথে এলাউ করবে না।

শুধু রয়ে গেল অভ্র। ওকে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আরিশা বলল, "যাবে না?"

ছেলেটার মুখ কালো। মাথা নেড়ে বলল, "না। ভাইয়ের জ্ঞান ফিরবে তারপর।"

মেয়েটা কিছু অবাক হয়। ভালোও লাগে সাথে। অভ্র সত্যিই চমৎকার একটা ছেলে। ফুফাতো ভাইকে একেবারেই নিজের মতো ভালোবাসে। এরকম একটা মানুষ ওর জীবনে আসায় ও সত্যিই ধন্য।

রাতের শেষ প্রহর। তন্দ্রিত অভ্রর কাঁধে মাথা রেখে একটা সময় ঘুমিয়ে গেল আরিশাও। শুধু ঘুম নেই সেঁজুতির চোখে। পাথরের মতো বসে মেয়েটা নড়ে উঠল আজানের সুর শুনে। আলগোছে উঠে দাঁড়াল হঠাৎ। নরম পায়ে এসে দাঁড়াল আইসিইউ-এর সামনে। এদিক-ওদিক দেখে খুব সতর্কতায় ঢুকল ভেতরে।

রুদ্রর মুখে অক্সিজেন মাস্ক পরানো। ক্যানোলা লাগিয়েছে বাম হাতে। সাথে ব্যান্ডেজে মোড়া গোটা মানুষটাকে দেখে বুক মুচড়ে উঠল সেঁজুতির। গলবিলে দলা পাকাল কান্নার স্রোত।

আস্তেধীরে রুদ্রর মাথার কাছে গিয়ে বসল সে। দায়িত্বে থাকা নার্স মেয়েটি সোফায় গভীর ঘুমে তলিয়ে। সেঁজুতি রুদ্রর ঘন চুলে নিবিড় হাত বোলায়। ঠোঁট নামিয়ে চুমু আঁকে কপালের ব্যান্ডেজে। ফোনে শোনা ওসব শব্দগুলো এখনও স্পষ্ট মনে আছে তার। প্রতিবার ভাবলেই শরীর হিম হয়ে আসছে। সেখানে মানুষটার না জানি কত কষ্ট, কত যন্ত্রণা হয়েছিল।

সেঁজুতির চোখের জল গাল বেয়ে গলা অবধি এলো। পরেরটুকু টুপ করে ঝরে পড়ল রুদ্রর বন্ধ চোখের পাতায়। একটু নড়ল চোখটা। অমনি তীরস্থ হয়ে চাইল সে। মনের মধ্যে জ্বলে উঠল

CamScanner

একটুখানি আশা। এই বুঝি চোখ মেলে তাকাবে রুদ্র! হলো না। রুদ্রর নড়চড়হীন দেহটা একভাবে লেপটে রইল বেডে।

মর্মের ন্যায় আহত সেঁজুতির বুক ভেঙে আসে দুঃখে। ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল এবার। বলল প্রলাপের ন্যায়, "এই রুদ্র, উঠুন না। একবার তাকান না আমার দিকে। আপনাকে যে আমার অনেক কথা বলার আছে। শুনবেন না সেসব? যা শোনার জন্যে এত্তগুলো দিন অপেক্ষা করলেন, আপনার সেঁজুতির সেই মনের কথা শুনবেন না, রুদ্র?

আগে যখন আমার দিকে আপনি মুগ্ধ হয়ে তাকাতেন? আমার খুব অস্বস্তি লাগত, রাগ হতো জানেন। কিন্তু আজ আপনার সেই তাকানোর লোভেই হাহাকার করছি দেখুন। কেন আপনি দেখছেন না আমাকে? কেন চোখ খুলছেন না? এভাবে আপনাকে দেখতে আমার কতটা কষ্ট হচ্ছে বুঝতে পারছেন না আপনি?"

সেঁজুতির কান্না জোরালো হয়ে আসছে। শব্দে নার্স মেয়েটির ঘুম ছুটে গেল। অসন্তোষ নিয়ে বলল, "এ কী ম্যাম, আপনি এখানে কেন ঢুকেছেন? এখনও তো কাউকে এলাউ করা হয়নি।"

সেঁজুতি চটজলদি চোখের জল মুছে নেয়। বলল ভেজা স্বরে, "আমি ওনাকে বিরক্ত করব না। শুধু পাশে বসে থাকব। প্লিজ!"

"নো ম্যাম, যতক্ষণ না স্যার অনুমতি দিচ্ছেন, আমার কিছু করার নেই। আপনি প্লিজ আসুন!"

সেঁজুতির এত কষ্ট হলো। নিরুপায় বনে উঠে দাঁড়াল তাও। যেতে যেতে বারবার ফিরে দেখল রুদ্রকে।

সেই রাত ফুরিয়ে একটা ফ্যাসফ্যাসে ভোরের আলো ছিটকে পড়ল হাসপাতালের উঁচু পিলারে। রুদ্রকে কেবিনে শিফট করা হলো।

আটটা বাজতেই দুই পরিবারের ভিড় জমল সেখানে। রেহান আত্মীয়- স্বজন কাউকে এখনও জানাননি এসব। শুধু শুধু সবাই দেখতে এসে জটলা বাঁধবে, অসুবিধে হবে ছেলেটার। একটু সুস্থ হোক, তারপরেই না হয়।

গোটা দুদিন পার হওয়ার পর ঠিক বিকেলে রুদ্রর জ্ঞান ফিরল। প্রতাপি চোখ দুটো আজ পৃথিবী দেখল নিভু নিভু ভাবে। অথচ সামান্য নড়ার শক্তি শরীরে নেই। কোনোরকম জিভ নেড়ে বলল, "পানি!"

CamScanner

নার্স মেয়েটি বিদ্যুৎ বেগে পানি এগিয়ে দেয়। রুদ্র উঠতে চাইলে ধরে ধরে আধশোয়া করে। তারপর ছুটে আসে বাইরে। আনন্দ নিয়ে জানায়, "আপনাদের পেশেন্টের জ্ঞান ফিরেছে।"

মাঝে প্রাণ সঞ্চালনের পথ্য। নিস্তেজ বসে থাকা সকলে ঝড়ের গতিতে ব্যস্ত হয়ে কড়ল। রেহান দু-পা এগিয়ে এলেন সামনে। কণ্ঠে উদ্‌বেগ ঢেলে বললেন।

"আমার একটু দেখা করতে পারি?"

"পারবেন। তবে আধঘন্টা পর। আর হ্যাঁ, একসঙ্গে এতজন নয়, স্যার সর্বোচ্চ দুজনকে এলাউ করতে বলেছেন।"

আবার আধঘন্টার অপেক্ষা। ঘড়ির কাঁটা যেন এগোচ্ছেই না। সেঁজুতি অস্থির চিত্তে পায়চারি করছে। ঘন ঘন শ্বাস টানছে কখনও। কখন রুদ্রকে দেখবে, কখন কন্ঠ শুনবে ওনার!

সে উৎকন্ঠিত নজর বারবার দেওয়ালঘড়িতে বোলায়।

ছটফটে সেই সময়টা পার হলো কচ্ছপের গতিতে। কাঙ্ক্ষিত মুহূর্ত অবশেষে ধরা দিলো মুঠোয়। নার্স মেয়েটি কেবিনে যাওয়ার জন্যে তলব পাঠিয়ে গেল। অমনি একসাথে উঠে দাঁড়াল অভ্র, রেহান আর রেহানা হক। সেঁজুতি বাড়ানো পা-টা পিছিয়ে আনল সহসা। আগে ওনারা দেখে আসুক, তারপর ও যাবে না হয়! এতক্ষণ অপেক্ষা করতে পারল, এইটুকু আর এমন

রেহান যেতে নিয়েও দাঁড়িয়ে পড়লেন। কী ভেবে ফিরে চাইলেন সেঁজুতির দিকে। একটু চুপ থেকে বললেন, "আমরা পরে যাই। প্রথমে সেঁজুতি যাক।"

চমকে চাইল মেয়েটা। চক্ষু ছাপানো অবিশ্বাস দেখে, ভদ্রলোক মৃদু হেসে বললেন, "যাও।"

বলতে দেরি, সেঁজুতির ছুট লাগাতে দেরি নেই। দমকা হাওয়ার ন্যায় সৌড়ে গেল যেন। দৃশ্যটাতে বুক ভরে শ্বাস নিলেন রেহান। মনে হলো, তাঁর ছেলেটাকে আগলে রাখার, নিঃস্বার্থভাবে ভালোবাসার অবশেষে কেউ এলো তবে!

বড্ড কসরত করে আধশোয়া হয়েছে রুদ্র। পুরো শরীর ব্যথায় নীল বাইরে চাইল সে। এই আলো, এই আকাশ এসব যে আবার নতুন করে হায় যাচ্ছে। পা একটা তো নাড়াতেই পারছে না। হালকা মাথাটাকে দিয়ে হাথ ভারি কোনেএকটা তো মডিয়ারে ঘাড় বাঁকিয়ে কেবিনের জানলা দিয়ে

CamScanner

বাইরে চাইলো সে,দেখবে ভাবতেও পারেনি। ট্রাকরূপী আজরাইল দেখে তো ধরেই নিয়েছিল জীবন ওখানেই শেষ।

শরীরের চিনচিনে ব্যথার সঙ্গে এক ফোঁটা দীর্ঘশ্বাস ফেলতেও পারল না, আচমকা ধড়ফড়িয়ে বুকের ওপর আছড়ে পড়ল কেউ একজন। ছেলেটা হকচকাল। ভড়কে গেল। সমস্ত দেহ ব্যথায় অবশ হতে হতেও বিস্ময়ে সব উবে গেল হঠাৎ।

"সেঁজুতি!"

মেয়েটা তখন নিজের মধ্যে নেই। শব্দ করে কাঁদছে। দুহাতের এত আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধন তার, যেন রুদ্র চাইলেও পালাতে পারবে না। ও থমকে রইল অমন। সেঁজুতি এইভাবে কাঁদছে কেন? এই কান্নার কারণ কি সে?

রুদ্র পলক ফেলল না। শুধু ঠোঁট নেড়ে ডাকল, "সেঁজুতি।"

টানা কতগুলো ঘন্টা পর রুদ্র ডেকেছে আবার। তড়িৎ মাথা তুলল সেঁজুতি। চেহারা দেখে রুদ্র চমকে গেল ভীষণ। এলোমেলো চুল, ফোলা চোখের নিচে একটু-আধটু কালচে ভাব। নাকের ডগা থেকে যেন রক্ত ছুটে আসছে। শুকনো ঠোঁট দুটো হয়তো প্রখর তাপে ঝলসে যাওয়া মাঠ।

ও অবাক হয়ে বলল, "কী অবস্থা করেছেন নিজের?"

সেঁজুতি জবাব দিলো না। আলতো হাতটা আচমকা তুলে গালে রাখল তার। রুদ্র আরো বিস্মিত হয়। সেঁজুতি ওকে নিজে থেকে ছুঁয়েছে? পরপরই কানে গেল মেয়েটার আকুল স্বর, "আপনার খুব কষ্ট হয়েছিল তাই না? খুব ব্যথা লেগেছিল?"

রুদ্রর চোখমুখে অনিশ্চয়তা। মনের কথা বেরিয়ে এলো মুখ ফস্কে, "আপনি কি আমার জন্যে কাঁদছেন?"

সেঁজুতি অত শোকেও নাক ফোলাল। আমার জন্য কাঁদছেন মানে কী? আর কার জন্য কাঁদবে তাহলে? বোকা মেয়েটার রাগ হলো খুব। বুকের ভেতর একটা অভিমানের উত্তাপ গোল হয়ে ঘুরল। তেজ দেখিয়ে বলল, "না। আমি আসছি।"

অনুরাগে উপচে আসা বুক নিয়ে উঠতে যেতেই রুদ্র হাত টেনে ধরল। সাথে টান পড়ল স্বীয় ক্ষততে। ব্যথায় আর্তনাদ করতেই সেঁজুতি উদবিগ্ন হয়ে বলল, "ব্যথা পেয়েছেন? কোথায়, কোথায় লেগেছে?"

CamScanner

রুদ্র হাসল এবার।

"এত চিন্তা আমাকে নিয়ে। এর মানে আপনি আমার জন্যেই কাঁদছিলেন।"

সেঁজুতি চোখ-মুখ কোঁচকায়।

রেগে রেগে বলে, "আপনি কেমন মানুষ বলুন তো। কোনোদিনই কি শোধরাবেন না? এই অবস্থাতেও কেন ফাজলামো করছেন? আপনার জন্যে প্রত্যেকের কী অবস্থা হয়েছিল জানেন? কোনো ধারণা আছে আপনার? আপনার বাবা, ফুপি, অভ্র এমনকি আমার বোন ইতি অবধি কেঁদেবোর একাকার করে ফেলেছে। আ..."

সে আরো কিছু বলতে যাচ্ছিল, মাঝপথেই প্রশ্ন ছুড়ল রুদ্র, "আর আপনি?"

তার উৎসুক চাউনি দেখে নিভে যায় মেয়েটা। অনুভূতি লুকাতে এদিক- এদিক দেখে। বাক্য ছুড়ে ছুড়ে জানায়, "আমি কী? আমি তো মাত্রই এসেছি এখানে। এতক্ষণ বাসায় নাক ডেকে ঘুমোচ্ছিলাম।"

"একটু বেশিই ঘুমিয়েছেন বোধ হয়। চেহারা দেখেই বুঝতে পারছি। আচ্ছা সেঁজুতি, এই অ্যাক্সিডেন্টে আমি যদি মরে যেতাম, আপনাকে জ্বালানোর তো আর কেউ থাকত না। খুশি হতেন তখন?"

সেঁজুতি আঁতকে উঠল। চাইল রুষ্ট চোখে। তেড়েমেরে কিছু বলবে, অথচ কেঁদে ফেলল ঠোঁট ভেঙে। রুদ্র এতদিন সবাইকে যেভাবে ধমকেছে, ঠিক সেভাবেই ধমক দিলো মেয়েটা।

"চুপ করুন। অসভ্য লোক! কী ক্ষতি করেছি আমি আপনার? কেন এত কষ্ট দিচ্ছেন আমায়?"

দু-ফুটের এক মেয়ের ধমকানিতে হতবুদ্ধি হয়ে যায় রুদ্র। ভ্যাবাচ্যাকা খায় কিছু। সেঁজুতি হেচকি তুলতে তুলতে বলল, "দুটো রাত আমি এক ফোঁটা ঘুমোইনি। মনপ্রাণ দিয়ে প্রার্থনা করেছি আপনি সুস্থ হয়ে যাবেন। বাড়ির প্রত্যেকে কেঁদে কেঁদে আল্লাহকে ডেকেছে। আর আপনি এখন এসব মরার কথা বলছেন? কেন হ্যাঁ? আমি একবারও বলেছি আপনি আমায় যালান? আর জ্বালালেও-বা আমাকে খুশি করতে মরতে হবে কেন? খবরদার যদি এসব মরা-টরার কথা আর মুখে এনেছেন তো। খুব খারাপ হয়ে যাবে, রুদ্র রওশন চৌধুরী!"

CamScanner

ভেজা চোখদুটো রাঙিয়ে রাঙিয়ে বলে দম নিল সেঁজুতি। তেজি হাতে চোখের পানি মুছল। অথচ ঠোঁট কামড়ে হাসল রুদ্র। কণ্ঠ নামিয়ে বলল, "এত হুমকি দিয়ে কী লাভ, সেঁজুতি? বলতে পারেন না আপনি আমায় ভালোবাসেন? আর কত লুকোচুরি খেলবেন বলুন তো? তৃষ্ণায় তৃষ্ণায় আমার বুকটা যে শুকিয়ে এসেছে। মরুভূমি হওয়ার আগেই আপনার প্রণয়ের ভারি বর্ষণ চাই সেখানে।"

সেঁজুতির চোখ মুছলেও আবার টুপ করে গাল ভিজে গেল। রুদ্র দুয়ে দেবার ইচ্ছেতে হাত এগোতে চায়। বিধিবাম, ব্যান্ডেজে টান লেগে ব্যথায় মুখ কুঁচকে ফেলে। সেঁজুতি ধড়ফড় করে কাছে এগিয়ে বসল। ও যেন খুব সহজে ছুঁতে পারে তাই। ব্যাপারটা রুদ্র বেশ বুঝেছে। বুক জুড়িয়ে যাওয়া আনন্দের হাসি হাসল সে। চোখ মুছিয়ে কথা দিলো নিখাদ স্বরে, "আর কাঁদবেন না, সেঁজুতি। আমি আপনার হাসির কারণ হব, অশ্রুজলের নয়।"

কপোলে রাখা রুদ্রর খসখসে হাতদুটো নিজের দুহাতে ধরে রাখল সেঁজুতি। কিছু বলল না জবাবে। শুধু চেয়ে রইল। যে চাউনি সরলো না। কুণ্ঠায় নড়ল না। রুদ্র কাতর কণ্ঠে বলে, "এখনো বলবেন না?"

সেঁজুতি গুটিয়ে গেল না। বরং রুদ্রর ব্যগ্র চোখে চোখ রেখে স্বীকার করল, "আমি আপনাকে ভালোবাসি!"

চট করে নেত্রপল্লব বুজে নেয় রুদ্র। চওড়া বুকটা প্রশান্ত শ্বাসে ওঠানামা করে। তারপর সবেগে সেঁজুতিকে বুকের মাঝে টেনে নিল সে। সাথে সাথে মনে হলো শীতলতার ধ্বস নেমেছে এখানে। ভেতরটা জুড়িয়ে যাচ্ছে। ভরতি হচ্ছে ফাঁকা পড়ে থাকা এতদিনকার অলিন্দগুলি। আহা, কত রাত, কত দিনের অপেক্ষা! এই প্রেম শেষ না হোক।

রুদ্র বলল, "আপনাকে বাহুডোরে পেয়েও এখনও নিজেকে কাঙাল মনে হচ্ছে, সেঁজুতি। কেন বলুন তো! এর উপযুক্ত কোনো সমাধান জানেন?"

সেঁজুতি বুকের মধ্যে মিশে থাকে।

জড়তাহীন জানায়, "আরো শক্ত করে ধরে রাখুন। দেখবেন সব ঠিক হয়ে গেছে।"

কেবিনের বাইরের সবাই অধৈর্য। সেঁজুতি গিয়েছে ঠিকই, কিন্তু বের হচ্ছে না। এতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা যায়? রুদ্রকে তারাও তো দেখবে।

CamScanner

অভ্র শেষমেশ কাচের দরজাটা ঠেলে মাথা ঢুকিয়ে উকি দিলো একটু। ভেতরের দৃশ্যে বিষম খেল অমনি। মাথাটাকে তড়িৎ বাইরে এনে কেশে উঠল খুকখুক করে।

আরিশা বুঝতে না পেরে শুধায়, "কী হলো? কী করছে সেঁজুতি? কথা বলছে? ভাইয়া কি চোখ খুলেছেন?"

অভ্র তখনও কাশছে। কোনোরকম ওপর-নিচে মাথা নাড়ল। প্রথমবার এত লজ্জা লাগছে ওর। ওদিকে বড়োরা সবাই প্রশ্ন নিয়ে চেয়ে। এই ব্যাপারে কোনো উত্তর অভ্র দিতে পারবে না। বাধ্য হয়ে আবার দরজা ঠেলল সে।

ইতস্তত করে বলল, "ইয়ে ভাই, আমরা কি একটু সুযোগ পাব? না-কি পর্দার এই সিন আজ সারাদিন চলবে?”

অমনি ছিটকে সরে গেল দুজন। রুদ্রর মেজাজ এত খারাপ হলো। অসন্তুষ্ট হয়ে চাইতেই ছেলেটা মিনমিন করে বলল, "আমার কোনো দোষ নেই, সবাই তাড়া দিচ্ছে তো।"

সেঁজুতির চিবুক গলায়। ওভাবেই উঠে দাঁড়াল রুদ্রর কাছ থেকে। বলল মিহি কণ্ঠে, "আপনি নিয়ে আসুন সবাইকে।"

অভ্র শ্বাস ঝাড়ে, "যাক! অবশেষে।"

রুদ্র মন খারাপ করে বলল, "অভ্রটাকে এখনই আসতে হলো, বলুন তো। ও না এলে আপনি আরেকটু আমার বুকে থাকতে পারতেন না? কিংবা সময়টা সারাজীবন এখানেই আটকে যেত না হয়।"

সেঁজুতির উত্তরের আগেই, সবাই কেবিনে ঢুকে পড়ে। অভ্র সামনে থাকায় শেষ কথাটা শুনতে পেয়েছে।

জবাব দিলো যেচে, "সারাজীবন সময় এখানে আটকালে বিয়ে কীভাবে হবে, ভাই? মামা যে আগামী সপ্তাহেই তোমাদের আংটিবদলের দিন ঠিক
করলেন।"

রুদ্র চকিতে বাবার দিকে চাইল।

PaidBooks &eBooks

CamScanner

রেহান বিগলিত হাসলেন। ছেলের কাছে এসে হাত রাখলেন কাঁধে। হেসে বললেন, "পারলাম না, রুদ্র। শেষমেশ হেরে গেলাম আমি। শুধু কি আমি একা? তোমার জেদের কাছে সেঁজুতিও হেরে গেল দেখলে? তুমি জিতেছ রুদ্র। জিতে গেছে তোমার ভালোবাসা। তোমার প্রণয়াকাঙ্ক্ষা।

সমাপ্ত

Paid Books & eBooks

Join this group for more books & ebooks

Paid Books & eBooks

PAID BOOKS
— & eBOOKS —

CamScanner